সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম

হাসনান আহমেদ

সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের ৫০তম জয়ন্তি উদযাপন করতে চলেছে। এ নিশ্চয়ই যে কোনো জাতির জন্য গৌরবজনক। বিশেষত বাঙালির মতো চিরশোষিত-নিষ্পেষিত জাতির ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অর্জন। কিন্তু ভিনদেশির দাসত্বশৃঙ্খল থেকে রক্ষা পেলেও কিংবা কাগুজে স্বাধীনতা অর্জন করলেও নিজের অন্তর্গত শৃঙ্খল বা প্রকৃত আত্মিক-আর্থিক-নৈতিক স্বাধীনতা কি অর্জন করতে পেরেছে! এমন একটি গভীরতর জিজ্ঞাসার সামনে আমাদের হাজির করতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসা যে কত দরকারি– বইয়ের পাতায় পাতায় এরই সকরুণ স্বাক্ষর দেখতে পাবেন আপনি, হে পাঠিকা/পাঠক!

বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখকের অভিমুখ। প্রকৃত প্রস্তাবে লেখক আমাদের নাড়ি ধরেই টান দিয়েছেন। কারণ কোনো জাতির জীবনযাপন, শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়েই তার জাতীয় চেহারা টের পাওয়া যায়। চেনা যায় তার সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র। আর দেশে-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, প্রায় চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ড. হাসনান আহমেদ যখন এ বিষয়ে কথা বলেন, তখন অনুভব করি একজন সৎ, সহৃদয় ও বিবেকবান মানুষের আত্মিক ক্রন্দন। আবার একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা-সংকট চিহ্নিতকরণ এবং কীভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়– তারও বাস্তব ও ব্যবহারিক পরামর্শ।

কিন্তু তার ভাষা ও বর্ণনা এত সরস ও তির্যক, শ্লেষ ও সংশ্লেষময়, যেন মধুমাখা চাবুক। তবে আমাদের জাতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক বিবেকের চামড়া এত মোটা যে, জানি না সংশ্লিষ্টরা অনুভব করবে কিনা কিংবা চূড়ান্ত ধ্বংসের আগে চোখ মেলবে কিনা।

তবে সবচেয়ে অন্ধকারেও আলোর ইশারা থাকে; নষ্ট-ভ্রষ্ট সময়েও সঠিক পথনির্দেশক থাকে। তাই আমাদের চরিত্রের আয়না হিসেবে বইটির গুরুত্ব অসীম– আমাদের ভালো লাগুক চাই না-লাগুক।

সৈকত হাবিব
কবি

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা
প্রতিদান চাইনি
কিছু কথা কিছু গান
অপেক্ষা
শেষবিকেলের পথরেখা
সত্যের গল্প গল্পের সত্য
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা

সমকালীন জীবনাচার ও কথা

হাসনান আহমেদ

সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি তুলে ধরার জন্য আমি অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি লেখনীকে জীবন্ত করেছে। পুরো লেখনীতে বর্তমান অবস্থার মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তিনি ঘটনা বিশ্লেষণের পাশাপাশি যথাসম্ভব সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত সমাধানের দিকেও কলম ধরেছেন। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ও শিক্ষাব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে এ দেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, জনসমাজের দুরবস্থা তাঁর চেনাজানা। তিনি মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর শিক্ষা-উন্নয়ন ও মানবসম্পদ গঠন প্রক্রিয়া এ দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে যুগোপযোগী কর্মপন্থা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। একজন এইচআর বিশেষজ্ঞ হিসেবে অভীষ্ট বিষয়গুলো আমাকে আশান্বিত করেছে। তাঁর লেখা অন্য বইগুলোও আমি পড়েছি। লেখায় তিনি সংক্ষুব্ধ জীবনের নিরঙ্কুশ বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার মনে হয়, তিনি লেখনীতে স্বকীয় বলিষ্ঠ-ধারা তৈরি করতে পেরেছেন। আশা করি, তাঁর লেখা পাঠকসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সামনের দিনগুলোতে তাঁর এ-ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ লেখা অব্যাহত থাকবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
প্রেসিডেন্ট
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস্-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

সাঁইত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম
হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
প্রকৃতি
১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.book@gmail.com

প্রচ্ছদ
ড. নাহীন মামুন

অলংকরণ ও কম্পোজ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা
linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৩৫-৭

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Samokalin Jibonachar O Karmo by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, April 2021
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

অনেক বছরের প্রয়াস-সিঞ্চিত আবাদি ফসল
দেশ-বিদেশে বিচিত্র পেশায় নিয়োজিত
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন
স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রীদের স্মরণে

আমার কথা

এবারের লেখা এলোমেলো, বিশ্লিষ্ট, বিলোড়িত; কোনো অধ্যায়েরই শিরোনাম নেই। যখন যা মনে এসেছে, লিখেছি। বইয়ের নামকে কেন্দ্র করেই পুরো লেখাটা আবর্তিত হয়েছে। সঙ্গে এসেছে প্রাসঙ্গিক নানা কিছু।

করোনা ভাইরাসজনিত ছুটির মধ্যে লিখতে বসেছিলাম কয়েকটা ছোটগল্পের সম্মিলনে একটা বই; লিখে ফেললাম অন্য কিছু। মন যে কখন কোথায় গিয়ে ঠিকানা খোঁজে, বোঝা সাধ্যাতীত। সমকালীন প্রেক্ষাপটে জীবনাচার ও কর্ম নিয়ে একটা বাস্তবভিত্তিক লেখা দরকারও ছিল; কিছু ঘটনা আগেই ভেবেছিলাম, যা নিয়ে লিখবো।

আমি না-পছন্দ সিস্টেম, রীতিনীতি; অব্যবস্থা, অনভিপ্রেত পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা; সামাজিক অনুপদিষ্ট হালচাল ও দুরাচারদের কর্মাকর্ম একেবারেই সহ্য করতে পারিনে; এটা আমার পেশাগত স্বভাব– শেষে কলম ধরি, আমার শেষ আশ্রয়। তবে তা যদি 'কান টানলে মাথা আসে'র মতো কোনো গোষ্ঠী বা দলের বিরুদ্ধে চলে যায়– তা আমার অনিচ্ছাকৃত। কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা আমার ধাতে সয় না– বিশেষ করে তাদের কাজ-কারবারকে। তাই দলকানা ও মোহাবিষ্ট নই। বরং শাশ্বত কথার মালা গাঁথি।

শিক্ষক মানুষ। লেখায় একই কথা বারবার ঘুরে-ফিরে আসতে পারে– এটা আমার পেশাগত অভ্যাস। এছাড়া অন্যান্য লেখায় যে অভ্যাসগুলো ছিল, সেগুলো এখানেও আছে। আমার এক সুযোগ্য ছাত্র এবার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে স্মৃতির স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি তাঁর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক ড. বদরুদ্দোজা মিয়ার প্রাসঙ্গিক গল্প আমাকে তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। কম্পিউটারের টেকনিক্যাল কাজে আমার প্রিয় মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল) ভাই ও তার একমাত্র মেয়ে নাজিয়া তাবাসসুম-এর দক্ষ স্পর্শ আমাকে ধন্য করেছে।

ভাবুক-মনের পাঠকদের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারলেই আমার সার্থকতা।

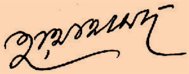

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২০

(হাসনান আহমেদ)

সমকালীন
জীবনাচার
ও কর্ম

এক

জীবন একটা চলমান সময়-যাপন ও কর্মের বেসাতি। জীবন আছে বলেই কর্ম কিংবা অপকর্মের পাহাড় গড়ার কাজে সচেষ্ট হই। কখনো চলমান-জীবনঘনিষ্ঠ-নির্মোহ জীবনালেখ্য অন্য লক্ষ জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায় জাগে। 'আচার' শব্দটা শুনলেই জিবে পানি চলে আসে। রসাস্বাদনের ইচ্ছে হয়। 'আচার' মানে 'তেল মসলাযোগে আম-লেবু-কুল-জলপাই প্রভৃতিতে প্রস্তুত মুখরোচক চাটনি'– যা এ দেশের ঘরে ঘরে চর্বচূষ্য। আমি এখানে সে-অর্থে 'আচার' শব্দটা ব্যবহার করছিনে। তবে লেখনী মুখরোচক না হলে মনে টানে না, এ কথাও সত্য। সেজন্য লেখনীতে আচার মেশাতে হয়।

আমাদের দেশে 'আচার' শব্দটা এসেছে পর্তুগিজ শব্দ থেকে, যার অর্থ– 'চিন্তা করা', 'গবেষণা করা', 'খুঁজে বের করা' ইত্যাদি। ফার্সি ভাষাতেও 'আচার' শব্দটা প্রচলিত আছে– অভিধান তাই বলে। সেখানে 'আচার' অর্থ 'রেঞ্জ' বা 'নাটবল্টু, 'স্ক্রু' ইত্যাদি জিনিস মোচড় দিয়ে খোলা বা আটকানোর যন্ত্রবিশেষ। ভাগ্যিস, এ দেশে শব্দটা সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। নইলে আমরা সবাই যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে যেতাম। আচার-আচরণ, কর্ম যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। তখন গাঁজাখোর, ঘুষখোর, জুয়োচোর, মুখচোর, রিলিফচোর, সত্য-চোর, বিদ্যাচোর, ক্ষমতাচোর, আলেম-দরবেশ, শহীদ-গাজী– এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক পার্থক্য থাকতো না। একই যান্ত্রিক মাপকাঠিতে সবাইকে ঢালাওভাবে মাপা হতো। আমি জীবনাচার শব্দটাও তখন আর ব্যবহার করতাম না।

আমি জীবনের সাথে 'আচার' মেশাচ্ছি অন্য ইচ্ছে নিয়ে, অন্য কিছু প্রকাশ ও যাচাই করার জন্য। এ-কথা নয়, ও-কথাও নয়, অন্য কোনো কথা বলতে। 'আচার' মেশাচ্ছি চালচলন, ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি, রীতি, নিষ্ঠা, সংস্কার প্রভৃতি প্রায়োগিক অর্থে, যা একটা মানুষের জীবনকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। কিংবা অধুনাতন জীবনব্যবস্থায় জীবনের সার্থকতা কতটুকু প্রতিপালিত হচ্ছে– তার ব্যবচ্ছেদ করতে; বিরাজমান রাজনৈতিক অব্যবস্থা, শিক্ষায় অব্যবস্থা, ধর্মাচারে

অব্যবস্থা ও মুখসর্বস্ব উন্নয়ন ধারার পিণ্ড দিতে। বলা যায়, এ-দেশীয় জীবনাচার ও অনাচারের রূপ, রস, গন্ধ ও কর্মের কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করাতে। দীর্ঘদিন ধরে যে অব্যবস্থা, অন্যায়, অপকর্ম, ধর্মকর্মের গোঁজামিল, অপমানসিকতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে যে একটা ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে তার আংশিক প্রকাশ এই ছুটির দিনগুলোতে কালির আখরে করতে। এই-ই আমার ধর্ম-কর্ম, এই-ই আমার চলা– আমার জীবনাচার।

এই যে লক্ষ কোটি জীবন– এর মধ্যে মানুষের জীবনই শ্রেষ্ঠ। এ জীবনের উদ্দেশ্য কী? এর সার্থকতা কোথায়? মানুষের জীবনের সাথে অন্য প্রাণিজীবনের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কোথায়? দুই পা ও দুই হাত নিয়ে জন্মালেই কি তাকে মানুষ নামে আখ্যায়িত করা যায়? প্রতিটা প্রাণির দুটো দিক আছে– মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ বেশি আছে, তাকে মানুষ বলবো; যার মধ্যে পশুত্বের মাত্রা বেশি– তাকে আকৃতি অনুযায়ী মানুষ নামে ডাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে পশুতুল্য। আসলে, বিবেকহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিচারক্ষমতাহীন ব্যক্তি মানুষের মতো দেখতে হলেও সে পশুর চেয়ে অধম। বলা হয়েছে, 'আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দ্বারা শ্রবণ করে না, এরা পশুর মতো। বরং এরা অধিকতর বিভ্রান্ত। এরাই গাফিল'।

মানুষ না থাকলে বিশ্বসমাজ থাকে কী করে? সমাজ ও রাষ্ট্রই-বা থাকে কী করে? অথচ আমরা মানুষকে অমানুষ বানিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে চাই। উন্নয়নের বাহারি কথায় মন গলাতে চাই, মন মাতাতে চাই। এ মানুষ চিনবো কী করে? মানুষ চিনতে হয় তার চিন্তাধারা ও কাজ দিয়ে। যার মনুষ্যত্ব নেই, মানবতাবোধ বিবর্জিত, বিবেকহীন– তাকে মানুষ বলা যায় না। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, বিবেক আছে, ধর্ম আছে– তাকে মানুষ না-বলে দেবদূত বা ফেরেস্তা বলাও সমীচীন নয়। এগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। মানুষ হতে হলে এগুলো থাকতে হয়। মনুষ্যত্ব আছে বলেই না আমরা দু-পাওয়ালা একটা প্রাণিকে মানুষ বলি। প্রাণ থাকলে প্রাণি হওয়া যায়, মনুষ্যত্ব থাকলে মানুষ হওয়া যায়। মনুষ্যত্ব কোনো দোষ বা গুণের নাম নয়, মানুষ হওয়ার বৈশিষ্ট্যের নাম।

যে কোনো পরিবেশের মধ্যে নিত্য বসবাস করলে ঘটনা দেখতে দেখতে কিংবা শুনতে শুনতে সবকিছুই গা-সওয়া হয়ে যায়। যদিও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে, বিবেক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে কাজটা ভালো না মন্দ বোঝা যায়। অসুবিধে অন্য জায়গায়– প্রতিটা মানুষ তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে। অন্যকেও নিজের অজান্তে নিজের স্বভাবের মতো গণ্য করে। তাই তার বিবেক দিয়ে অন্যকে বিচার করা জন-নিরপেক্ষ হয় না। এটা একটা সমস্যা। ব্যক্তি কিংবা সামাজিক দ্বন্দ্বের এটা অন্যতম কারণ। আবার মানুষের ভাবার স্বাধীনতা আছে। কোনো মানুষ কিছু স্বাধীনভাবে ভাবলে অনেক সময় কিছুই করার থাকে না। বাঁধ দিয়ে নদীর পানিকেই কখনো কখনো বশ করা যায় না, মানুষের মনকে তো নয়ই। আমি একজন ছেলেকে দু-গালে কষে দুটো থাপ্পড় দিলাম। গরম নজরে তাঁকিয়ে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজটা ভালো করলাম, না খারাপ করলাম, বল?' সে আরেকটা থাপ্পড় খাওয়ার ভয়ে হয়তো উত্তর দেবে, 'না, ভালোই করেছেন– আমার এটা পাওনা ছিল।' তারপর বললাম, 'কাউকে বলিসনে যেন?' সে উত্তরে বললো, 'নিশ্চয় না'। কথাটা সে ঠিক বললো, কি বেঠিক বললো বোঝা কঠিন। এভাবে সে ভাবতে পারে যে, তার চড় খাওয়ার এ অপমান সে কখনোই কাউকে বলবে না। আবার তা নাও হতে পারে। আমি চার-পাঁচজন পছন্দের লোককে ডেকে তাদের সামনে ছেলেটাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এই, আমি কি তোকে মেরেছি?' সে আগের কথাটা বেঠিক বললেও রাগান্বিত লোকগুলোর চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে উত্তর দেবে, 'কই, না তো!'

ছেলেটার এই মারের কথা এবং তার মনের কথা কি এক? নাও হতে পারে। জোর করে অনেককে দিয়ে অনেক কথা বলিয়ে নেওয়া যায়, মতলব এঁটে চুপ করিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে সত্যের লেশমাত্র নাও থাকতে পারে। আবার কিছু তোষামোদকারী বা চাটুকার, যাদেরকে সংক্ষেপে আমরা 'চাটার দল' বলে অভিহিত করি, যারা ব্যক্তিলাভে ঘোরে– কর্তাকে ভজন করার জন্য অনেক কিছুই করে। দু-চারটা থাপ্পড় খেয়েও তা হজম করে হাসিমুখ দেখাতে থাকে, ভবিষ্যতে আরো চাটার আশায়, কিংবা অতীত অপকর্ম আড়াল করার জন্য। তাদের মুখে মধু থাকলেও মনে বিষ। এসব কাজ আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত হলেও শাণিত

বিবেকী সমাজে ঘৃণিত এবং মান বিচারে জঘন্য। এক্ষেত্রে স্তাবক ও স্তুতি-খাদক উভয়ই ঘৃণাস্পদ। সমাজ যখন স্তাবক-সর্বস্ব হয়ে যায়, তখন মানবতা, ন্যায়বিচার, সত্য নির্বাসিত হয়। মানুষ আর পশুতে পার্থক্য থাকে না।

একজন শিল্পী মনের খেদে গেয়েছেন, 'ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায় রে, মানুষ চেনা দায়।' প্রশ্ন আসে, শিল্পী কি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন? মানুষ অতি বুদ্ধিমান প্রাণি বলেই স্বরূপ চেনা কঠিন, যদি তার মন এবং কার্যকলাপ আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে থাকে। আরেক শিল্পী গেয়েছেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন, লালন বলে পেয়ে সে-ধন, পারলাম না চিনতে।' লালনও চিনতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যদি প্রশ্ন করি, লালন কি খুব আশাবাদী ছিলেন? তার অন্য অনেক গান শুনলে তা মনে হয় না। একজন বিবেকবর্জিত লোকের কুকর্ম ও কুমতলব এবং বিবেকবান লোকের উদারমনা সুকর্ম পাশাপাশি দেখলে আপেক্ষিক অর্থে ভালো বলে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু নিরেট ভালো বলেও তো একটা কথা আছে, না-কী? সেখানে দেখার মধ্যে ভালো-মন্দ থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত ভালো ভালোই, যেমনি প্রকৃত খারাপ খারাপই।

আমার জীবনে অসংখ্য ধনী কিংবা ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে ওঠা-বসা, খানা-পিনা করতে হয়েছে। প্রত্যেককে দেখে এবং কথাবার্তায় ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা মনে হয়েছে। পরবর্তীকালে তাদের কর্মকাণ্ড ও প্রকাশ্য বচন শুনে অনেকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। নামটা শুনলেও শরীরের মধ্যে ঘিন ঘিন করে ওঠে। কাজের সাথে ভদ্র চেহারার মিল খুঁজে পাইনি। আমার প্রশ্ন, আমি কি বিবেকরহিত? নির্বোধ? হতেও পারি। প্রকৃত সত্য কী বলে? 'নিরঙ্কুশ সত্য' বলেও তো একটা কথা আছে, না-কী? সম্প্রতি যেসব জুয়োচোর, ক্ষমতাচোর, বর্ণচোর, জন-কোষাগার চোর, ব্যাংকচোর, দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতার আড়ালে মুখ ঢেকে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, ধরা পড়ার আগে তো আমরা তাদেরকে পূত-পবিত্র দেবদূত বলেই জানতাম। যেসব বটের ছায়ায় তারা এসব অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, ছায়াটা একটু নড়ে-চড়ে গেলেই, একটু অবনিবনা হলেই-না আমরা পত্রিকার মাধ্যমে ছিটেফোঁটা জানতে পারি, নইলে তো গোপনেই যুগ যুগ

ধরে এ খেলা চলতে থাকে। আমার তো অন্ধকার ঘরের সব জায়গাতেই সাপ বলে মনে হয়। এক জুয়োচোরের আস্তানার সুবিধাভোগী বিশ জনের নামের তালিকায় মাত্র পাঁচ নম্বর নামটা কোনো অজানা কারণে পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। বাকিদের খবর কী? হচ্ছে হচ্ছে করে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। এ দেশে ধামার সংখ্যা কত– তাও জানিনে। কাদের তত্ত্বাবধানে এগুলো চলছিল? রাজনৈতিক খোলসে পাপিয়ার পাপরাজ্য কাদের সাথে নিয়ে বিলাসবহুল হোটেলকে বছরের পর বছর স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে? এ দেশে আর কত পাপিয়া এমন পাপকাজ চালিয়ে যাচ্ছে? কারা পাপিয়াগংকে সাহায্য-সহযোগিতা করে টিকিয়ে রেখেছে? পত্রিকার বদৌলতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ তথ্য পেয়েছি। বাকিদের অবস্থা কী? চেহারার সাথে কাজের মিল আছে কী? হেন অপকর্ম নেই, রাজনৈতিক আবরণে হচ্ছে না। যা কিছুই করছে, টাকা বানানোর ধান্ধায় করছে; 'রাজনীতি' শব্দটা মুখের বুলি মাত্র। 'রাজনীতি' শব্দটা ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য, বা রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোনো একটা অপকর্ম বাইরে বের হলেই শত বছরের মুখস্ত বুলি 'সব কিছুর বিচার হবে, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে' বলে হুঙ্কার ছাড়ি, সান্ত্বনা দিই। বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো 'তুড়ি মেরে পরিস্থিতি ঠান্ডা রাখা'। যেদিন দেখবো ক্ষমতাধর, ক্ষমতাহীন, রুই-কাতলা, চুনোপুঁটি দলমত নির্বিশেষে একই পাপে একই মঞ্চে তদবির করার আগেই দ্রুত বিচার হচ্ছে; তখন বুঝবো দেশ এবার সামনে যাবে, উন্নতি করবে, এর আগে নয়। নইলে ফাঁকা বুলি শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে গেছে। এ দেশে হাজার হাজার লোক রাজনীতির ছত্রছায়ায় ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অপকর্ম করে পার পাচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করছে, বিদেশে পাচার করছে– অবস্থা একটু বেগতিক হলেই নিজেও গা ঢাকা দিচ্ছে, কেউ বিদেশে, কেউ গোরস্থানে। দেশব্যাপী হরিলুটের মেলা বসেছে। 'ঘরের চাবি পরের হাতে' দিয়ে রেখেছে। কোনো-না-কোনো একটা ছুতো ধরে জন-ধনভাণ্ডার লুট করাই এদের ধান্দা। এজন্য মুখ-সর্বস্ব রাজনৈতিক ফ্যাশনের ধরন-ধারণের কোনো অভাব নেই। একটাকে পছন্দমতো বেছে নিলেই হলো। এ আবার কোন ধরনের আজব সংস্কৃতি চালু হয়েছে! আমরা লুটপাট ও অপকর্মে 'অন্ধকারের যুগ'কেও হার মানিয়েছি– মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাকে বলি দিয়ে, মানুষের মুখোশ পরে, রাজনীতির

উন্নয়নের ধুয়ো গেয়ে। তত্ত্বকথা একটাই যে, ‘ওলট-পালট করে দিলাম, তোরা লুটেপুটে খা, সেরে-সমঝে যা, আর আমার নামে জয়কীর্তন গা।’

লালন গেয়েছিলেন, ‘দেখেশুনে জ্ঞান হলো না, দুধেতে মিশালি চোনা।’ চালবাজ ও ধান্দাবাজ হওয়া ছাড়া, সবার সব কাজই ‘হ্যাঁ’ বলি কী করে? বিবেকের সাদা দুধে গো-চোনা মেশায় কী করে? বলে ও লিখেও কোনো কাজ হচ্ছে না। কেউ কথা শুনছে না, কিংবা শোনার সময় পাচ্ছে না, অথবা গুরুত্ব দিচ্ছে না। শুধু জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে।

এ সবই আমাদের চলনসই দেশীয় জীবনাচার ও কর্ম, যার সাথে আমরা সব সময় খাপ খাইয়ে চলছি। উপাদানের মাত্রা একটু কমলে-বাড়লে যেমন আচারের স্বাদে ভিন্নতা আসে, তেমনি নিত্য-নতুন বেশে চলছে জীবনের রসাস্বাদন ও উপলব্ধি– শত রঙে, শত ঢংয়ে। হ্যাঁ, আমি অধুনা জীবনাচার ও কর্মের কথা বলছিলাম, মনুষ্যত্বের কথা বলছিলাম। আমার এ অস্ফুট ধ্বনি দিয়ে প্রতীকী হিল্লোল তো তুলতেই হয়। এ হিল্লোল কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, দলের বিরুদ্ধে নয়; সিস্টেমের বিরুদ্ধে, অপর্কমের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে। বর্তমান যে অস্থির ও অরাজক মিথ্যার সমাজ এ দেশে বিরাজ করছে, এর জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত নই। কঠিন বাস্তবতার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে দিন চলে যায়। মূলত আমি আর এই অসম সমাজের সাথে পেরে উঠছিনে। অথচ এই সমাজেই আমাকে চলতে হচ্ছে, দিনাতিপাত করতে হচ্ছে, মিথ্যার সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, আবার জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করতে হচ্ছে– আত্মহত্যাও করতে পারছিনে। কিন্তু আমার পক্ষে জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়তো বটেই, নিজের বিবেককেও বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বড্ড অশান্তিতে এবং উভয় সংকটে দিনাতিপাত করছি। ‘বড় সংকটে পড়িয়া দয়াল বারে বার ডাকি তোমায়, ক্ষম– ক্ষম অপরাধ আমায়।’

দুই

গত ২১ শে মার্চ '২০ থেকে এ-পর্যন্ত ১৫ দিন ঘরবন্ধ হয়ে আছি। সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত। ছুটি আরো বাড়ানো হবে কি-না জানিনে। আমার বিশ্বাস পরিস্থিতি বাড়াতে বাধ্য করবে। করোনা ভাইরাসের খবর শুনছি। যেখানেই ফোন করছি, প্রসঙ্গক্রমে করোনা ভাইরাসের কথা এসে যাচ্ছে। পত্রিকা খুললেই করোনা ভাইরাস। টিভি খুললেই করোনা ভাইরাস। করোনার ভয়ে বাসায় পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, ইন্টারনেট শেষ ভরসা। সারা বিশ্ব আজ লক-ডাউন, আতঙ্কগ্রস্ত– থরহরি কম্পমান। সভ্যতা আজ করোনা গ্রাসে মথিত। করোনার বিষাক্ত ছোবলে মহামারিতে রূপ নেওয়া এ ভাইরাস গুঁড়িয়ে দিয়েছে মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের দম্ভ। কোনো পারমাণবিক বোমা নয়; কদম ফুলের মতো ক্ষুদ্র সামান্য কয়েক ন্যানো মিটারের একটা অণুজীবের আলিঙ্গনের কাছে তাবত বিশ্বের মানুষ আজ অতি অসহায়। কোনো পাখিও নয়, পশুও নয়– হয়তো কোনো স্তন্যপায়ী একটা ক্ষুদ্র প্রাণি থেকে এর উৎপত্তি। কোনো ওষুধ নেই, প্রতিষেধক নেই, স্বজন নেই। কেবলই নিঃসঙ্গ মৃত্যুর অপেক্ষা। বিশ্বে মহামারি এর আগে অনেকবার এসেছে। এর থেকে বেশি লোকক্ষয়ও বিশ্ব দেখেছে, কিন্তু এমন অভিনব চরিত্রের প্রাকৃতিক মহামারি আগে কেউ দেখেনি। আমার দাদার আমলেও আমি শুনিনি। অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অদ্বিতীয় এক ব্যবস্থায় রোগ ছড়াচ্ছে। বড় সমস্যা হচ্ছে আক্রান্ত হবার পরও রোগী জানতে পারছে না যে, সে আক্রান্ত। অতি শ্রদ্ধেয় বাপ-মাকে ঘরে ফেলে রেখে, ঘরে তালা দিয়ে সন্তান-সন্ততি গৃহত্যাগী হচ্ছে নিজের জীবন বাঁচাতে। মরে ঘরে পড়ে থাকছে, খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই, নেই মৃতের জানাজায় কোনো লোক, চিতার পাশে দাঁড়িয়ে নেই কোন অশ্রুসিক্ত বধু। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' প্রবাদের সার্থকতা এখানেই।

লঞ্চডুবিতে দেখেছি, নিজের বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে দু-জনে বাঁচার স্বপ্নে নদীতে ঝাঁপ দিতে। তারপর নিজের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলে বংশের বাতি– নিজ ছেলের কাঁধে ভর করে চিত হয়ে নাকটা পানির উপর আপাতত ভাসিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে। এসব দেখলে মনে হয়, প্রকৃতির সার দর্শনই হলো

‘ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি!’ আমার কী হবে! আমার কী হবে! মানবজীবনের এ আবার কোন রূপ? কোথায় গেল ভালোবাসার বন্ধন, মা-বাপ, প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ! ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’-র মতবাদ! এ আবার কোন প্রাকৃতিক সুদক্ষ, সুকৌশলী কারিগরের ‘নির্মম বিপর্যয়’-এর বিনাশী মতবাদ।

বয়স্ক-বয়স্কাদের বেশি সংখ্যায় মরতে দেখে আত্ম-শঙ্কিত হলাম। ভাবলাম, বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিক চাপ কমানোর জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অকর্মা সম্প্রদায়কে উজাড় করতে অগতির গতি হিসেবে প্রাকৃতিক বন্ধুবেশে হয়তো এ ভাইরাস ধরাপৃষ্ঠে এসেছে। এখন দেখছি, কোনো বয়সের লোকই এর মারণ ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এ আবার কোন পরাক্রমশালী মহাশক্তির অব্যর্থ মিসাইল, যার বজ্রনিনাদ দাপট দেখাচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা বিশ্বে। তাবত পরাশক্তি তার পারমাণবিক বোমা, ড্রোন হামলা, মিসাইল, মারণাস্ত্র নিয়ে কোটি কোটি ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য-সামন্ত কাজ বন্ধ করে ভয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে কাঁপছে। আক্রান্ত হয়েছে শুনলেই পিলে চমকে যাচ্ছে, নতজানু হয়ে ভাবছে, ‘ঐ বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন জানি উড়ে যায়।’ করোনা কোনো রাজা-বাদশা, উজির-নাজিরকে করুণা করছে না, ধনী-গরিব মানছে না, হুমকি-ধামকির তোয়াক্কা করছে না। এ আবার কেমন আজব চিজ! মানবজাতির যত লালিত অহংকার সব ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছে। উপলব্ধি করার সময় এসেছে, জ্ঞানীর জন্য ভাববার বিষয় তৈরি করে দিয়েছে।

এ মহাপরাক্রমশালী প্রকৃতি ‘ইয়া কাহহার’, যার অতি ক্ষুদ্র অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু শুধু অকৃতজ্ঞ জুলুমবাজ মানবকুল। অন্যান্য প্রাণিকুল বিনা বাধায়, স্বচ্ছন্দে, নির্দ্বিধায় চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, কখনো একটু-আধটু আক্রান্ত হচ্ছে, তারা ভয়শূন্য। এ আবার কেমন বৈশিষ্ট্য? এ প্রাণিকুল কি মিথ্যা কথা বলে না? করে না কি প্রতারণা? আত্ম-প্রবঞ্চনা, মিথ্যার বেসাতি? করে না কি সতীর্থ নিধন? তারা হাতে তৈরি বোমা দিয়ে সতীর্থকে কি আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে না? করে না কি অস্ত্রের ব্যবসা? তারা কি সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী নয়? অন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠন? নিখুঁত মিথ্যাচার? নির্বিশেষ অবাধ যৌনাচার? তাদের পার্লামেন্টে সমকামিতার

বিল পাস হয়েছে কী-না? তারা মানবকুলে জন্ম না নিলেও অনেক বিষয়ে মানুষের চেয়েও সভ্য। তাই মানুষের সাথে তাদের তুলনা চলে না। তারা প্রকৃতিকে কলুষিত করে না, তৈরি করে না মারণাস্ত্র।

সিরিয়ায় যুদ্ধ চলছে নয় বছর ধরে, ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। জাতিগত দ্বন্দ্ব আর আন্তর্জাতিক কূটচালের মাঝখানে পড়ে একটা দেশ কীভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে, সিরিয়া তার বাস্তব উদাহরণ। সিরিয়ায় রক্ত ঝরছে– এ যেন রক্তের স্রোতধারা, দিন দিন বাড়ছে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের আহাজারিতে বিশ্ব মানবাধিকার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যুদ্ধে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ তাদের মুরুব্বিদের কলকাঠির দোসর হয়ে জড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধে কমপক্ষে ৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আনুমানিক এক কোটি লোক দেশ ছেড়ে চলে গেছে। সাধারণ মানুষ দিশেহারা। খাবার নেই, পানি নেই, স্বজনও নেই– যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আবার কোথাও যাবার জায়গাও নেই। চারদিকে ধ্বংসাবশেষ, লাশ আর লাশ। বোমা হামলায় ছেলে মারা গেছে চোখের সামনে। শোক দেখানোর অবস্থা নেই। ওখান থেকে মেয়েটাকে কোলে করে নিয়ে পেটের জ্বালা মেটাতে জর্ডানের বর্ডারে গিয়ে একখণ্ড রুটির জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পানি বালুপথ শুষে নিচ্ছে। এটা বাস্তব একটা অবস্থা। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। দুই পক্ষেই সমর্থন আছে বিশ্বের দুই পরাশক্তির। সে-সাথে অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা। যেদিকেই মরুক, দেশছাড়া হোক, ধ্বংস হোক– দু-পক্ষই মুসলমান। নিখাদ সহি আরবীয় মুসলমান–এটা অতিরিক্ত বড় পাওয়া। এ বিষয়টা মাথা-মোটা মুসলমান বাদে অন্য সবাই বোঝে।

সৌদি আরবের সরাসরি অংশগ্রহণ ইয়েমেনে– ইউএসএ বন্ধুরাষ্ট্রের ছত্রছায়া। পাঁচ বছর আগে ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করে সৌদি সামরিক জোট। মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন বসতি, আর আরব বিশ্বের সবচেয়ে গরিব দেশ ইয়েমেন। গৃহযুদ্ধে পর্যুদস্ত। বিবাদটার শুরু আরব বসন্ত নিয়ে, যার মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা আসবে বলে আশা ছিল, হলো তার বিপরীত। সেখানেও পরাশক্তিদ্বয়ের কলকাঠি নড়ছে। দু-পক্ষেই ধ্বংস হচ্ছে মুসলমান। আরব মরুভূমি বিরান প্রান্তরে পরিণত হচ্ছে। আশা, রক্তের বন্যা বালিঝড় নিশ্চিহ্ন করে দেবে। 'শির দেগা তবু আমামা

নাহি দেগা।' যুদ্ধে মানুষ থাকবে না, মুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; থাকবে শুধু ধুধু বালির ধূসরিত প্রান্তর, বালিয়াড়ি, মরুঝড়; আর বাদশাহী। আরো থাকবে দুই পরাশক্তি, সম্পদ শোষণের ইচ্ছে এবং তাদের স্বার্থের অনুকূলে পদলেহী রাষ্ট্রকাঠামো। থাকবে এক মুসলমানের রক্তে অন্য মুসলমান নেয়ে পূত-পবিত্র হয়ে কারো শহীদ, কারো-বা গাজি হবার বাসনা।

ইরাকে বহুধাবিভক্ত মুসলিম নিধন। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের অজুহাতে মুসলিম শক্তি ও সভ্যতা ধ্বংস। বিশ্বে তেল রিজার্ভের দিক দিয়ে ইরাক দ্বিতীয় অবস্থানে হলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশটার সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক সংকট ও গোষ্ঠীগত সংঘাতের সম্মুখীন। ফিলিস্তিনে ইসরাইলি সৈন্যদের বোমা ও গুলির নিশানদিহি করতে ফিলিস্তিনিদের জন্ম ও মৃত্যু। ১৯৪৮ সাল থেকে ইহুদিবাদী-বিশ্বসম্প্রদায়ের মুসলমানদের বসতিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের প্রথম আঘাত ফিলিস্তিন। অনেক ফিলিস্তিনি তাঁবুতে জন্মেছে, তাঁবুতেই শেষ জীবন পার করে কবরে গেছে। ফিলিস্তিনিরা বাস্তুচ্যুত এক জনগোষ্ঠী, যাদেরকে গুলি করে মারলে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ত দেওয়া লাগে না। ইহুদিবাদী-সম্রাজ্যবাদীদের চোখে এরা মানুষ নয়, এরা সন্ত্রাসী মুসলমান। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রথম দাবার চাল ফিলিস্তিনিদের নিজ ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ। ইসরাইল নামের বিষবৃক্ষ দিয়ে আজকের এ মধ্যপ্রাচ্য সংকটের শুরু। এ নিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর, কারো কারো ইসরাইলের পক্ষাবলম্বনের খেলা।

উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দীর্ঘ ৭০ বছর যাবত অত্যাচার, উৎপীড়ন বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে আসছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে ধর্ম ও ইসলামি সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কমিউনিজম সংস্কৃতি। মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়, ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে উইঘুররা বিদ্রোহ শুরু করলে হাজার হাজার নিরীহ উইঘুরকে হত্যা করা হয়। অনেককে করা হয় গৃহহীন। অনেককে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাম্পে। উইঘুর মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য যা যা করা দরকার, তার কোনোটাই বাকি রাখছে না চীনা প্রশাসন। ধর্ম যেখানে নিষ্পেষিত, অধর্ম সেখানে আসন গাড়তে বাধ্য।

আফগানে মুসলিম নিধন চলছে, চলবে। জারশাসিত রাশিয়া এবং ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ। মাঝখানে বাফার স্টেট হিসেবে আফগানিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যে ঢোকার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আফগানিস্তান। বিপ্লব রপ্তানির রুট এই আফগানিস্তান। উভয় পরাশক্তিরই এই দেশকে দখলে রাখার চেষ্টা। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত সৈন্যরা যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানিস্তানে ঢোকে। দশ বছরের যুদ্ধে প্রায় ১০ থেকে ২০ লক্ষ আফগান প্রাণ হারায়। দেশটা এখন মূলত অন্য প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা; তবু যুদ্ধ চলবে, মুসলমান মরবে। কোনো না কোনো পরাশক্তির তাঁবেদার সরকার থাকবে, এটাই নিয়তি। ওআইসি নীরব, গলার স্বর বেরোই না– গলায় শ্লেষ্মিক ঝিল্লি বেঁধেছে।

আরাকানে রোহিঙ্গা নিধন– মর্মন্তুদ ঘটনা, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। পার্শ্ববর্তী দেশে মুসলিম হঠাও যজ্ঞ, অত্যাচার, যজ্ঞের ঘোড়া। ইতিহাস বলে যে, প্রায় সাড়ে তিন শ বছর পর্যন্ত ২২ হাজার বর্গমাইল আয়তনের রোহিঙ্গা স্বাধীন রাজ্য ছিল। মিয়ানমারের রাজা বোদাওফায়া এ রাজ্য দখল করে এবং বৌদ্ধ আধিপত্য শুরু করে। পরবর্তীকালে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয়। তারপর এ জনগোষ্ঠীর জাতিগত অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আরাকানের রোহিঙ্গারা এখন উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী। এটাই তাদের সম্ভবত শেষ পরিচয়। বিশ্ববিবেক এ-ব্যাপারে একটু লোক-দেখানো টু-টা, ফুস-ফাস করলেও, কার্যত নীরব।

বিশ্বের কোথায় এ অত্যাচার, রক্তবন্যা, উৎপীড়ন নেই, বলুন? বিশ্ব মুরব্বিদের তথাকথিত মানবাধিকার-মার্কা প্রতিবাদের লোকদেখানো ঢেউ দু-দিনেই থিতিয়ে যায়। অধিকারহারা, অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত কোনো মুসলমান অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিদ্রোহ করলেই সে হয়ে পড়ে 'সন্ত্রাসী' কিংবা 'জঙ্গি'। বিশ্ব মুসলমান ভাইয়েরা নিজেদের তখত, সম্পদ রক্ষা, ভ্রাতৃহত্যার কুটিল শলাপরামর্শ নিয়ে মহাব্যস্ত।

ভারতের সম্প্রসারণবাদী সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদ কাশ্মীরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর যে নির্মম অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে, তা ইতিহাসের জঘন্য অপরাধ। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর নাম হয়েছে সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠী। এভাবে ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানরা আজ নিগৃহীত, অত্যাচারিত, সুবিধাবঞ্চিত। দিনে দিনে তারা শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত হয়ে নিম্নমানের জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে, কিংবা হতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কেউ মরলে মরে মুসলমান। পুলিশ গুলি ছুড়লে গিয়ে মুসলমানের গায়ে লাগে। কেস হলে হয় মুসলমানের নামে। শত শত বছর ধরে বসবাস করেও সেখানে মুসলমানরা নিজ দেশে পরদেশী। সঠিক অবস্থা জানতে হলে সেখানে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করতে হবে। এসব কথা বলে আমি একটা উগ্রবাদী, সম্প্রসারণবাদী মানসিকতাসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর স্বরূপ চেনানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আরো মজবুত করার জন্য বলছি। এছাড়া আমাদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ব্যক্তিপর্যায়ে থেকে থাকলেও তা যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে বলছি। এত অত্যাচারের কথা বলার প্রয়োজন হলেও 'মুখে আলোচাল' অজুহাত দেখিয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকি, কিংবা অগত্যা বলি, 'এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' কর্তা ভজন কাকে বলে! 'ঘরে বাইরে এক মন তবেই করো কেষ্ট ভজন'। অন্যায় আপন-পর যেই-ই করুক এটাকে ন্যায়ের মোড়কে আবদ্ধ করা পাপ। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার বৈশিষ্ট্য মানুষকে মহান করে। নইলে তা হয় স্বার্থান্ধ।

উল্লিখিত প্রতিটা বিষয়ের সঠিক সত্য জানার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমি বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। এরও কারণ আছে। গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি– সংক্ষেপে মুসলমানদের জীবনাচার ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরছি। পৃথিবীজুড়ে মুসলমানদের ক্ষেত্রে মানবতা লজ্জিত হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মকে করছি পদদলিত। সভ্যতার বচন-বুলি মুখে আওড়ে অসভ্য বর্বরতার কীর্তন গাচ্ছি। একবার ভাবি, আমেরিকা নামক দেশটা বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে না-যাওয়া পর্যন্ত বিশ্বে এ রক্তপাত চলতে থাকবে। আবার ভাবি, হয়তো-বা তা

নয়, আরেক আমেরিকা জায়গা করে নেবে। আসলে মানুষজাতির মনুষ্যত্ব ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এ বর্বরতা চলতে থাকবে। আর একটা কথা চিরসত্য— মুসলমানের শত্রু মুসলমান। ধ্বংস এদের উপযুক্ত প্রাপ্য। তবে কয়েক দশক পর পর করোনার মতো মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে মানবজাতিকে সোজা পথে চলার হুঁশিয়ারি বার্তা না দিয়ে গেলে, এদের এ দম্ভ খর্ব করার আর কেউ নেই। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। নইলে মনুষ্যত্বহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনো জুলমবাজ, অত্যাচারীর হাতে তাবত প্রাণিকুলের মহাবিপর্যয় আসতে বাধ্য। তবে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিলে কাঁচা পাকা দুই-ই পড়ে— এটাই অসুবিধা।

চীনের উহান প্রদেশে করোনা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে ইসলামি আঁতেলরা প্রচার শুরু করে দিল— যতসব হারাম পশুপাখি খায়, না-জায়েজ কাজ করে; বিধর্মীদের উপর আল্লাহ গজব নাজিল করেছে। মুসলমানদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। অথচ মুসলমানরাও যে আজ শতধাবিভক্ত, অন্তঃকলহে লিপ্ত, আল্লাহর দেখানো পথ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে; নামসর্বস্ব মুসলমান হয়ে গেছে; ইসলামি ইস্পাত কঠিন বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও আকিদা, চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে; শুধু লোক-দেখানো নামাজ-রোজা ও বড় মাপের হজের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে— এসব ভুলেই গেছে। 'আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি, ভিতর পানে চাইনি।' ভাবিনি, 'যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে'— এসব উক্তি। খেলাপ্রিয় ইতালির অসচেতন মনোভাবের কারণে স্টেডিয়াম থেকে যখন দেশের অনেক জায়গায় মহামারি আকারে করোনা ছড়িয়ে পড়লো, তখনও একই বয়ান— বিধর্মীদের উপর গজব, ইসলামকে ওরা অপমানিত করেছে। এখনও সাবধান হ; বিধর্মীরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। ইমাম মাহদী সাত আসমান ছেড়ে দ্বিতীয় আসমানে প্রায় পৌঁছে গেছেন। 'আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি'— ইত্যাদি, ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি। ইসলামি শিক্ষা, আত্মসচেতনতা, আত্ম- উপলব্ধি, আত্মবিশ্লেষণের বড় অভাব; বড্ড বেসামাল ধর্ম-ধ্বজাধারী মুসলমান নামের এ জনগোষ্ঠী।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ছড়িয়ে পড়ে বাঙালি মুসলমানসহ মৃত্যুর পাল্লা ক্রমশই ভারী হতে দেখে— নো চিন্তা, হাম ভি মুসলিম হ্যায়। দুটো দোয়া শিখে

নিয়েছি, কুচপরোয়া নেহি; পারলে তোমরাও এ-দুটো শিখে নাও, তিন ফু-তে কর্ম কাবার। অসংখ্য খ্রিস্টান-বিধর্মী লাইন ধরে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে ঝান্ডা উড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'– এ-ধরনের কোনো উন্নতমানের চিন্তা-চেতনা এদের মধ্যে নেই। একদল অপরিপক্ক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ মুসলিম তবলিগ জামাতের নাম ধরে মালয়েশিয়াতে ধর্মের ছবক দিতে গিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে এ দুর্দিনে এক জায়গায় জড়ো করলো। সাথে সাথে সে-দেশে করোনার বিস্তার ঘটলো। ধর্মান্ধরা যার যার দেশে ছড়িয়ে পড়লো। করোনাকে সাথে করে নিজ দেশে নিয়ে গেল। নিজ দেশেও রোগের বিস্তার ঘটলো। এ বিষয়ে তাদের হেদায়েতি বয়ান অতি স্পষ্ট, 'আল্লাহতায়ালা তার কাছের বান্দাদের রোগ-ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন; পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে ইহকাল ও পরকালে কামিয়াব হতে হবে।'

করোনা ছোঁয়াচে উদ্ভট কিসিমের রোগ বিধায় এক জায়গায় জড়ো না-হয়ে ছোঁয়া এড়িয়ে চলার পরামর্শ ডাক্তাররা দিচ্ছেন। এমন কি তবলিগ জামাত করেন এমন ডাক্তারও এ পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, জীবনপাত স্বীকার, তবুও 'জমায়েত বন্ধ', 'ধর্মীয় গাশ্‌ত বন্ধ' স্বীকার নয়; তবলিগি ভাইদের ধর্মপ্রচার দলে-দলে চলবেই। আমাকে এক কওমি মাদ্রাসা-পাস হুজুর সরাসরি বললেন, 'ইসলামে ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। আপনারা বাসায় থাকতে বলছেন তাই থাকছি, জামাত আসলেই চলে যাবো।' এদের অনেকেই এমনই ধর্মান্ধ যে, শুধু আরবি পড়তে পারেন, কোরান-হাদিস পড়েন। বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানসহ দুনিয়ার কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না, সাধারণ বিজ্ঞানও বোঝেন না এবং আগুন-পানি, বজ্রপাত মানতে চান না। ইসলাম যে চিন্তা ও কর্মের ধর্ম তা-ও মানেন না।

আমার এক বন্ধু এর মধ্যেও ঢাকা ছেড়ে নীলফামারী গিয়ে এক জামাতে এক-চিল্লা (ফার্সি–চিল্লাহ) দিতে চেয়েছিল। পঁচিশ দিন পর যখন জ্বরে বিভোর, সর্দি-কাশি ছাড়ছে না; বাধ্য হয়ে ঢাকায় ফিরেছে। শুনলাম, অন্য এক বাসায় নির্জনে একাকী

দিন কাটাচ্ছে। সংবাদ পেয়ে ফোন দিলাম। আমার সাথে বেশ তর্ক হলো। বললাম, তোমার সন্তান-পরিবার আক্রান্ত হতে পারে ভেবে অন্য বাসায় দিন কাটাচ্ছো। মমতার কারণে তোমার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করছো। তুমি জামাতে থেকে বিভিন্ন মসজিদে থেকে, এক প্লেটে খেয়ে আরো অসংখ্য বাইরের লোককে তাদের অজান্তে আক্রান্ত করেছো, তাদের প্রতি তোমার মানুষ হিসেবে দায়িত্বহীনতার কথা একবারও মাথায় এনেছো? কোথায় তোমার 'ইসলাম– শান্তির ধর্ম'? কোথায় তোমার চিন্তার স্বচ্ছতা? চুপ করে থাকলো। কোরআন-হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ধারক-মুসলমান বর্তমানে কোথায়? কোথায় চিন্তা ধারার নির্মলতা, স্বচ্ছতা? কোরআন-হাদিসের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রবল স্রোতধারা আজ মরুপথে হারিয়ে গেছে, বালিতে মুখ লুকিয়েছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বেশ কিছু অপরিণামদর্শী তবলিগি আছেন, যাঁরা বিবি-বাচ্চাদের অনাহারে রেখে, খাদ্যের সন্ধান না করে 'চিল্লা'য় চলে যান। বিবি-বাচ্চারা বাঁচলে বাঁচুক, মরলে মরুক– আল্লাহ মেহেরবান। দায়িত্বজ্ঞানের বালাই নেই। আল্লাহর কতটা নৈকট্য অর্জন করার পর যে এ-রকম করা যায়– সে আত্মবিশ্লেষণও নেই। হুজুগে বাঙালি, হুজুগে মাতে। অনেককে দেখি নিজের পেশাগত দায়িত্ব ফেলে রেখে, কাউকে কিছু না জানিয়ে তবলিগে চলে যান। কাজকর্মে দায়িত্বহীন, অসচেতন। রুজির বৈধতা-অবৈধতা ভাবেন না। তবলিগের নেশায় মসজিদে মসজিদে ঘোরেন। অথচ তাঁর বাড়ির পাশের লোকগুলোকে ভালো পথে আনার দায়িত্ব তাঁর ছিল। কাউকে কাউকে দেখছি, এতিমের হক ফাঁকি দিচ্ছেন, ভাই-ভাতিজির সম্পত্তির অংশ ফাঁকি দিচ্ছেন, আবার বড় আলখাল্লা পরে, দাড়ি রেখে তবলিগে গিয়ে চিল্লিয়ে বেড়াচ্ছেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু লোক এমনও আছেন, যাঁরা অন্যের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা ভুলে যান। এখানে মূলবিষয়টা হচ্ছে, একজন মুসলমানের তাঁর কাজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দায়িত্বহীন না হওয়া। সমাজে বেশ কিছু লোক চোখে পড়ছে, টুপি মাথায়, কোরআন-হাদিস মোটামুটি জানে অথচ শিক্ষার বড় অভাব, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-অন্ধবিশ্বাসে জীবনটা ভরা। এঁরাই ইসলামকে বড় ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, গোঁড়ামির মধ্যে ইসলামকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। তবে আশার বিষয় হচ্ছে, অনেক পরিচিতজনকে দেখছি– তাঁরা

কওমি মাদ্রসায় পড়েননি বটে, তাঁরা বিভিন্ন পেশার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, ইমানের কারণে ইসলামি শিক্ষা শিখেছেন, দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন, সুশিক্ষিত মুসলমান– যাঁদের মধ্যে ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এঁদেরকে দেখলে ভালো লাগে; মনটা আশার আলোয় ভরে যায়।

করোনা বিভিন্নভাবে, অনেক সময় দিয়ে– কখনো প্লেনে চড়ে, কখনো-বা জাহাজে করে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারত উপমহাদেশে আসন গাড়লো। উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর এ অজুহাতে করোনার পুরো দায়ভার চাপাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। রোগীর সংখ্যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে বেড়েই চললো। দিল্লির এক মসজিদ থেকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একদল তবলিগি বান্দার শরীর পরীক্ষা করে কয়েকজনের শরীরে করোনার অস্তিত্ব পাওয়া গেল। নাম রটিয়ে দেয়া হলো, মুসলমানরা ভারতে করোনা ছড়াচ্ছে। 'মগা এড়াবি কয় ঘা'? যদিও কোথাও কোথাও শত শত ধর্মান্ধ হিন্দু জমায়েত হয়ে অতি পবিত্র(?) 'গো-মূত্র পান' পুণ্যোৎসব করায় কোনো দোষ হচ্ছে না; তেমনি দোষের হচ্ছে না হাজারে হাজার পুণ্যার্থী ভারতব্যাপী দল বেঁধে এ-দুর্দিনে বিভিন্ন মন্দিরে দেব-দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিতে গেলে। অর্থাৎ এক যাত্রায় দুই ফল গণ্য করা হচ্ছে। গো-মূত্র ভক্ষণকারী এসব পবিত্র পুণ্যার্থীদের শরীর পরীক্ষা করে কোনো ভাইরাস পাওয়া গেল কী-না তা পত্রিকাতেও আসছে না; কোনোভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে না। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ।' হিন্দুস্থান থেকে মুসলমান তাড়াও চক্রান্ত বলা যায়:

ভারতের বিজেপি–
অসার ধর্মান্ধতা নিয়ে যত দাপাদাপি,
জাত-কূল-কৌলিন্য-বর্ণভেদ সারা দেশব্যাপী,
অসহায় 'পাতি-নেড়ের জাত' মুসলমান সাক্ষাৎ জন্ম-পাপী।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অসিলায় সেখানকার মুসলিম উৎপীড়ন ও এক-চোখা অত্যাচার যে কত প্রকট ও মর্মভেদী তা আমার জানার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি অনেক ঘটনার রাজসাক্ষী। সে স্মৃতি ভোলা দায়!

করোনা ভাইরাস বিষয়ে এ দেশের বাস্তব অবস্থা আমরা সবাই সম্যক অবহিত, বেশি বলার নেই। পেপার-পত্রিকা ঘাটলে, টিভির পর্দায় তাকালে শুধু বিদেশের করোনার খবর দেখেছি। ইদানীং আমরা বড্ড স্মার্ট, আধুনিক ও বিদেশমুখী হয়ে গেছি। দেশের রোগবালাই নিয়ে কোনো কথা নেই। অথচ আমেরিকায় কতজন রোগী মারা গেল, কতজন আক্রান্ত হলো, তাদের রাতে ঘুম হয় কিনা, তাদের বংশপরিচয়, মা-নানির নামসহ শুনতে হচ্ছে এ-দেশীয় টিভির বদৌলতে। কিন্তু দেশের খবর লা-পাত্তা। আর এ দেশের রাস্তাঘাট, নর্দমা রোগমুক্ত করার জন্য পানি ছিটানোর ছবির ছড়াছড়ি। দু-তিন দিনে একজন মরে কি মরে-না তার যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত। আক্রান্তের সংখ্যা নেই বললেই চলে। বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার দুর্মুখেরা বলে চলেছে, 'পরীক্ষা নেই, তাই করোনা নেই, তাই মৃত্যু নেই।' যত মরছে সব হার্টের রোগে, শ্বাসকষ্টে। দেশ চলার প্রতিটা ক্ষেত্রে একটা-না-একটা 'সুবুদ্ধি' তো আমরা বের করেই ফেলি। এতে জাতি উদ্ধার হয়। এতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, আমরা এতে অভ্যস্ত, এটা আমাদের স্বভাব। দেশের অনেক অঞ্চলেই ফোন করে শুনছি, করোনায় আক্রান্ত– লক্ষণ তাই বলে। পরীক্ষা যেহেতু নেই, তাই কাজির হিসাবে সংখ্যা অতি নগণ্য। সে-যুগের পুথিতে থাকতো, 'লাখে লাখে লোক মরে কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখে চল্লিশ হাজার'– সে অবস্থা। সবই গুরুর ইচ্ছে, গুরুর তেলেসমাতি। কিন্তু এ বুদ্ধিতে শেষ রক্ষে হবে কিনা বাস্তবতাই বলে দেবে।

কথায় বলে, 'সাপ সোজা হয়, কিন্তু মরার পর।' তবে তখন যে আর ফেরার পথ থাকে না। এই পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে দেখবেন সব তথ্য দিচ্ছে; বরং একটু বেশি বেশি দিচ্ছে। বেশি তৎপরতার বিজ্ঞাপন সব জায়গায় জারি হচ্ছে। তারও একটা হেতু নিশ্চয়ই থাকবে। যদি পাওনা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

বড় কর্তাব্যক্তিদের কথা ছাড়া দেশ চলে না। দৈনিক এক হাজার রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হবে। বুঝলাম, মোটামুটি পাঁচ কোটি লোকের রক্ত পরীক্ষা করাতে হলে একশ পঁচিশ মাসের মতো সময় লাগতে পারে। পরীক্ষা করার ক্ষমতা মাত্র পাঁচটা হাসপাতালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমার ধারণা, এভাবে চলতে থাকলে

অসংখ্য রোগী বুকের ব্যথা ও সর্দি-জ্বরে মরার এক বছর পর জানতে পারবে তারা করোনার রোগী ছিল কী-না। তারপর জান্নাতের প্রধান ফেরেশতার বরাবর দরখাস্ত করতে পারবে শহীদের মর্যাদা পাবে কি-না। এ দেশে জন্মটাই একটা নসিবের ব্যাপার– সরকারি হাসপাতালগুলোতে গেলে এ-নসিবের কথাই বার-বার মনে হয়। আমি ভাবছিলাম, বেশি পরিমাণ পরীক্ষা-কিট দিয়ে প্রথমেই যত বেশি পরীক্ষা করানো যায় ততই ভালো। রোগীদের আলাদা করা খুবই জরুরি। তা হলো না। এই হাসপাতালগুলো থেকেও সার্ভিস ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে-না বলে অভিযোগ আছে। জরুরি ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে, ফোন করতে করতে হাতে ব্যথা। ফোনে পেতে লাগে পাঁচ ঘণ্টা। তারপর উত্তর আসে 'কোয়ারেন্টিনে থাকুন', অথবা 'আইজোলেশনে রাখুন'। বাঁচা-মরা আপনার নিয়তি। ফুসফুসের জটিল প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট। মরার আগে মেশিনের মাধ্যমে একটু আয়েশের সাথে শান্তিতে অক্সিজেন টেনে মরার সৌভাগ্যটুকুও আমাদের নেই, সেখানেও দুর্ভাগ্য– দুর্নীতি এসে বাসা বেঁধেছে। ডাক্তারদের বক্তব্য, 'আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও তো জীবন, আত্ম-নিরাপত্তার সরঞ্জামাদি কোথায়?' 'রোগী মরে মরে অবস্থা– এই যেন জীবনটা বেরিয়ে গেল! ওঝা ছয় মাসের পথে ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। বড় নামি-দামি ওঝা।' বেরসিকজনেরা বলাবলি করছেন ভিন্ন কথা– প্লিজ, অন্তত একবার বলুন, এতদিন কোথায় ছিলেন? মহামারি তো অনেক আগেই অন্য দেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল; আগমন নিয়ন্ত্রণ প্রথম থেকেই করতে পারেননি কেন? আসলে কথা তো তাই-ই। কয়েক শ বিমানযাত্রীকে নামিয়ে নিরাপদে কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হলো। স্বাস্থ্য বিভাগের অব্যবস্থাপনার কারণে, অপরিচ্ছন্ন-নোংরা থাকার জায়গার কারণে তাদেরকে চলে যেতে দেওয়া হলো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি এ দেশে বাস করে জানেন না স্বাস্থ্যবিভাগের রুগ্ণ অবস্থা ও দুর্নীতির কথা? অসুস্থ পরিবেশের কথা? কৃশকায় স্বাস্থ্যবিভাগ ও হাসপাতালগুলোর করুণ দশা, যা আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি এবং পরিস্থিতির দিন-দিন অবনতি হচ্ছে– এ খোঁজ তো কর্তাবাবুদের রাখার কথা। তাদের বোঝার দরকার যে, হঠাৎ এক-রাতের মধ্যে যদি অলৌকিকভাবে সব ঠিকঠাক না হয়ে যায়, তাহলে করোনা মোকাবিলায় তা হবে অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যকর একটা ব্যাপার। 'সময়ের এক

ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়' কথাটা তো আমরা ক্লাস সেভেনে থাকতেই মুখস্থ করেছিলাম, কর্তাবাবুদের তা মনে থাকে না কেন? এ-দেশের পুরো জনগোষ্ঠীর জীবনমরণ বিষয় নিয়ে এত খামখেয়ালি, দায়িত্বহীনতা কেন? স্বাস্থ্যবিভাগের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কথা আমরা যুগ যুগ ধরে শুনে আসছি। পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এ নিয়ে আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের উপর এ ধরনের অগ্নিপরীক্ষা এলে সেটাও হবে তথৈবচ। সীতার অগ্নিপরীক্ষা– সীতাদুঃখ। 'ধরণী দ্বিধা হও' বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কথা প্রসঙ্গে সেদিনই অন্য এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্মুখ এক অধ্যাপক ফোনে মুখে খেঁউড় কেটে বললেন, 'আরে ভাই, বুঝলেন না– এরা তখন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পটকা আমদানি ও পটকাবাজি (আতশবাজি) করার কাজে যারপরনাই ব্যস্ত ছিল, করোনা রোগী বিদেশ থেকে এলো, কি এলো না– অত দেখার সময় কোথায়!' আমার বিশ্বাস, টাকাগুলো দিয়ে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাঙালি ভোজ করলেও গরিব-দুঃখীরা একবেলা পেট পুরে খেতো। জীবনকে আতশবাজির মতো এত হালকাভাবে নিলে কীভাবে হয়, বলুন?

আসলে কথা একটাই– 'কার গোয়াল, কে দেয় ধুয়ো' অবস্থা। সবাই আছে যার-যার ধান্ধায়। হয়তো কেউ-না-কেউ আতশ আমদানির দায়িত্বে ছিল। আতশবাজি না করাতে পারলে তো আর ঐ ছুতোয় একটা অংশ পকেটে আসে না। ফলে আতশবাজি ফরজে আইন। কাজের দায়িত্ববোধ কোথায়? কো-অর্ডিনেশন কোথায়? জবাবদিহিতা কোথায়? জবাব চাইতে গেলেই তো নিরুদ্দেশ থেরাপি। চাটুকারিতা আছে, চাকরি বহাল আছে; নো পরোয়া। প্রথমে যে রোগীগুলো আক্রান্ত হলো, তারা সবাই বিদেশফেরত বাংলাদেশীদের আপনজন, পরিবারের সদস্য। যাত্রীগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যাবার পর শুরু হলো ক্রিকেট বলের মতো পশ্চাদ্ধাবন। তাদের অনেকেই এমনই 'বাঙালি' যে, পরীক্ষা না-করিয়ে আত্মীয়বাড়ি পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। অনেকেই মূর্খতাবশত অন্যদের আক্রান্ত করতে লাগলো। আমরা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের জন্য পর্দা টানার অপেক্ষায় থাকলাম। 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং', আমাদের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। পুলিশ বিভাগ তাদের অনেককেই খুঁজেই পেলো না। পুলিশ যে অনেককেই খুঁজে পায় না,

এটা তো সাত পুরোনো রীতি। তারা বিদেশী টাকার আড়ালে মুখ লুকালো। এই ঘটনার পর কয়েক দিন ধরেই পত্রিকায় কিংবা টিভি চ্যানেলে দেখলাম যে, কর্তৃপক্ষ বলছে, 'বিমানবন্দরগুলিকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে, পরীক্ষা চলছে।' কী পরীক্ষা, কেমন পরীক্ষা, জানিনে। যাত্রীরা আসছে আর হাসতে হাসতে বলছে, 'কই, কোনো বাধা কিংবা পরীক্ষা দেখলাম না তো! সে কথা ও ছবি টিভিতে দেখলাম। আমরা তো এ দেশের অনেক কাজই পত্রিকার সংবাদে, ক্যামেরার সামনে আর টিভির পর্দায় করি। আজব দেশ, আজব কথাবার্তা, আজব তার ব্যবস্থাপনা! বাচন-বচন, বচনপ্রপঞ্চ! আমার শুধু ছোটবেলায় পড়া সেই কবিতাটার অংশবিশেষ বলতে ইচ্ছে করে: 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' আমরা চাপাবাজিতে একশর মধ্যে একশ পাই, কাজে ও দায়িত্বে ফেল মারি। এটাই আমাদের চরিত্র।

আমাদের বলিষ্ঠ এক কণ্ঠস্বর গর্বভরে শিল্পকৌশলী ভঙ্গিতে বললেন, 'আমরা করোনা ভাইরাসের চেয়েও শক্তিশালী।' নো পরোয়া, বাঙালি বীরের জাতি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক ভাইরাসের চেয়ে আমরা শক্তিশালী তো হতেই পারি। অন্যান্য বড় বড় শক্তিধর দেশ হার মানলেও করোনার কাছে আমরা হার মানবো কেন! চামচা-চামুণ্ডা যত আছে, জিব তাদের ঘোরে ফেরে– তারা কথার অনুকূলে ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত, যথেচ্ছ তৈলমর্দন। বিলকুল ঠিক হ্যায়, চাচা বল্লে কী-রে! একদম টাটকা মিহি আটার ফোলা রুটি, গরম ভাঁপ উঠছে। কথা বলতে গেলে মহান নেতা-নেত্রীদের একটু-আধটু স্লিপ অব টাং হতেই পারে। তবে সেটাকে পুঁজি করে সাফাই সাক্ষী গাওয়া কতটা শোভনীয়! রোগকে বিরোধী দল ভাবা উচিত নয়। ব্যবস্থাপনার বেলায়, 'মুনা যায় উজান, তো ধুনা যায় ভাটি'; কথার বেলায় চট্যাং-চ্যাটাং আদৌ গ্রহণীয় নয়। আবার কর্তা যা বলেন– সবই খাঁটি কথা; 'বড় মধুমাখা হে আমার বয়াতির বচন, বড় মধুমাখা হে–' সব সময় চলে না। এই দুর্দিনেও চামচা, তোষামোদকারী নিয়ে একটা গল্প না বলে পারছিনে:

একটা গানের আসরে বয়াতি গান গেয়ে চলেছে। সাথে ঢুলি-বাজনদার আছে– বয়াতির তালে তাল দেওয়ার জন্য। চারদিক ঘিরে দর্শককুল। ভারী ঢোল ঢুলির

গলার সামনে ঝুলিয়ে রাখতে হয় বলে ঢুলিকে একটু চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গানের তালে-তালে ঢোল বাজাতে বাজাতে যেই-না ঢুলি অন্য দিকে ঘুরতে গেছে, গেছে চিত হয়ে পড়ে। ঢুলি না-উঠে চিত হয়ে শুয়েই ঢোল বাজিয়ে চলেছে বেদম উৎসাহে। দর্শক ভাবছে, এটা আবার কেমন হলো! ঢুলি ওঠে না কেন! দর্শকদের একজন বললেন, আপনাদের ঢুলিকে কেউ একজন ধরে উঠান। মঞ্চ থেকে ঢুলির এক চাটুকার বলে উঠলেন, 'না-না, দাদা, এখন উঠানো যাবে না, বাজনার দেখেছেন কী! এটা হলো ওস্তাদের 'চিতড়ি বাজনা।'

বিভিন্ন ধনী-ক্ষমতাধর দেশ যেখানে কুপোকাত হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের বীরত্ব দেখানোর কী আছে? বরং এ মহামারি আমাদের সাবধান হওয়া ও প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সময় দিয়েছে। আমরা হালকাভাবে, তামাশাচ্ছলে নিয়েছি। কথায় বলে, 'হাম বড়া বীর হ্যায়! যুদ্ধ কবে? আগামীকাল। হাম যায়েগা পরশু, হাম বড়া বীর হ্যায়!' একটু অপেক্ষা, কত রকমের দুর্নীতি, ফন্দিফিকির যে এ নিয়ে আসছে, তখন দেখা যাবে, 'কত ধানে কত চাল হয়।' শুধু একটু অপেক্ষা! মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কি যথাযথ সমন্বয় হচ্ছে? মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর কর্মকাণ্ড, অব্যবস্থা কি শুধু আজ দেখছি, না আজন্ম দেখছি? কোনো উন্নতি করতে পেরেছে কি? বিভাগগুলোর দুর্নীতির খতিয়ান কি শুধু আজ রাতের, না-কী যুগ যুগ ধরে পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে? প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। পুরোদমে করোনা শুরু হলে সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ পাওয়া যাবে না, এমনকি অক্সিজেনও পাওয়া যাবে না। টেস্ট করতে দেবেন, বালতি টেস্ট শুরু হয়ে যাবে। (স্যাম্পলটা বালতির মধ্যে ফেলে দিয়ে মনগড়া একটা রিপোর্ট ধরিয়ে দেবে, যাকে এ দেশে বলে বালতি টেস্ট)। বেসরকারি হাসপাতালে যাবেন, গলা-কাটা চার্জ আদায় করবে। উন্নত চিকিৎসার নামে এমনিতেই বেশি খরচ ধরবে, এর সাথে থাকবে অতিরিক্ত বর্ধিত রিস্ক-প্রিমিয়াম। এত টাকা দিতে সাধারণ মানুষ অপারগ। একদিকে জীবন, অন্যদিকে টাকা। সে-সাথে অবহেলাও যোগ হবে। সত্য কথায় খালু বেজার। আমি দেখছি, চারদিকে হাটে-হরিবোল অবস্থা; বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে লেজেগোবরে অবস্থা, এটাই সত্য। আমি যত জায়গায় কথা বলেছি, উন্নয়ন নিয়ে লিখেছি, একটা কথাই বারবার বলেছি– অবকাঠামোর উন্নয়ন

কোনো উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন মানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন। একদিকে মানুষের চরিত্রকে ধ্বংস করার যত উপাদান সামনে এনে দেবো, মেরে-কেটে খাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবো, আবার উন্নয়ন চাইবো– এটা হতে পারে না। বিপরীতমুখী ঘটনা একসাথে ঘটতে পারে না। আমরা এটাকে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ঘটনা বলি। বাস্তবতাও তাই বলে। আমরা মানি আর নাই-বা মানি।

ইউটিউবে কেউ কেউ বলছেন, তথ্য আছে, সিদ্ধান্ত আছে; তথ্য নেই সিদ্ধান্ত নেই। সঠিক তথ্যটা মিডিয়াতে দিতে এতো রাখঢাক কেন? তাহলে কি আমরা করোনা প্রতিরোধেও 'বিশ্বের রোল মডেল' হতে চাচ্ছি? এ দেশে সহজে করোনা ভাইরাসে লোক আক্রান্তও হচ্ছে না, মরছেও না। যা মরছে তার অধিকাংশ নিউমোনিয়া কিংবা এজমা রোগে; পুরাতন রোগ ছিল তাই। আমরা চিকিৎসাসেবা ও উদ্ধারসেবা আক্রান্ত ও মৃত রোগীর বাসায় বাসায় দিয়ে বেড়াচ্ছি। আর হাসপাতাল তো আছেই। সরকারি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা ছাড়া একটা রোগীকেও মরতে দেব না।

হাসপাতালগুলোর ও স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি কি এক দিনের, না যুগ-যুগান্তের ? যা অতীতে দেখেছি এখনও তাই-ই চলছে; বরং দুর্নীতির কৌশল আরো বেড়েছে। ফোনে-ফোনে যেসব তথ্য পাচ্ছি, পরিস্থিতি কেয়ামতের ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটে আক্রান্ত রোগী মারা গেছে। কিছু করার নেই, মুখখানা দেখার চেষ্টাও নেই। মৃতের শোকাতুর লোকজন পাশের ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কাচ্ছে, আর্ত চিৎকার করছে– কেউ দরজা খুলছে না। কেউবা দরজা আটকে মৃতের জন্য ডুকরে কেঁদে উঠছে। শেষ দেখাটাও হচ্ছে না। এ-রকম কত যে হৃদয়-ছোঁয়া ঘটনা ঘটছে, না শুনলে কল্পনায় আসে না। বিষয়টা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির ব্যাপার। কিছুদিন পরেই বাস্তবতা নিয়ে থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। তখন মখু চাপা দেওয়া চলবে, কিন্তু ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বড় ধামার অর্ডার পার্শবর্তী দেশে দেওয়া লাগবে। আমার মা বলতেন, 'সোজা পথের মার নেই।' পানিতে যতই নামবো, কাপড় ততই ভিজবে। এ ক্ষেত্রে কাপড় বাঁচাতে হলে দিগম্বর হয়ে পানিতে নামতে হবে। নিজে নিজের অনেক কিছুকে দেখা যাবে না, অন্যরা কিন্তু দেখবে। সময় থাকতে সাধু সাবধান হওয়াই তো ভালো ছিল। রোগের সাথে শক্তিমত্তা যতই দেখাই না কেন,

'সময় গেলে সাধন হবে না।' অন্য আরেকটা জিনিসও আছে। প্রকৃতি যখন তার ভয়ংকর রূপে আবির্ভূত হয়, তখন তার সামনে মানুষের তৈরি কোনো শক্তিই টিকতে পারে না। এটা আমাদের বোঝা দরকার। এই-যে অসংখ্য দাগী কুলাঙ্গার প্রতিনিয়ত হাজার হাজার কোটি টাকাসহ ধরা পড়ছে, সবাই রাজনীতির লেবাস ধরেই, ক্ষমতার দাপট দেখিয়েই দুর্নীতিটা করছে। আর ক'টাই-বা ধরা পড়ছে! লালন গেয়েছিলেন 'অধরা পাখি আমার যায় না ধরা।' দেশের মধ্যে করে নড়াচড়া। আমরা পায়ের দাপট শুনি, চুপ থাকি। আমরা তো সব বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ঘরে বসেই দেখছি। সংখ্যা এত বেশি পরিমাণে যে, রাজনৈতিক দল 'কোনো সম্পর্ক নেই', 'সম্পর্ক নেই' বলে চিৎকার করলেও কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করছে না। কারণ এইসব লোকের আনুকূল্যে পুরো দল চলছে, আবার ধরা পড়লেই 'কর্ম-বিরুদ্ধ কথা' বলে নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীর পাতা সাজতে হচ্ছে। এ আবার কেমন ব্যাধি? বার-বার একই 'ভালো সাজার নাটক'। আমার মা বলতেন, 'ভালো পথে থাকরে কানা, তোর অন্ধকারেও মিলবে দানা।' আত্ম-জিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়া রাজনৈতিক দল কি এ দেশে আদৌ আছে? না-কী আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা, দাম্ভিকতা ও মিথ্যার বেসাতি করে টিকে আছি?

প্রসঙ্গটা যেহেতু জীবনাচার ও কর্ম, অতীতের দু-চারটা উদাহরণ যোগ করলে নিশ্চয়ই 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়া হবে না। কথাগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো একটু আলতোভাবে উল্টালেই চোখে পড়বে। দেখি, ইতিহাস কি বলে। চেঙ্গিস খান বিশ্বের অনেক অঞ্চলে অতি নির্মম ও রক্তপিপাসু-বিজেতা হিসেবে চিহ্নিত। নারী, শিশু, পুরুষ কেউ-ই চেঙ্গিস বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে পারেনি। যে চেঙ্গিস ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে ধ্বংস ও রক্তপাতের ভয়াল প্রতিশব্দ হিসেবে, মঙ্গলদের কাছে এখনও সে দেবতুল্য।

ভারতের মারাঠাদের আরেক নাম বর্গী। লুটতরাজ, দখল, চুরি ও নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর নাম মনে এলেই মাথার মধ্যে 'বর্গী' শব্দটা চলে আসে। এ-দেশে আজও বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে মায়েরা বর্গীর ভয় দেখিয়ে ছড়া বলতে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। তারাও ভারতীয়।

সিংহাসন দখল করার জন্য গ্রিক ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সহায়তায় তার রাজপরিবারের সব পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেছিল সম্রাট অশোক। একমাত্র সহোদর তিসা বাদে ৯৯জন ভাইকে একে একে সে হত্যা করেছিল। কলিঙ্গের যুদ্ধে মৃত্যুর মিছিল ও ধ্বংসযজ্ঞের বিভীষিকা তাকে খান্ত করেছিল। কিন্তু তার আগে রক্তপিপাসাই ছিল তার ব্যামো।

লর্ড ক্লাইভ– একজন সাধারণ কেরানি থেকে কূটকৌশল ও শঠতার মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী। সমগ্র বিশ্বের কাছে একজন দুর্নীতিবাজ, জালিয়াত ও প্রতারক হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষে রেখে গেছে ঘুষ, দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, দুর্বৃত্তায়ন আর অপরাজনীতির এক জঘন্য রক্তবীজ। মামলা, একাকীত্ব আর অনুশোচনার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে সে নিজের গলায় ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল বলে প্রচলিত আছে। লর্ড ক্লাইভ মরেও ইতিহাসের পাতায় বেঁচে আছে, এক ঘৃণিত বিদেশি প্রভুর প্রতিভূ হিসেবে।

এসব ইতিহাস লিখতে গেলে কয়েকটা ভলিউমেও শেষ হয় না। বর্তমান সময়েও এ-সব প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা আছে। প্রতারণা, জালিয়াতি, ক্ষমতার দাপট, দাম্ভিকতা, অর্থ আত্মসাৎ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ধরন বদল হয়েছে মাত্র। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অন্যায়-অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ, গুম, ডাহা-মিথ্যা মহাসময়ের কাছে ভোর রাতের ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন মাত্র। কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটা বাক্যের, তা সে যত দীর্ঘই হোক-না কেন, পূর্ণ যতিচিহ্ন তার থাকবেই। যে জীবের জন্ম হয়েছে, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। দম্ভ, অত্যাচার, হত্যা, টাকা ও ক্ষমতার দাপট চোখের ক্ষণিক কুহেলিকা মাত্র, মতিভ্রম। এই নির্মম কঠিন মাটির উপর দিয়ে একটু হিসাব কষে সমাজে চলা দরকার। এ মাটি সব কিছুকেই হজম করে আজও টিকে আছে। প্রতিটা প্রাণি কী এক অজানা সুতোর টানে অলীক দাপট পিছে ফেলে রেখে, কেউবা ভূ-অভ্যন্তরে, কেউবা ছাই হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ-বিশ্বের কত রাজত্ব, রামরাজত্ব, আকাশচুম্বী টাওয়ার, প্রাসাদ কোথায় যে হারিয়ে যাচ্ছে বা গেছে তার হিসাব মানবজাতির কাছে অজানাই রয়ে গেছে।

আমাদের একটু ভেবে-চিন্তে পথচলা দরকার। নইলে ইতিহাস ও প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম। এই প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না। এই প্রকৃতির আরেক নাম 'ইয়া কাহহার' (কঠোর, মহাপ্রতাপশালী, দমনকারী)।

আগের কথায় ফিরে আসি। এতক্ষণ ধানের হাটে মুখ-চুলকানো ওল নামিয়েছিলাম।

বিশ্বের অন্যতম ঘন-জনবহুল এই বাংলাদেশ। এ দেশের তাবত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপ্রশিক্ষিত, টাউটারী রাজনীতির মদদপুষ্ট একদল ধূর্ত জনগোষ্ঠীরও বসবাস এখানে। করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ একবার শুরু হলে কোনো দোয়া-দাওয়াতেই কাজ হবে না। চীনের উহান প্রদেশকেও হার মানাবে। আমরা যেহেতু 'জেনে-শুনে বিষ করেছি পান', করোনা ভাইরাস এ দেশ ছেড়ে সহজে যাবে না। 'দিল্লি হনুজ দূর অস্ত'। এখানে সরকারি চিকিৎসাসেবা নিতান্তই অপ্রতুল, চুরি-চামারি, দুর্নীতি ও গোঁজামিলে ভরা। অনেক অপকর্ম ও অপচেষ্টার মাধ্যমে এটা আমরা অর্জন করেছি। সহজে এর থেকে নিস্তার পাবো না। প্রকৃতি সহায়ক না হলে ঘরে ঘরে লাশ সৎকারের অপেক্ষায় পড়ে থাকবে। সবাই 'আমার কী হবে! আমার কী হবে!'– বলে ছোটাছুটি করতে থাকবে। সাহায্য করার কেউ এগিয়ে আসবে না। সময়টা নরকের চেয়েও ভয়ংকর হবে। তবে আশার কথা একটা আছে। এ সময়ে হয়তো এটা বলা নির্মম রসিকতাও হতে পারে। বাঙালি প্রতিনিয়ত ভেজাল খাবার ও ভেজাল বাতাস নিতে নিতে এদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু বেশিও হতে পারে। আবার খেটেখাওয়া মানুষগুলো রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে বলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে, করোনা ভাইরাস অনেকের শরীরের উপর বড় রকমের প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। আবার একই ভাইরাস প্রতিনিয়ত রূপ পরিবর্তন করার কারণে সব জায়গায় সমানভাবে আক্রান্ত না-ও করতে পারে। আবার ফুসফুসে কম পরিমাণ ভাইরাস ঢুকে একজনকে কম আক্রান্ত করতে পারে। এভাবে ভাইরাসের আক্রান্ত করার প্রবলতা কমে যেতে পারে। বাঙালিকে বিশ্বাস করা যায় না, টিকে যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে, 'ঝড়ে বক মরবে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়বে' প্রবাদও সত্যে পরিণত হতে পারে।

আল্লাহতায়ালা এ-প্রবাদ সত্যে পরিণত করুক, ফকিরের কেরামতিও থাক– এ প্রত্যাশা করতেই হয়। (খোদাতায়ালা রোগের প্রকোপ আমাদের জন্য একটু কমিয়ে দিক, আবার সহজসাধ্য একটা ওষুধের অছিলা করে দিক– এটাই প্রার্থনা)। এছাড়া ছা-পোষা জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগার ৫/৬ মাস বন্ধ থাকলে অসহায়-ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠবে। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ নিয়েই আমাদের যত সমস্যা। লক্ষ লক্ষ লোক চাকরি হারাবে। মালিকপক্ষ টাকা দিতে পারলেও পকেটের টাকা বের করতে চাইবে না, বারবার সরকারি সাহায্যের দাবি তুলবে। সরকারি রিলিফ-বরাদ্দ যতই দেওয়া হোক না কেন– 'চাটার দল' চেটেই তার সিংহভাগ খেয়ে সিস্টেম লস বলে চালিয়ে দেবে। ছিটেফোঁটা খবর পত্রিকাতেও আসবে। রাজনৈতিক দলও 'চাটা' পোষার মতলব নিয়ে বণ্টন পদ্ধতি পরিবর্তন করবে না। শুধু হুমকি-ধামকি দিয়ে ক্যামেরার সামনে গিয়ে উড়ো ফায়ার করবে। কারণ, এ দেশে দুর্নীতি-অনৈতিকতা-অসততার মহামারি করোনা মহামারির অনেক আগ থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এখন শেষ পর্যায়ে চলছে।

জনসেবা করতে গিয়ে, দলভারী করতে গিয়ে, বা রাজনীতির 'রোল মডেল' হতে গিয়ে স্থানীয় সরকারেও এখন রাজনীতির দুষ্টক্ষত পুশ করে দিয়েছি। রাজনীতির ছোঁয়া, স্বজনপ্রীতি, টাউটারি এখন ঘরে-ঘরে, গোহাটে, গোয়ালে, বাসরঘরে। সিলেকশন যদি করে থাকি চোর-ডাকাত, ধূর্ত, মোনাফেক– ট্রেইনিংও সে উদ্দেশ্যেই দিয়েছি; উন্নয়নের জন্য টাকা বিনিয়োগের সময় কিংবা রিলিফ বণ্টনের সময় হঠাৎ ভালোমানুষ আসবে কোত্থেকে? এ দেশে ভালো, সুস্থ চিন্তাধারার বিবেকবান লোক সক্রিয় রাজনীতিতে পারতপক্ষে আসে না; আসে যত লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, খলনায়ক, চাটুকার, গণধূর্ত, অন্ধকারে যারা একবারে ধনী হতে চায়, তারা। এরা এক রাতের মধ্যে চরিত্র বদল করবে কীভাবে? আমরা ক্রমশই এ-দেশের রাজনৈতিক দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি। এ থেকে মুক্তি পাওয়া এত সহজ নয়। বিপ্লবীরা হয়তো বিপ্লবের কথা বলবেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব এলেও তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। মানুষকে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্যের মধ্যে রেখে যত সহজে গরু, ছাগল,

ধূর্ত শেয়াল বানানো যায়, তত সহজে তো আবার ফেরত আনা যায় না। সুতরাং বিপ্লবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সম্ভব, সিস্টেম পরিবর্তন করা সম্ভব, কিন্তু মানুষকে মানবসম্পদ বানাতে হলে আবার অনেক-অনেক সময় জীবন-আয়ু থেকে ব্যয় হয়ে যায়।

কাঁঠালগাছের নিচে একটা টেবিল যদি পেতে দিই, যে ছাগলই হোক টেবিলে উঠতে দিলে কাঁঠাল পাতা সে খাবেই। নিজের পোষা ছাগল হলে তো আর কোনো কথাই নেই– নির্ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাবে আর আরামে পাতা খাবে। আগেই খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল এমন প্রাণির, যা কাঁঠালপাতা খায় না। আর কত বলবো! শেখ সাদীর একটা কবিতা পড়েছিলাম, সারমর্মটা এ-রকম: বিড়ালের যদি পাখা গজাতে দেওয়া হতো, তাহলে ঘরের চালে বসবাসকারী শান্তিকামী চড়ুই পাখিগুলোর জীবন সংহার হয়ে যেত। আমরা তো রাজনীতির নামে এ দেশে বিড়ালরূপী– সংহারকারী খাদক লক্ষ লক্ষ তৈরি করেছি এবং পুষছি। এখন তারা শুধু চড়ুই পাখি কেন– হাতি-ঘোড়া, খাজাঞ্চিখানা, জনসম্পদ পুরোটাই গিলে খাবে। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। এটা তো অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল। রোগের চিকিৎসা না-করিয়ে আমরা মলমের প্রলেপে বেশি বিশ্বাসী। ফল যা হবার তা তো হবেই। স্পিল-ওভার ইফেক্ট বলে কথাটাকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশটা আসলে ধ্বংস হচ্ছে তো রাজনীতির নামে দলবাজির কারণে, রাজনৈতিক দাসত্বের কারণে, নৈরাজ্যবাদিতার কারণে। মাছের বাজারে গিয়েও রাজনীতি, বিয়ের আসরেও রাজনীতি, গোল্ড মেডেলেও রাজনীতি, আইন-বিচার নিয়েও রাজনীতি। রাজনীতি এখন জন্মে, জীবনে এবং স্বর্গে যাবার পাথেয়; প্রজানীতিরই কেবল অভাব।

কথাগুলো অতি রূঢ়, তবে নিষ্ঠুর বাস্তব। হৈ হৈ করে তেড়ে না-এসে নিজ-নিজ কাজে মনোনিবেশ করা ও সংশোধন হবার চেষ্টা করা ভালো। এই বিপদের মধ্যে তিনটা জিনিস অতি জরুরি– করোনা টেস্ট, অল্প টাকায় করোনা টেস্ট, চাওয়া মাত্রই করোনা টেস্ট। এর পর অন্য কিছু। রোগটা প্রথমে ধরা পড়লে, আলাদা হয়ে থাকলে, ব্যবস্থাপত্রটা প্রথমে নিলে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা কমে যাবে। যদি বুঝহ সুজন, সেই কাজ এক্ষুনি করো দিয়ে মন।

আজ এপ্রিলের ৫ তারিখ ২০২০। ক'দিন এভাবে কলম চালাতে পারবো, বিধাতাই ভালো জানেন। অনেক প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যেতে হয়। দায়িত্বহীনতার কারণে অনেকেই রোগের কথা প্রকাশ না-করে সাধারণের সাথে মিশছে। এছাড়া অফিসে যেতে হচ্ছে, যে কোনো সময় আক্রান্ত হবার আশঙ্কা। তবে যতক্ষণ আছি, কলম চলবে আশা রাখি। আরো অনেক বিষয়ের উপর কিছুটা হলেও আলোকপাত করতে হবে বলে মনস্থির করেছি। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য বিষয় নিয়ে আসতে হবে। হাতে সময় একদম কম।

তিন

এই মহামারির মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। উদ্দেশ্য, যতদিন স্বাভাবিক অবস্থা না-ফিরে আসে ততদিন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্পর্শে রাখা। তাছাড়া অনেক ছাত্রছাত্রী আগে-আগে সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে কর্মজীবনে চলে যেতে চায়, তাদেরকে সহায়তা করা। আবার আমাদের সময়ে সেশনজটে পড়ে অনেক বছর জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, সে অবস্থা যেন না-হয় তার ব্যবস্থা করা। তবে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে ইউজিসির গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করতে হয়। অন্যান্য দেশে কর্মরত সহকর্মীদের সাথে মাঝে-মধ্যে কথা হয়, সে-সব দেশেও অনলাইনে শিক্ষা-কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। তারা তাদের জীবনের মূল্যবান সময়কে কোনোভাবে নষ্ট করতে চায় না।

এর মধ্যে এ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী অনলাইনে শিক্ষা-কার্যক্রম চালানোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এজন্য তারা প্রচার হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করছে। একতরফা অনেক আপত্তিকর কথাও কেউ কেউ প্রচার করছে। তাদের অভিযোগ অসংখ্য। বাড়িতে ল্যাপটপ নেই, স্মার্ট-ফোনে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না, কেউ কেউ অসুবিধার মধ্যে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ তথ্য নিলে জানা যাবে, এই স্মার্ট-ফোন দিয়েই কেউ কেউ ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে অপ্রয়োজনে রাতের-পর-রাত জেগে চোখজোড়া লাল ও শরীরটা বিবর্ণ ও কৃশকায় করে ফেলেছে। কখনো ফেসবুক ব্যবহার করে সমমনাদের নিয়ে ‘ক্লাস হবে না, অনেক অসুবিধা, নেটওয়ার্ক নেই’ ইত্যাদি ইত্যাদি শত অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখছে, কেউবা টিটকারি করছে, কেউবা সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে। আবার বয়সের বাতিকগ্রস্ত হয়ে নেশার কারণে টাকা খরচ করে ব্যান্ড-উইডথ কিনে রাতের-পর-রাত অপ্রয়োজনে টাকা ও সময় ক্ষয় করছে। বই ছোঁয়ার কথা বললেই যত অসুবিধা, যত অজুহাত। মূলত এরা এ সময়ে লেখাপড়া করতে চায় না। জীবনকে একটু-আধটু উপভোগ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজের জন্য লেখাপড়া করে না, শিক্ষার তৃষ্ণা এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। এরা জীবন-উদাসীন। এভাবেই এরা স্কুল-

কলেজের লেখাপড়া শেষ করে এসেছে। জ্ঞানার্জনের পিপাসা নেই। ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত। চোখে-মুখে ভিন্ন রংয়ের ছোঁয়া। আমাদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এভাবেই তাদেরকে গড়েছে। বাপ-মার জন্য লেখাপড়া করে। তাই সুযোগ পেলেই ফাঁকি দিতে চায়। বিনা-পরিশ্রমে একটা সার্টিফিকেট চায়। এদের গলার স্বর উৎক্ষিপ্ত ও উত্তত। নিজেদের মতামতকে ছড়িয়ে দিয়ে সমস্বর ও সমাকীর্ণ করার অদম্য চেষ্টা। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ মানসিকতার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। হাতে গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় পাবেন সেখানে এ সংখ্যা কিছুটা কম। ভালো ছাত্রছাত্রীগুলো অবশ্য অতটা উচ্চস্বরধারী নয়; নিরিবিলি থাকতে চায়। তাদের জীবন বাস্তবমুখী; জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে চায় না। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিয়ে ভাবে ও বোঝে। ফেসবুকেও সরব নয়। ছাত্রজীবনে এরা ভোগে বেশি, অথচ কর্মজীবনে ভালো করে। আমরাও নিশ্চিত যে, অল্প কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অনলাইনে ক্লাসের সময়ে নেটওয়ার্ক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে আরও ভিন্ন পথ ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যত ছাত্রছাত্রী একজোট হয়ে সমস্যাটা যত প্রকট বলে দাবি করছে, বাস্তব অবস্থা ততটা নয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা ভিন্নধর্মী। তারা গঙ্গাধর। গঙ্গামুখো পা। প্রশাসনের উদ্যোগে কমতি। ‘ক্ষতি হলে মহাজনের হবে, টাকা দেবে গৌরী সেন’; শুধু হাল ধরে বসে থাকা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর স্তাবকগিরি করা। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভাবার অতশত সময় কোথায়! একটা ডিপার্টমেন্ট এগিয়ে আসে তো অন্য ডিপার্টমেন্ট পিছটান মারে– যার যার অবস্থানে রাজাধিরাজ। এছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাও কম।

এ পর্যন্ত লেখার মধ্যে বর্তমান এ-দেশীয় শিক্ষা, শিক্ষার্থীর মানসিকতা, শিক্ষার পরিবেশ, সার্বিক জীবনাচার ও কর্ম জড়িত। দীর্ঘ তিন যুগ ধরে শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছি। দেশ-বিদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কখনো-বা স্বায়ত্তশাসিত পেশাদারি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কিংবা শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ফলে, এ-দেশের শিক্ষাজগৎ নিয়ে দু-চারটা মতামত প্রকাশ করার পরিপক্কতা আমার এসেছে বলে আমার বিশ্বাস।

অন্য কথা বলার আগে দু-একটা শব্দের ব্যবহার আমার মতো করে বলে নিতে চাই, যা পরে বারবার ব্যবহৃত হবে। এ দেশে 'এডুকেটেড' এবং 'লিটারেট' শব্দযুগল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। এদের বিপরীত শব্দ হিসেবে 'আনএডুকেটেড' এবং 'ইলিটারেট' শব্দদ্বয়ও ব্যবহৃত হয়। 'এডুকেটেড' মানে 'সুশিক্ষিত' এবং 'লিটারেট' মানে 'অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন'। তেমনিভাবে, 'আনএডুকেটেড' মানে 'অশিক্ষিত', আবার 'ইলিটারেট' মানে 'নিরক্ষর'। আমরা দুটো শব্দকে গুলিয়ে ফেলি। এ দেশের সার্টিফিকেটসবর্স্ব দুরাচার, মানবতাহীন ব্যক্তিদের আমি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনতে নারাজ। যদিও বি.এ. এম.এ. পাসের সার্টিফিকেট অনেকের আছে। সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে বেড়ানো ছাড়া এদের মধ্যে যে শিক্ষা আছে, চিন্তা-চেতনায় তা বোঝা যায় না। আবার প্রতিটি জনপদে পাড়ায়-মহল্লায় লাঠি ও দেশী-বিদেশী অস্ত্র হাতে ফিটফাট কাপড়-পরা ফাইভ পাশ, টেন পাস, কেউবা ষোল ক্লাস পাস যে যুবক-তরুণ জনগোষ্ঠী ক্ষমতা ও রাজনৈতিক দাপটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধরতে আমার আপত্তি– এরা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। যার মধ্যে সুশিক্ষাই নেই তাকে আমি শিক্ষিত বলি কীভাবে? এরা অশিক্ষিত, এদেরকে বড় জোর মূর্খ বলা যেতে পারে। চিন্তায় ও কাজে মূর্খতা আছে, তাই এরা মূর্খ। লেখা এবং পড়া জানা কত মূর্খ লোক যে এ-জনপদে গর্বভরে দাপটের সাথে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে– তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই মূর্খদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়– 'গো-মূর্খ' এবং 'হস্তি-মূর্খ'। 'গো-মূর্খ'দের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে গরুর মতো কাঁধে জোয়াল দেওয়া সম্ভব এবং কালক্রমে ইস্তেমাল করিয়ে লাঙল টানানোও সম্ভব। অর্থাৎ এদের পোষ মানাতে পারলে পোষ মানে। কাজ করিয়ে নেয়া যায়, কথা শোনে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এদেরকে গো-মূর্খ বানিয়েছে। মূলত এদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে মনুষ্যসমাজে একীভূত করা যায়। কিন্তু যত গোল বাঁধে হস্তি-মূর্খদের নিয়ে। এদের কাঁধ এত উচুঁতে যে, নাগাল পাওয়া যায় না। তাই কোনোদিন কাঁধে জোয়াল দেওয়া সম্ভব হয় না। কোনো ভালো জিনিসও তারা মেনে নেয় না। জোয়ালের ভর তারা নিতেও চায় না। প্রয়োজনে ঝাড়া মেরে ফেলে দেয়। কোনো বুঝই তারা নেয় না। 'পিরীতে মজেছে মন, কীবা মুচি– কীবা ডোম', 'সকলি গরল ভেল' কিসিমের। এদের নিয়ে যত বিপত্তি। নিরেট মূর্খ লোকদের সাথে যে উঠাবসা

করে, শলাপরামর্শ করে, তাদের কথা বিশ্বাস করে, সে নিজেও নিশ্চিতভাবে মূর্খ। সে বুঝতেই পারে না যে, মূর্খের সাথে একমাত্র মূর্খেরই সখ্য গড়ে ওঠে। এরা শিক্ষা নিতে জানে না, নিতে চায়ও না। এ দেশে এদের সংখ্যা বেশুমার। ফার্সি ভাষায় এদের মোটামুটি সমার্থক শব্দ (যা এ দেশেও বহুল প্রচলিত) হলো 'গুমরাহ'। 'গুম' অর্থ গায়েব, অদৃশ্য, নিখোঁজ। 'রাহা' মানে 'পথ' বা রাস্তা। 'গুমরাহ' শব্দটা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত, যার অর্থ বিপথগামী বা পথভ্রষ্ট– অর্থাৎ গুম হয়েছে পথ যার; বা বলা যায়, যে পথ হারিয়েছে। একজন পথ হারালে পথে ফিরে আসা হয়তো আর হয় না। যদি হয় এ-তো কোনো গাড়ির ইঞ্জিন নয় যে, বদলে ফেললাম। যা যায় জীবনের মতো যায়। এ দেশে যারা এ প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়, জীবনের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় কিংবা জঘন্য রাজনীতির ছবক পেয়ে বা আশকারা পেয়ে সুশিক্ষা থেকে ছিটকে পড়ে এবং আইনকে থোড়াই কেয়ার করে। অধিকাংশরই আমৃত্যু সুস্থ জীবনে আর ফেরা হয়ে ওঠে না– হস্তি-মূর্খই রয়ে যায়। এরা 'না-মানে বারণ'। এদের পাপে ভোগে সাধারণ মানুষ– নিরীহ জনগণ। এটা তো সংক্ষেপে এ দেশের গুপ্ত ইতিহাস। মুখে বলা যায় না– বলতে গেলে ঘাড়ে মাথা রাখা দায়।

নিরক্ষর লোকদের 'অশিক্ষিত' বলা নিতান্তই অনুচিত। একজন নিরক্ষর রিক্সাচালক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিক্সা চালাচ্ছে। কখনো দেখেছি, টাকার থলি রেখে আরোহী নেমে গেছে। রিক্সাচালক টাকার থলিসহ রিক্সা নিয়ে আরোহীর পিছ-পিছ দৌড়াচ্ছে। আরোহীকে পেয়ে সে-আমানত সততার সাথে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সে পেটের জ্বালায় রিক্সা চালাচ্ছে। আমার তুলনায় টাকার প্রয়োজন তার কাছে অনেক বেশি। অথচ টাকার লোভ সে সামলে নিতে পেরেছে। টাকার থলিকে সে মহা-আমানত হিসাবে ভেবেছে। মালিকের কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত সে মানসিক তৃপ্তি পাচ্ছে না। এরা নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু এরাই প্রকৃত মানুষ। একে অশিক্ষিত বলা যায় কি-না, বলুন? বিপরীত কথাটা বলি– একজন লোক স্যুট-টাই পরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে নামি-দামি সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। কথাবার্তায় চৌকস, ইংরেজিতে ফুটফাট খই ফোটাতে পারে। একটা ডাস্টবিনের মধ্যে হঠাৎ একটা আধুলি পড়তে দেখলো। গাড়ি থেকে জলদি নেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলো। জিভ দিয়ে আধুলিটা চেটে উঠিয়ে পকেটে রাখলো। এমনই অগণিত লোক জনগণের আমানত

নিজ পকেটে পুরে দাম্ভিকতার সাথে বচন মেরে বেড়াচ্ছে। কিছু বললে, নিজের পোষা বাহিনী লেলিয়ে দিচ্ছে, অথবা তার পাহারাদার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বক্তাকে বেদম পেটাচ্ছে, কিংবা হয়রানি করছে, বা ধরুন, গুম করে ফেলছে। জুয়ার আখড়া থেকে কিংবা পাপিয়ার 'পাপরাজ্য' থেকে নিয়মিত মাসোহারা বাগাচ্ছে, রিলিফ মেরে খাচ্ছে, ঠিকাদারের বখরা পকেটে পুরছে, রাতকে দিন– দিনকে রাত বানাচ্ছে। এরা ক্ষমতার দাপটে যা-ইচ্ছে-তাই করছে। কিন্তু শিক্ষিতসমাজের তালিকায় এদের নাম লেখানো 'জোর করে জোয়ার্দার' হবার শামিল। মন তা কখনো মেনে নেয় না। মূলত, এরা মূর্খ বা গোমরাহ। সত্যনিষ্ঠ যারা তারা এদেরকে মেনে নিতে কোনোদিনই পারে না। আমার নাতিটা ক্লাস ওয়ানে ছড়া পড়ে, 'বাঁদর যতই চাদর পরিস বাঁদরামী তোর যাবে? মণ্ডা-মিঠাই দাও-না যতই বাঁদর কলা খাবে।' 'কুকুরের হয় সুখ ছাইয়ের গাদায়, শূকরের হয় সুখ পিচ্চট কাদায়' (বানু মোল্লার সায়েরি)।

এ দেশে প্রকৃত শিক্ষার বড় আকাল যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মানও ক্রমশ নিম্নগামী। কতটুকু নিম্নগামী তার হিসাব করা সহজ নয়। আর কত নীচে নামলে তলানিতে গিয়ে পৌঁছবে তা জানিনে; তবে সময় যে আর বেশি বাকি নেই, এটা বুঝি। সুশিক্ষার অভাবে জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়, যার প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। দুনিয়াতেই দোজখের আজাব ভোগ করতে হয়। জাতি ধীরে ধীরে অন্য জাতির গোলামে পরিণত হয়। অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাব এক-দুই বছরে বোঝা যায় না, কালক্রমে বোঝা যায়। তাও সবাই বুঝতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ মহাকালের নিরন্তর প্রবাহ ও কথকতা বুঝতে অপারগ। প্রকৃতিগতভাবে সে বোধশক্তি তার অনুপস্থিত। দেশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী সমাজ তা বুঝতে পারে। কিন্তু তখন আর করার কিছু থাকে না। আবার করার কিছু থাকলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তা আমলে নেয় না, তাই যা হবার তাই হয়।

মানুষ সুশিক্ষা নেবে, জ্ঞানার্জন করবে প্রথমত নিজের জন্য; ভালো পথ ও মন্দ পথকে পৃথক করে চেনার জন্য; পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য; পরিশীলিত বিবেকের জন্য; সচেতনতার জন্য– তারপর তার জীবিকার জন্য; তার সমাজ ও দেশের জন্য। এখানে সে-ধরনের শিক্ষা যদি অনুপস্থিত থাকে, কিংবা খণ্ডিত শিক্ষা হয়– সেক্ষেত্রে,

সমাজ ও রাষ্ট্রের কী গতি হবে? বরং দুর্গতিই বয়ে আনবে। কুৎসিত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষে সমাজ ভরে যাবে। সমাজ হবে ধূর্ত ও কুটিল বুদ্ধির আঁকড়া। তখন এ দেশকে দেশ না বলে জঙ্গল বলাই শ্রেয় হবে। বনের পশুকে আত্মরক্ষার জন্য স্রষ্টা নখ দিয়েছে, কারো দিয়েছে শিং। মানুষ রাজত্ব দখল করার জন্য বা অন্যকে আক্রমণ করার জন্য বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে তৈরি করেছে অস্ত্র। এমন হলে মানুষ আর পশুতে পার্থক্য থাকে কোথায়? মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব দুটোই আছে। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বেশি, সে-রকম দু-পাওয়ালা প্রাণিকে আমরা মানুষ বলি। মানুষ রূপী কোনো প্রাণির মধ্যে পশুত্বর আধিক্য দেখা দিলে, আর মানুষ না-বলাই ভালো, তাকে পশুতুল্য মানুষ বলা যায়। মনুষ্যত্ব আছে বলেই-না মানুষ, নইলে সে পশুর পর্যায়ে পড়ে যায়। যে সমাজ মানুষ রূপী এসব প্রাণিকে প্রাধান্য দেয়, সে সমাজে মানবতা, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা থাকতে পারে না।

এজন্য কোথাও হাডুডু বা ফুটবল খেলতে গিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হলেই প্রতিপক্ষের পা প্রকাশ্যে কেটে নিয়ে তা উচুঁ করে দেখাচ্ছে, উৎসব করছে, কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের নামে প্রকাশ্য স্লোগান দিচ্ছে। কেউবা মানুষের কাঁধকে সেতু বানিয়ে তা দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হচ্ছে। আমাদের কেউ-কেউ হাততালি দিচ্ছে, কোনো মহান নেতা মামলার তদবির করছে, সাহস জোগাচ্ছে; আবার তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে। আমাদেরকে এ বর্বরতা ও মূর্খতার খবর টাকা দিয়ে কিনে পত্রিকায় পড়তে হচ্ছে। আমাদের বিবেক, ন্যায়পরায়ণতা, মায়া-মমতাও ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। জিঘাংসাবৃত্তি দেখতে দেখতে ক্রমশ অনুভূতিশূন্য এক চামড়ার রোবটে পরিণত হয়ে গেছি। ভিতর থেকে কী-যে হারিয়ে ফেলেছি, তা একবার ভেবেও দেখিনি। বেশিরভাগ মানুষ মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন গতি এবং ঘটনাবহুল সময়ের প্রতিটি মাহেন্দ্রক্ষণ চিন্তা করতে অক্ষম। তথাকথিত রাজনীতি মাথার মধ্যে এমনভাবে ঢুকেছে যে, রাজনৈতিক মান-বিচারে হাসছি-কাঁদছি, মানুষকে অন্ধের মতো রাজনৈতিক বিচারে কোপাচ্ছি, পিঠে বোমা বেঁধে আত্মাহুতি দিচ্ছি, জবাই করছি, গুম করছি– রাজনীতির প্রতিহিংসার গোলামি করছি, আনন্দ-উল্লাস করছি। আহ্লাদে, দাম্ভিকতায় ফেটে পড়েছি– মনুষ্যত্বের দিকে একবারও ফিরে তাকাচ্ছিনে। চিন্তা, আচার-আচরণ ও কর্মে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত'কেও অনেক আগেই পিছে ফেলে

দিয়েছি। অনেকের ধারণা হতে পারে, বোধহয় আরবরা লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে পিছিয়ে ছিল বলেই, কিংবা বর্তমান সময়ের ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাক পরতে পারতো না বলেই সে-সময়টাকে 'অজ্ঞতার যগু' বা 'অন্ধকারের যুগ' বলা হতো। আসলে তা নয়। ঐতিহাসিকরা এ শব্দটিকে দিয়ে বুঝিয়েছেন, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সে-সময় সত্য-মিথ্যার কোনো পার্থক্য করা হতো না। শক্তিমানের মুখের কথাই ছিল আইন। অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, হত্যা ও রক্তপাত ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ-সংঘাত নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। প্রাত্যহিক ভোগ-বিলাস, জৈবিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও মানুষকূলে জন্ম নিলে যে মনুষ্যত্ব ও মহিমান্বিত কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। শাণিত বিবেক ও মনুষ্যত্ব যেখানে কোনো মানুষকে সতত পাহারায় না রাখে, সেখানে অন্যায়, অবিচার, ক্ষমতার দাপট অতি নিমিষেই সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বিবেক ও মনুষ্যত্ব-জাগানিয়া দিকটি কোথায়? শিক্ষা শুধু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে না। পুরো সমাজ, সংগঠন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সুশিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষাঙ্গনের কাজ করে। এ-দেশে এগুলো আদৌ আছে কি? থাকলে তাদের অবদান নিখাদ বিবেক দিয়ে বিচার করে দেখনু , নিশ্চয়ই না-সূচক উত্তর আসবে। আমি তো এই সাঁইত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এ দেশের কোথাও সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা খুঁজে পেলাম না। পুরোটাই ভোগবাদি, দলবাজি, নোংরামি ও আত্মস্বার্থ ভাবধারার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমশই আমরা চিন্তাধারা ও কর্মে অধঃপাতের দিকে যাচ্ছি। এভাবে তো মানুষ তৈরি করা যায় না। তৈরি হয় কিছু টেকনিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শী ভোগবাদী মানুষরূপী অন্য কোনো প্রাণি, যা দিয়ে সুস্থ সমাজব্যবস্থা; উদারমনা, অহিংস সমাজচিন্তা কিংবা কল্যাণমুখী সমাজ নির্মাণ একেবারেই অসম্ভব।

এই ভোগবাদ নিয়ে ওমর খৈয়াম তাঁর রুবাইয়াতে বলেছেন:

'এই বেলা ভাই মদ পান করে নাও
কাল নিশীথের ভরসা কই?
চাঁদনী জাগিবে যুগ-যুগ ধরে
আমরা তো আর র'বনা সই।

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতা শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'
(কাজী নজরুল ইসলাম)

আমরা আসলে ভোগবাদে মত্ত হয়ে, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে অভ্যস্ত হয়ে ফাঁকে পড়ে গেছি। জীবনের উদ্দেশ্য যে কী– তাও ভুলে গেছি। এক ছেলে ও তার বাপের মধ্যে কথোপকথন এ-রকম:

–মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি, বাবা।

–কেন, বাবা?

–তোকে-না অনেক ডিগ্রি নিতে হবে!

–অনেক ডিগ্রি নিয়ে আমার কী হবে?

–অনেক কামাই-রোজগার করবি, ভালো থাকবি, ভালো খাবি, পরবি।

–তারপর?

–সে কামাই-রোজগার শেষ বয়সে বসে খাবি, ভোগ করবি, নিশ্চিন্ত থাকবি। তুই খাবি, তোর সন্তান-সন্ততিরা খাবে, ভালো থাকবে।

–তুমি তো ঠিকই বলেছো বাবা। আমিও তাই করছি। কবে উপায়-রোজগার করবো, তারপর ভোগ করবো। ততদিন যদি না-বাঁচি! তাই তো আমি লেখাপড়া না করে এখনই তোমার সম্পদ ভোগ করা শুরু করে দিয়েছি। তুমি তো আমাদের ভোগের জন্যই এত সম্পদ বানিয়েছো, এটা আমরা বুঝি। জানি, ডাক্তার তো তোমাকে তেমন কিছুই খেতে দেয় না। সবই তো আমরা খাই। আমি অত বোকা নই যে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয় করতে থাকবো। দেখো না, প্রতিরাতে ফেসবুক দেখি, রাত ৩টা পর্যন্ত জেগে কত রসের ছবিই-না দেখি। তোমরা জীবনকে এত উপভোগ করতে পারোনি। সকাল ১১টা পর্যন্ত ঘুমাই। আমি প্রথম থেকে জীবনের পুরোটুকুই ভোগ করতে চাই। তুমি বোকা হলে আমিও যে বোকা হবো, তা তো নয়।

–তুই তো লেখাপড়াটা আগে করবি, তারপর অন্য কিছু।

–লেখাপড়া শিখে কী হবে, বাবা? তুমি যা উপায় করেছো, কিছুই তার লেখাপড়া দিয়ে করোনি। সবই তো তোমার বাড়তি রোজগার। লেখাপড়ার নামে ঐ নোটবই মুখস্থ করে লাভ কী? সবই পরে ভুলে যেতে হয়। আরেকটা নতুন ব্রান্ডের দামি মোবাইল ফোন বাজারে এসেছে, বাবা। ঐটা কিন্তু এই সপ্তাহেই আমি কিনবো।

এখন যদি প্রশ্ন করি, জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমি কিন্তু অনেককে, এমন কি আমার ছাত্রছাত্রীদেরও জিজ্ঞেস করে দেখেছি। সবাই ধোঁয়াশাপূর্ণ একটা উত্তর দেয়। মৌলভিসাহেবরা অবশ্য অন্যভাবে এটার ব্যাখ্যা করেন। শুধু ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। জীবনটাকে নামাজ-রোজা-হজের মধ্যে এবং তসবিহ-তেলাওয়াতের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেন। কেউ-কেউ সংসারত্যাগী হতে চান। আসলে জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? আমার বিশ্বাস, সুস্থ চিন্তাধারা ও উন্নত কর্ম না থাকলে জীবনের মূল্যায়ন হয় কী দিয়ে? বিশ্ব চলে কী করে? সেক্ষেত্রে, ভালো ফলাফলের আশাও দূরস্থিত। নামাজ, রোজা, হজ– এগুলো তো আমার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য; কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, এগুলোর মধ্যে সওয়াব না খোঁজাই ভালো। সুস্থ-বুদ্ধির মানুষ হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হই কী করে? মানুষ মনের মধ্যে প্রতিহিংসা নিয়ে নামাজ পড়ে কী করে! ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম’ বলে কী করে! প্রতিহিংসার প্রতিনিধিত্ব করি, মানুষ উধাও করি, আবার নামাজ পড়ি, কীভাবে! কোনোভাবেই উত্তর আসে না।

এ দেশের কমপক্ষে তিন কোটি নারীর ঘরে সকাল ৯টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভারতীয় টিভি চ্যানেল খোলা থাকে। সেখানে হিন্দি, বাংলা মিলিয়ে বিভিন্ন সিরিয়াল-নাটক, হিন্দি ছায়াছবির রমরমা আবেশ ও আসক্তি। ভদ্রলোকেরাও সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরে অন্যদের সাথে আবেশে মাতেন। আমি নিজ চোখে দেখেছি, বাড়িতে মেহমান এসেছে বলে আগে আগে রান্নার কাজ করতে হচ্ছে। সিরিয়াল দেখার নেশায় মশলা-বাটার পাটাটাকে রান্নাঘরের দরজায় এনে জোরে জোরে মশলা বাটছে, আর টিভির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে নাটক গিলে খাচ্ছে। এ-সব নিয়েই পরিবারে বা পরিচিতমহলে মুখরোচক আলোচনায় মশগুল হচ্ছে। দিন পার করছে। প্রতিটা সিরিয়ালে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-বিভেদ, প্রতিহিংসা ও

কুটিলতা শেখানো হচ্ছে। শিশু, কিশোর-কিশোরী এতে অভ্যস্ত হচ্ছে। হিন্দি ভাষা শিখছে, শিক্ষাঙ্গনে এসে সাথীদের সাথে সে-বিষয়ে গল্প করছে, হিন্দি বলছে। এসব বিষয় সামাজিকভাবে আত্মস্থ হচ্ছে। এ-সব টিভি দর্শকের জীবনের উদ্দেশ্য কী? সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। আমরা নির্বিকার। টিভি সিরিয়াল ও ছবি দেখতে দেখতে ছাত্রছাত্রীরা এতে আসক্ত হচ্ছে, অকালে সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছে, দিনে দিনে অধঃপাতে যাচ্ছে, বই পড়তে ভালো লাগছে না, কোনো ভালো জীবন গড়ার চেষ্টা করছে না। বাংলা জানে না, ভালো বলতেও পারে না; ইংরেজিও জানে না, ইংরেজি অক্ষর দিয়ে আধখেঁচড়া, আধমিশেলি অশুদ্ধ উচ্চারণের বাংলা লেখে। হিন্দি বোঝে ও ভালো বলতে পারে। কখনও কখনও শখ করে বন্ধুদের সাথে হিন্দি প্রাকটিস করে। কয়েক বছরের মধ্যে হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা করার দাবি উঠলে আশ্চার্যান্বিত হবার কিছু নেই। অতীতে উর্দু ভাষা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ভুল করেছিল। হিন্দিকে আমরা মনের টানে, হিন্দি সংস্কৃতি মনে ঢুকিয়ে আপন করে নিতে শিখেছি। কৌশলটা নেহাত মন্দ নয়।

আবার সেই মনুষ্যত্ব, সুশিক্ষা ও মানবতায় ফিরে আসি। বানু মোল্লা তাঁর সায়েরিতে লিখেছিলেন: ‘গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে-না খালি লোহার ছুরি।’ আমরা ইস্পাত ছাড়া ছুরি তৈরি করছি। আজীবন ভোঁতা ছুরি হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরো লিখেছেন, ‘পয়দাসের কালে যার বিসমিল্লাতে ভুল, তার ছেলে নবীর সরা না-করে কবুল।’ আমরা সন্তান-সন্ততিকে গড়ার সময়ই ভুল করে ফেলছি। এখানে মাদের যে ভূমিকা, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। সুশিক্ষার ক্ষেত্রে মা নিশ্চুপ। মা এখন ছেলেমেয়েদের সাক্ষী-রাক্ষসী।

ছেলে-মেয়ে পড়তে চায়না, মা-র পাশে গিয়ে টিভি দেখায় অংশ নেয়। কখনো মা ছোটখাটো ধমক দিয়ে ছেলেমেয়েকে ঘরে পড়তে বসিয়ে নিজে আবার টিভির সামনে এসে বসে। এভাবে কি লেখাপড়া হওয়া উচিত? যে দেশের মা-বাপ নিজের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখুক বলে আশা করে অথচ মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে না, বরং উল্টোটা করে– সেসব ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া হয় কী করে? ‘আমি

যা করি তা তোমরা করো না, আমি যা বলি তা তোমরা পালন করো'– এ নীতিবাক্য আদৌ ফলপ্রসূ হয় কী-না? অথচ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ঘরের ভিতর পর্যন্ত একই নীতি অনুসরণ করছি।

আমার শিক্ষকতা জীবনে হাজার-হাজার অভিভাবকের সাথে কথা বলতে হয়েছে। অভিভাবককে আসতে বললেই ছেলে-মেয়ের মা আসে। ছেলে-মেয়েকে সংশোধন করার কথা আদৌ মাথায় আনে না, শুধু সুবিধা চায়। ছেলে-মেয়ের পক্ষে কথা বলে। আদর করে, লাই দিয়ে সন্তানকে মাথায় তোলে। ছেলে-মেয়ে যা করে তাই ঠিক বলে মেনে নেয়, কিংবা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। সন্তানের কাজ-কর্মের, অভ্যাসের খারাপ দিকগুলো আমলেই আনতে চায় না। ছেলে-মেয়ে যখন ইঁচড়ে পেকে যায়, তখন মা কান্নাকাটি করে, অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভালোমানুষ সাজতে চায়। অনেক মাকে দেখেছি, ছেলে-মেয়ের যত অপকর্ম সব বাপের কাছে লুকিয়ে রাখে, বাপের চোখে কিছু ধরা পড়লে মা ছেলে-মেয়ের পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেয়, দোষ আড়াল করার চেষ্টা করে, বাপের সামনে ছেলে-মেয়ের উকালতি করে। এতে ছেলে-মেয়ের স্পর্ধা ও অন্যায় কাজের যৌক্তিকতা আরো বেড়ে যায়। পরিণতিতে যা হবার তাই হয়। এ দেশের মায়েরা আত্মসচেতন, বোধশক্তিসম্পন্ন ও সুশিক্ষিত হলে জাতি ও সমাজ অনেক দূর যে এগিয়ে যেত– এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার দেখা চোখে এটুকু বলতে পারি, যত ছেলে-মেয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে জীবন থেকে ছিটকে পড়ছে, না-ফোটা ফুল হয়ে অকালেই ঝরে যাচ্ছে, তার অধিকাংশের জন্য দায়ী এ দেশের মাতৃসমাজ। বাকি অংশের জন্য দায়ী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ।

একটা ঘটনা বলি। তখন আমরা ধানমন্ডির অফিসে বসতাম। প্রৌঢ়বয়সী এক দম্পতি আমার কাছে এলেন। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। দুজনই দেশের নামি ডাক্তার। সংসারে একমাত্র ছেলে। কাজের মেয়ে আছে বেশ কয়েকটা, তারাই সংসার দেখাশোনা করে। সংসারের খোঁজ ডাক্তার-দম্পতি তেমন একটা রাখেন না। সারাদিন হাসপাতালে কাটান; অতপর প্রাইভেট প্রাকটিস। রাত বারোটার আগে বাসায় ফেরা হয় না। ছেলেটা মেধাবী। ইংলিশ মিডিয়ামে 'ও' লেভেল পাস করেছে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে, হাউস টিউটরদের প্রত্যক্ষ অবদানে। 'এ'

লেভেল কোনোমতে টেনেটুনে পাস করেছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল একটা ডাকসাইটে নাম দেখে। ছেলেটার বাঙালি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বালাই নেই। আদব-কায়দার অবস্থাও তথৈবচ। ঐ ইউনিভার্সিটিতে আর যেতে ভালো লাগেনি। অনেক জুনিয়র পিছন থেকে এসে পড়েছে– সে বারবারই ফেল করেছে। সাথে বেশ ভালো(?) বন্ধু-বান্ধবী জুটেছে। নেশাসক্ত হয়েছে– দেদারসে টাকা ব্যয় করেছে। এখন না-কি ফ্রাসট্রেটেড। আমাদের এখানে ভর্তি করেছে, সেও এক বছরের বেশি। কয়েকবার ফেল করাতে অভিভাবককে ডেকে চলে-যাবার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়েছে। তাই আমার সাথে এতদিন পর ডাক্তার দম্পতির দেখা করতে আসতে হয়েছে। তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে বসতে বললাম। সাথে নিয়ে চা খেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'রিক্সাওয়ালার ছেলে ভাত খেতে পায় না, কাপড় পায় না, এ-প্লাস গ্রেড পায়। টিউশনি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, শেষে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে। সে ছেলেটা তার জীবদ্দশায় ফ্রাসট্রেটেড হয় না কেন? আপনার ধানমন্ডিতে বাড়ি, টাকা কাড়ি-কাড়ি, মা-বাপ উচ্চ-শিক্ষিত, সমাজসেবী। এতদিন পর বংশের একমাত্র বাতি– ছেলেটার দিকে তাকানোর সময় হলো? আগে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখান, তারপর কোথাও-না-কোথাও পড়ানো যাবে। দুজনে বিমর্ষ হয়ে অনেকক্ষণ আমার সামনে বসে থাকলেন। যাবার সময় আমি দুজনকেই লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলাম। যদি প্রশ্ন করি, কার দোষে এ-দম্পতির কপাল এমনভাবে পুড়লো? কেন এ দেশ একটা নেশাসক্ত-অপদার্থ সন্তান উপহার পেল?

মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত থাকতে হয়। বড় পদের বোর্ডেও থাকি, মধ্যম-ছোট পদের বোর্ডেও থাকি। মধ্যম ও ছোট পদের বোর্ডে যাবার সময় রুম থেকে একটা বাংলা ও একটা ইংরেজি সংবাদপত্র হাতে করে বেরোই। অথবা অন্য কাউকে বোর্ডের টেবিলে সংবাদপত্র রাখতে বলি। বিভিন্ন কলেজ থেকে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা স্নাতক-সম্মান সার্টিফিকেট হাতে বোর্ডে আসে। কখনো অবস্থাভেদে বাংলা পত্রিকার একটা হেডলাইন পড়তে বলি। হেডলাইনটা পড়া হলে ভেতরের অংশটা গল্প আকারে নিজে নিজে বলতে বলি। অধিকাংশই পারে না। হেডলাইনের ভিতরের অংশ

পড়তে বললে দ্রুতপঠনে সমস্যা হয়। এগুলো মোটামুটি ভালো পারলে খবরটার সামাজিক প্রেক্ষাপট– তারপর যদি ভালো পারে, সমস্যাটা সমাধানের উপায় জিজ্ঞেস করি। অধিকাংশকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারিনে। ইংরেজি দৈনিকের হেডলাইনটা অধিকাংশই ভালো করে পড়তে পারে না। 'কী বুঝলো' জিজ্ঞেস করলে কেউ কেউ এলোমেলো উত্তর দেয়, কেউ-বা চুপ থাকে। শিক্ষার কথা বাদ দিলাম, কী লেখা ও পড়া শিখেছে, আপনিই বলুন? একটা ড্রাইভার ফাইভ থেকে এইট পাস করে পনেরো হাজার টাকা মাসে বেতন চাচ্ছে। এর কম হলে কাজ করে না। এ দেশের কলেজ ও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছেলে-মেয়েরা এ বেতনের চেয়ে কমেও চাকরিতে যোগদান করতে চায়। তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ও সময় ব্যয় করে এ ডিগ্রি নেওয়ার সার্থকতা কোথায়? শিক্ষাও নেই, বিদ্যার ধারও নেই। গলদটা কোথায়? মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখে সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য যা শিখেছিল, ভুলে বসে আছে। আবার নতুন করে টাকা দিয়ে কম্পিউটারে টাইপ শিখতে হচ্ছে, চাকরি পাবার জন্য। চাকরিপ্রার্থী বলছে চাকরি নাই, বেকারত্ব একটা অভিশাপ, না-খেয়ে মরলাম। নিয়োগকারী বলছে, দক্ষ জনশক্তির বড্ড অভাব, ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে আবার সততাও আছে– এমন লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। বলুন, যাবটা কোথায়? কার কথা বিশ্বাস করবেন? পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট এবং রেজাল্টটা একবার খতিয়ে দেখুন, চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। আমি চার দিন ঘোরার পর একজন প্লাম্বিং মিস্ত্রিকে পেলাম। তাকে দিয়ে কাজ করালাম। ভবিষ্যতে তাকে আর ডাকবো না– অন্য একজন সৎ মিস্ত্রিকে খুঁজছি। আমাকে ঘোলা পানি খাইয়ে দিতে পারে এমন লোককে আমি চাইনে।

এ দেশে কেউ চক্ষুবিশেষজ্ঞ, কেউ বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, কেউবা নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, আবার কেউবা লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দার বিশেষজ্ঞ। সুদীর্ঘ তিন যগু ধরে এভাবে হাজারে হাজার ছাত্রছাত্রী দেখতে দেখতে, স্টাডি করতে করতে, একজন ছাত্রছাত্রীর প্রশ্নের ধরন শুনলেই তার ভেতরের বিদ্যার গভীরতা জানা হয়ে যায়। আমার প্রশ্ন, কেন আমাদের এ-দশা হলো? দেশের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হচ্ছে, আকাশ দিয়ে উড়ছে, পাতাল ফুঁড়ে নামছে, কখনো আবার হাইওয়ে দিয়ে সবেগে ধাচ্ছে; কিন্তু মানবসম্পদের এ দৈন্যদশা কেন? মানুষের মানসিকতার উন্নতি না-হলে কি দেশের

উন্নতি হয়? আমি গাঁজাখোর হলে এ-তত্ত্ব বিশ্বাস করতাম। আমরা লেফাফাদুরস্ত উন্নয়ন অর্থনীতির কথা বলছি। আমি দেখছি, এতে আয়-বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে। অবৈধ রোজগারে একশ্রেণির লেবাসধারী চতুর মানুষ ক্রমশই টাকার পাহাড় গড়ছে; অথচ আইন ও জবাবদিহিতার ঘর একেবারে ফাঁকা পড়ে আছে।

আবার সেই শিক্ষা-দীক্ষার কথায় ফিরে আসি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা খুবই কম। শুধু টেকনিক্যাল যে জিনিসটুকু না শিখলেই নয়– সেটুকুর ভাসা-ভাসা জ্ঞানার্জন, কেউবা এটুকু করতেও রাজি নয়। বই পড়তে চায় না, শিখতে চায় না, শুধু সার্টিফিকেট পেতে চায়। এজন্য সার্টিফিকেট ব্যবসাও রমরমা হয়ে গেছে। বেকারও সে-কারণে হয়। পুরোনো দিনের এক হেডমাস্টারের গল্পটা বলি: হেডমাস্টার সাহেব স্কুলের রোয়াকে বসে আসরের নামাজের আগে অজু করছেন। এক ছেলে দূর থেকে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে স্যারের সামনে এসে হাজির। স্যারকে অনেক আদবের সাথে সালাম দিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার, আমি টেস্ট-পরীক্ষায় আনএলাউ হলাম কেন?' শিক্ষক অজু শেষে উত্তর দিলেন, 'ঐ জন্যই, যাও, এবার যাও।' ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চায়, অথচ 'ডিসএলাউ' শব্দটা জানে না, এ কি হয়? এ-যুগের ছেলে হলে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে শিক্ষকের কাছে আসতো না। একপাল অস্ত্রধারী ষণ্ডা-গুণ্ডা নিয়ে স্মার্ট-ফোনে আদেশ জারি করতে-করতে দলীয় স্লোগান দিয়ে শিক্ষকের দিকে ধেয়ে আসতো। শিক্ষকের মাথাটাই হয়তো কেটে নিয়ে যেত। কিংবা বুকের উপর দাঁড়িয়ে আনন্দোল্লাস করতো। সদম্ভে সমাজে ঘোরাফেরা করতো। পালের গোদারা মাথাকাটার পক্ষে ওকালতি করতো। লাঙ্গুলওয়ালা দলবাজ রিপোর্টাররা হেডমাস্টারের বিপক্ষে সংবাদ লিখতো– আরো কত কিছু। আমরা তো জানি 'পাঁঠা কোদে খুটোর জোরে'। এ দেশে যত পাঁঠাকে কুদতে দেখেছি, সবই রাজনীতির খুটোর জোরে। ওরা পাঁঠাকে সমাজে অপকর্ম করার জন্য ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। বিচারে ফাঁসি হলে রাজনৈতিক বিবেচনায় ইহকাল ও পরকালের সমস্ত অপকর্মকে মাফ করে দেয়। এ দেশে সকল প্রকার অপকর্মের মূলটা এখানেই। দেশে আইনের শাসন নেই, রাজনীতির শাসন বিদ্যমান। আমরা সবাই রাজনৈতিক ক্ষমতার দাস হয়ে গেছি। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মেরুদণ্ডওয়ালা হেডমাস্টারই-বা কোথায়? তারাও তো কোনো-না-কোনো রাজনীতির রঙে সর্বাংশ রাঙিয়েছে। দীর্ঘদিন এসব

কথা পত্রিকায় দেখতে-দেখতে, বাস্তব প্রাকটিস করে হেডমাস্টারসহ শিক্ষকরা শিখে ফেলেছে। জানে, ক্লাস নেওয়া ও পরিশ্রম করে পড়ানোর পরিবর্তে, ছাত্রছাত্রীর পিছনে মেন্টরিংয়ের জন্য সময় দেওয়ার পরিবর্তে দলবাজি করলে তার টিকিটিও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আরো নগদ লাভ আছে। সে-সুযোগে শিক্ষক টিউশনি করিয়ে, নোটবই মুখস্থ করিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষক এ সুযোগে ফাঁকিবাজি শিখেছে– অফিস ফাঁকি দিয়ে বাড়ির কাজ, কিংবা নিজস্ব ব্যবসা ফেঁদেছে। ছাত্রছাত্রীরাও রাজনৈতিক গুরুর আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলছে। শিক্ষাঙ্গনে রামরাজত্ব কায়েম করেছে। আবার অনেকেই ফেসবুক ব্যবহার করে বা অকাল রঙ্গলীলা করে ছাত্রজীবনটাই নষ্ট করছে। না-ফোঁটা গোলাপের মতো কুড়িতেই ঝরে পড়ছে। শিক্ষকরা এ মহৎ পেশাকে অন্য ব্যবসায়ী পেশার মতো গণ্য করছে। ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে অনেক শিক্ষকই মহৎ এ পেশার মুখে কালিমা লেপ্টে দিচ্ছে। সে-সাথে রাজনীতির অনুকূল হাওয়া অনেক শিক্ষকের নতুন-নতুন পদ-পদবি বাগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে– যা যারপরনাই দুর্ভাগ্যজনক। এভাবেই দিন পার হচ্ছে। তাই দিনে দিনে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার এ হাল।

ভালো হোক, খারাপ হোক, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর একই দশা। এরা পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার। তাছাড়া, ছাত্রছাত্রীদের বয়সের কারণে কোমল মন, রঙিন চোখ, অপরিপক্ক বুদ্ধি, আবেগতাড়িত-অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, গরম রক্ত ও অভিজ্ঞতার অভাব। বর্তমানে সামাজিক অস্থিরতার কারণে অনেকের বাস্তবজ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব। বাস্তবজ্ঞান অর্জন করতে হলে রাত-দিন যা-কিছু সামনে ঘটছে, দেখছে– তা মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়; এগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হয়; এজন্য ভাবুক লোক অধিকাংশ সময় জ্ঞানী হয় এবং দূরদর্শী হয়।

পরিবার, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে জীবন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। মহাসময় ও ঘটনার প্রতিটি ক্ষণ একবারই আসে; একবারই চলে যায়; যা যায় চিরদিনের জন্য যায়। মনে রেখে যায় অতীত দিনের অনুশোচনা; কিন্তু তাও সবার জন্য নয়– যার বিচার-বিবেচনার শক্তি আছে, তার জন্য। গো-মূর্খ এবং হস্তি-

মূর্খরা বোধশক্তির অভাবে কখনোই পিছনের কথা অতটা ভাবে না। অনুশোচনাও তাদের কম, তারা ভোগবাদী। অনুশোচনা যতই থাক– পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না, তাই অতীতকে সংশোধন করা যায় না। সেজন্য, কেউ কেউ ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য এ-কারণেই সংশোধন করে। অনুশোচনাই এর উৎপত্তি। 'ফিরে যাওয়া– সে-তো নিয়মের লঙ্ঘন, তা হয় না কখনো।'

একটা ট্রেন ঢাকা থেকে ছেড়ে গেল। যাবার কথা ছিল চট্টগ্রামে– জয়দেবপুর থেকে লাইন ভুলে রাজশাহীর লাইনে চলে গেছে। ট্রেনটাকে রাজশাহীতেই যেতে হবে, নইলে পিছিয়ে আসতে হবে, তারপর আবার চট্টগ্রাম। সময়কে কখনো পিছনে ফেরানো যায় না; তাই মানুষ পিছনের সময়কে ফিরিয়ে আনতে পারে না। সময়– শুধু সামনেই চলতে জানে। এ-জন্যই জীবনের ব্যর্থতা-সফলতা, পাপ-পুণ্য, বেহেস্ত-দোজখ, প্রকৃতির মূল দর্শন। এছাড়া, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়' প্রবাদটাও এসেছে। আমি শিক্ষক হয়েও দেখেছি, মূলে ঘাটতি রয়ে গেলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ না-জানলে, সরল অংক কোনোভাবেই শেখাতে পারিনে। শিক্ষাটা আসলে বিদ্যুৎব্যবস্থার মতো। মাঝপথে কোথাও তার কাটা থাকলে অন্য প্রান্তে বাতি জ্বালানো সম্ভব হয় না। তাই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী একবার মূল-শিক্ষাচ্যুত হলে পরে আর সামনে এগুতে পারে না। পারলেও, অনেক চেষ্টা করে মূলটা শিখে কদাচিৎ ভালো করতে পারে। আমাদের সমাজেও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কারণে মূল-শিক্ষার অভাবে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় অমনোযোগী হচ্ছে, সুশিক্ষা থেকে ছিটকে পড়ছে। পরবর্তীকালে পরিবেশের কারণে, নিয়মের কারণেই কেউ গমচোর, লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দার, মুখসর্বস্ব 'মহান-রাজনীতিবিদ', কেউবা 'মু?গী মিলন', 'কালা জাহাঙ্গীর', আবার কেউবা জ্ঞান ও আত্ম-সচেতনতাবর্জিত একজন ছা-পোষা মানুষ হয়ে জীবনোপায় বেছে নিচ্ছে। এ দেশের কোনো সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজপতি কি এই-যে অধঃপতনচক্র– তা নিয়ে সমালুম কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত করছেন? আমরা জাতি হিসেবে শুধু দুর্ভাগাই নই, মানুষ হিসেবেও দুর্বিনীত ও দুর্মতিসম্পন্ন। আমাদের যাদের কর্মদোষ, কিংবা ভাবনাদোষে জাতির এ অবনতি, আমরা সবাই কিন্তু দিনশেষে সরে পড়বো। আমার– ক্ষুদ্র এ মাস্টারসাহেবেরও সূর্য অস্তগামী। দেশের সরকারি ও বিরোধী, স্ববিরোধী গুরুরাও সময়ান্তে পরপারের

ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুকর্মে আসক্ত ও নিয়োজিত যে ভাগ্যহত জনগোষ্ঠী এ ভূ-খণ্ডে রয়ে যাবে– তারা নিশ্চিত কোনো দেশীয় অপশক্তি কিংবা সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির জোয়াল কাঁধে নিয়ে অধুনাতন পরাধীনতার নিগড়াবদ্ধ হয়েই আবার শত শত বছর কাটাবে। এটা নিশ্চয় কারো কাম্য নয়। তাই যত তাড়াতাড়ি হুঁশ ফেরে, ততই ভালো। 'সময় থাকতে সাধু সাবধান' হলে প্রভূত উপকার। নইলে, বচন যা-ই ঝাড়ি, ধ্বংস ও পরাধীনতা কিন্তু অবধারিত।

আবারো সেই শিক্ষার কথাই বলি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীকে প্রতিনিয়ত দেখছি। শিক্ষক হওয়ার কারণে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া এবং প্রতিটা বিষয় পর্যবেক্ষণ করাই আমার নেশা। আমি দেখছি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের বা শিক্ষার পিপাসা নেই বললেই চলে। জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। বই পড়ার অভ্যাসও কম। সবাই টাকার পিছনে হন্যে হয়ে দৌড়াচ্ছে। কেউবা মনে মনে টাকা ধরার ফাঁদ তৈরি করছে– বৈধভাবে হোক, বা অবৈধভাবেই হোক। বৈধতার চিন্তা অনেকেই মাথায় আনছে না। মোবাইল ফোনকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করছে। তবে ফোনের ইন্টারনেটেও বিপলু জ্ঞানসম্ভার রয়ে গেছে, সেখান থেকেও শিখছে না। মূল্যহীন উপাদান নিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। কেউবা চাকরি খুঁজছে– পেটে বড় জ্বালা তাই। অথচ লেখাপড়া ভালোভাবে জানা লোকের চাকরি এই বেকারত্বের যুগেও অনেক আছে। আমার জানা মতে, আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালোভাবে লেখাপড়া করেছে, অথচ চাকরি বা অন্য কোনো কর্মসংস্থান হয়নি, এমনটি দেখিনি। আমি বিশ্বাস করি যে, দেশে শিক্ষিত লোকের বড় অভাব। শিক্ষা নেই, তাই বেকারত্ব বেশি। একজন মানুষ শুধু মুখ নিয়েই জন্মায় না, এক-জোড়া হাতও সাথে থাকে। আমার একজন পরিচিত লোক ভালো শিক্ষিত। যদিও লেখাপড়া কম জানে। একটা বড় দোকানি তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দোকানের ক্যাশিয়ার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। দোকানি এই ভদ্রলোকের সততায় খুব সন্তুষ্ট। আরেকজন ছাত্র, লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি টাকার অভাবে এবং সংসারের দায়ভারের জন্য। একটা কোম্পানিতে ছোট পদে কাজ শুরু করলো। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পরিশ্রম ও সততার জোরে মধ্যম পর্যায়ের পদে উঠে পড়লো। তারপর, মধ্যপ্রাচ্যের এক ধনী

ব্যবসায়ীর সাথে ঐ কোম্পানিতেই পরিচয় হওয়াতে তার গুণাবলি দেখে সে-দেশে তাকে নিয়ে গেছে। ব্যবসার দায়িত্বভার তার উপর দিয়ে ঐ ধনী ব্যক্তিটি অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। সততা ও কর্মশক্তি তাকে উপরে উঠিয়েছে। ছেলেটা এখনও মাঝে-মধ্যে ফোন করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমি জানি, আমি আসলে কৃতিত্বের দাবিদার না। তাকে শুধু চলার পথে অনুপ্রেরণা দিয়েছি। এটা আমার পেশাগত দায়িত্ব। যত কৃতিত্ব তার– তার পরিশ্রম ও সততার। এ দেশে যেহেতু সততা হারিকেন ধরিয়ে খোঁজার দরকার হয়ে পড়েছে, সেজন্য সততার মূল্য এ দেশে অনেক বেশি। যারা এ গুণে গুণান্বিত তারা তাদের এ সম্পদ বিনিয়োগ করে বৈধ পথে উপার্জন করার সুযোগ তৈরি করেছে। সততার মূল্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না। অসততা কেবল দোষ নয়, এটা একটা মারাত্মক ব্যামো। কোনো মানুষ রচিত সিস্টেম দিয়ে এটাকে রোধ করা যায় না। মনের সততা না থাকলে যত সিস্টেমই তৈরি করা হোক না কেন, তা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে অচল হতে বাধ্য। শুধু আইন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষের মনকে বেঁধে রাখা যায় না।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা বিষয় মন দিয়ে বুঝতে হবে। প্রথমেই জীবনের পজিটিভ দিকগুলো ভেবে দেখে চিন্তার উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হলে মনের মধ্যে পরিবর্তনের সদিচ্ছা নিয়ে লেগে থাকতে হয়। একবারে অভ্যাসের পরিবর্তন হয় না। প্রয়োজনে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তারপর পরিবর্তন হয়। একমাত্র সুস্থ উন্নত চিন্তা-চেতনা, আত্ম-উপলব্ধি ও চেষ্টা মানুষকে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে, জীবনের উচ্চস্তরে ঠেলে দিতে পারে। আত্ম-উপলব্ধি নেই, চেষ্টা নেই, শুধু মৌখিক ইচ্ছা পজিটিভ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। এটা কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। এ-ক্ষেত্রে পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরিবার ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে উন্নত চিন্তার বীজ প্রোথিত করে দিতে পারে; পথ চলার গাইড হিসেবে কাজ করতে পারে। পরিবারে বাপ-মা রাতের খাবার শেষে একই টেবিলে বসে ছেলেমেয়েদের অনেক উপদেশমূলক কথা বলতে পারে; জীবনের বাস্তবতার কথা বলতে পারে; ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা দিতে পারে; স্নেহ-আদরের সুরে কথা বলতে পারে। এটাও একটা রুটিন-ওয়ার্ক হতে পারে। বাপ-মার উচিত ছেলেমেয়ের সঙ্গটা চোখে-চোখে রাখা।

অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায়; কিংবা ভালো হয়। মূলত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ গঠনে বড় রকমের ভূমিকা পালন করা দরকার। এর মধ্যে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মা ছেলেমেয়েকে আদর-যত্ন করবে ঠিক আছে, তবে জীবন ও অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে শক্ত ভূমিকা রাখতে না পারলে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেমেয়ের কাছে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে। ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে মা-র কথাবার্তা, কার্যকলাপ খবু বেশি বেশি পর্যবেক্ষণ করে এবং অনুসরণ করে। অর্থাৎ সন্তান গঠনে মায়ের পজিটিভ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ দেশে ভালো চিন্তাধারার ছাত্রছাত্রী ভালো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায়– ভর্তিও হয়। অনেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি না-হতে পেরে বন্ধুদের সাথে নিয়ে কোনো এক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। এ ক্ষেত্রে বন্ধুদের সুরে সুর না মিলিয়ে বাপ-মার উচিত মানসম্মত কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাদের সাথে মেলামেশা করছে, নতুন বন্ধু তৈরি করছে– তা দেখা। আবার বাসায় এসে কীভাবে সময় কাটাচ্ছে, কী ভাবছে, তা অনুধাবন করা। এ-সময়ে একবার ছেলেমেয়ের মধ্যে খারাপ কিছু ঢুকলে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন কাজ। কখনো-সখনো 'সেই শোয়া যে তার শেষ শোয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?'– হয়ে যেতে পারে। একটা কথা সত্য যে, কোনো প্রতিষ্ঠানই তাকে ভালো করতে পারবে না, যদি সে নিজের চিন্তা দিয়ে নিজে ভালো না-হয়। 'রদ্দি মার্কা' কেউ কেউ কোথাও সুযোগ না পেয়ে বাপের অঢেল টাকার জোরে পড়ার জন্য বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। সেখানে কোনো ঘনিষ্ঠ কেউ না থাকলে শতকরা নব্বই ভাগ ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ সেখানে গিয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া করে সেটা পরিবারের জন্য সৌভাগ্য; তা ব্যতিক্রমও বটে। বিদেশে পাঠাতে পারলে আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করে পাঠানো যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, অবৈধ পথে রুজি-রোজগার করা, দুশ্চরিত্র হয়ে বিজয় অর্জন, প্রকৃত বিজয় নয়; আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়াটাই প্রকৃত বিজয়। টাকা-পয়সাই জীবনের সবকিছু নয়। জীবন চালাতে গেলে টাকার প্রয়োজন সত্য; কিন্তু বেশি টাকা জীবনের সুখ-শান্তি ও বিবেককে নষ্ট করে দেয়। বেশি টাকার লোভ একটা মানসিক ব্যাধির নাম। টাকার পিছনে ছুটে জীবনেও নাগাল পাওয়া যায় না। যোগ্যতা অর্জন করলে টাকাই যোগ্য লোকের কাছে চলে আসে।

এজন্য কিশোর বয়সেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঠিক করে নেয়া ভালো– বাপ-মাও এ বিষয়ে সন্তানকে সহযোগিতা করতে পারে। অতপর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামনের দিকে এগোতে হবে। ছোটবেলায় বাড়ির পাশের এক বাজারে প্রতি হাটবারে ওষুধ বিক্রির জন্য অতুল বাবু 'অতুলকুন্ডুর শান্তি মলম' বিক্রি করতে আসতেন। তার সাথে থাকতো তের-চৌদ্দ বছর বয়সী এক বালক। সে দরাজ গলায় গান ধরতো, আমি ছিলাম নিয়মিত শ্রোতা। একটা গান এ-রকম ছিল: 'নিরিখ বান্ধরে দুই নয়নে, নিরিখ বান্ধরে দুই নয়নে-এ-এ, ভুইলো না মন তাহারে-এ-এ। ঐ নাম ভুল করিলে যাবিরে মারা পড়বিরে বিষম ফেরে-এ-এ, ভুইলো না মন তাহারে-এ-এ।' তখন মনটা ছেলেটার সুমধুর সুরের দিকেই বেশি নিবিষ্ট থাকতো। আরো ভালো লাগতো গানের তালে তালে ঢুলির চাটি। বড় হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ঐ গানটার কথা ও সুর কালে-ভদ্রে আনমনা হলেই কানে অনুরণিত হতো। একদিন ক্লাসে শিক্ষক মহোদয় ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি পড়াতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নিয়ে কথা বললেন। দেখলাম, লক্ষ্য নির্ধারণ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই সামনে এগোতে পারে না এবং লক্ষ্য ছাড়া একটা প্রতিষ্ঠান পালহীন, দাঁড়হীন নৌকার মতো; যে-কোনো সময় যে-কোনো দিকে ভেসে চলে যেতে পারে, ডুবে যেতে পারে। সেদিন থেকেই গানটার মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব হৃদয় দিয়ে পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছি। গানে শব্দটাকে 'নিরিখ' বলেছে– আমরা বইতে পড়লাম 'লক্ষ্য'। ব্যবস্থাপনার এ পাঠটা ছিল আমার ঐ গানটার মর্মোদ্ধার করার একমাত্র উদাহরণ। মূল কথা হচ্ছে, জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ ছাড়া তা অর্জন অলীক কল্পনা মাত্র। অন্তর থেকে মানসিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। আবার লক্ষ্য থাকলেই কেবল তা অর্জনের প্রচেষ্টা থাকে। তবে একটা বিষয় সত্য যে, বাস্তব জীবনে জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বয়সভেদে পরিবর্তিত ও পরিশুদ্ধ হতে পারে। উদ্দেশ্য নির্ধারণে আবেগতাড়িত না হয়ে বাস্তবানুগ হওয়াই ভালো। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই মানুষকে দিয়েই জীবনে অনেক ভালো-কিছু করা সম্ভব। এই মানুষই বনে থাকলে বনমানুষ হয়। লালন গেয়েছেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন, লালন বলে পেয়ে সে-ধন পারলাম না চিনতে।' দরকার জ্ঞানান্বেষী হওয়া, নিজের মধ্যে লুকায়িত মানুষ-রত্নকে জাগিয়ে তুলে ভালো কাজে লাগানো। জীবনকে চিনতে

হবে– নইলে তা হবে অমূল্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সম্পদের অপমৃত্যু। যে জীবনকে ভালো কাজে না লাগাতে পারে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে ভালোভাবে ব্যবহার না করতে পারে, সে নির্বোধ এবং দুর্ভাগা; সে-ই মূর্খ।

লক্ষ্য আছে, চেষ্টা নেই– ঐ লক্ষ্য নির্ধারণ নিরর্থক হবে। চেষ্টা না করে কেউ ভালো কিছু করতে পেরেছে, এমন নজির নেই। সবকিছুর মূলেই চেষ্টা। অর্থাৎ আগে চিন্তাধারার পজিটিভ পরিবর্তন আনা; গঠনমূলক ও বাস্তবভিত্তিক চিন্তা করা; সে-সাথে লক্ষ্য নির্ধারণ করা– তারপর সে-মতো চেষ্টা করা। মনে রাখা দরকার, জন্ডিস রোগী সারা পৃথিবীকে হলুদ দেখে– যদিও পৃথিবীর রং হলুদ নয়। আবার উঠতি বয়সীরা জীবনকে রঙিন চশমার ফ্রেমে ফেলে কল্পনার জগতে উড়তে চায়– নতুন কাক ময়লা-আবর্জনা খেতে গিয়ে যেমন চোখে-মুখে মেখে ফেলে, ঠিক তেমনি। এ উড়ুক্কু ভাবের সাথে ভবিষ্যৎ বাস্তবতার কতটুকুটুই-বা মিল থাকে! পিঁপড়ের পাখা গজায় কিন্তু মরার জন্য। উড়ে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়, আত্মাহুতি দেয়। অনেক পিঁপড়েই কিন্তু এভাবে মারা যায়। মা-বাপের উচিত এ সময়ে সন্তানকে বেশি করে কাছে নেওয়া, ভালো পরামর্শ দেওয়া। ঐ বয়সের উপযুক্ত গঠনমূলক বই পড়ানো। এতে ছেলেমেয়ের উপর পজিটিভ প্রভাব পড়ে। এ দেশের ক-জন বাপ-মা এমন সচেতন? নিঃশেষ হয়ে যাবার পথে এসে বাধা দেয়। ফল ভালো হয় না।

যা বলছিলাম। চেষ্টা থাকতেই হয়। কথায় আছে, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' শ্রীকৃষ্ণের ডাকনাম 'কেষ্ট'। চেষ্টা নেই, কৃষ্ণগহ্বরে পড়তে হবে। আমি একবার গুলিস্তানের বেশ কিছু পকেটমারের ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম– ওদের আস্তানায় গিয়ে। দেখেছি, তারা কত-শত চেষ্টার পর নৈপুণ্যের সাথে মানুষের পকেট মারতে পারে। নৈপুণ্য না-থাকলে একদিনেই গণপিটুনিতে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। চেষ্টা চালাতে গিয়ে অসংখ্যবার ওস্তাদের চড় খেতে হয়েছে। অতঃপর, নিখুঁত পকেটমার। চেষ্টা আছে বলে কুমার চাকের উপর কাদা দিয়ে অনেক রকমের মৃৎশিল্প তৈরি করে চলেছে। এই কাদা থেকে ইট– অতঃপর, বৃহৎ অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, সবই ভাবনার বিষয়। চেষ্টা নেই, সৃষ্টি নেই। কখনো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে পুরো সময়কে সামনে রেখে স্বল্প-মেয়াদে ভাগ-ভাগ করে নিতে হয়।

এ দেশের ছাত্রছাত্রীদের বৃহদংশের গঠনমূলক কাজে ইচ্ছাশক্তি অতি দুর্বল। জ্ঞানার্জনের পিপাসা বা অজানাকে জানার তৃষ্ণা নেই বললেই চলে। যেসব ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছেশক্তি ভালো, তারা তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে– এদের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মোবাইল ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত। এদের গোটা অংশটাই উদ্ভট ড্রাম-বাজনার তালে-তালে কোমর দুলিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, হাঁটু বাঁকিয়ে, হাত নাড়িয়ে জীবন পার করে দিতে চায়। জীবন শব্দের অর্থই বোঝে না। ফলে, বৃহৎ জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। মানবসম্পদ গড়ে উঠছে না– আপদ গড়ছি। প্রভাবটা সামাজিক পরিবেশের উপর পড়ছে। শিক্ষার সুযোগ আছে, কিন্তু সুযোগের সদ্‌ব্যবহার নেই। আমি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি গরিব বাপ-মায়ের অতি কষ্টার্জিত অর্থ কাঁচা বয়সে খারাপ সঙ্গে পড়ে উড়িয়ে দিয়ে ফতুর হতে। সব শেষ হলে বাপ-মা এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করেছে। গ্রামের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ঢাকা শহরে পড়তে এসে বন্ধুদের সাথে মেসে থাকে। আধুনিক হবার চেষ্টা করে, সঙ্গদোষে শিক্ষাজীবনকে শেষ করে নেশাখোরে পরিণত হয়। অনেকে বখাটে হয়ে শেষে কায়ক্লেশে জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করে। ছাত্রছাত্রীদের ডাটাবেজ বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তিন-চার শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা খুবই খারাপ। এক. যারা গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে খারাপ বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেসে থাকে; দুই. ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান; তিন. যে ছেলেমেয়ের বাপ বেঁচে নেই– মা পরিচালিত সংসার; এবং চার. যেসব ছেলেমেয়ের বাপ-মা বিদেশে থাকে অথবা বাপ বিদেশে থাকে, দেশে টাকা পাঠায়, সন্তান মাকে নিয়ে দেশে থাকে। আরেক ধরনের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হচ্ছে না, নেশাখোর হয়ে গেছে। যাদের বাপ অবৈধ পথে হঠাৎ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে। এ দেশে অবশ্য এ সংখ্যাই বেশি। ব্যতিক্রম বাদে কোনো ‘মহান রাজনীতিবিদের’ ছেলেমেয়ে মানুষের মতো মানুষ হচ্ছে না– অধিকাংশই বখে যাচ্ছে; মাস্তান কিংবা গাড়িচোর, জমিদখলকারী, হাইজ্যাকার হচ্ছে। সবই এ পোড়া চোখে পত্রিকার পাতায় পড়ছি, দেখছি। লোম বাছতে কম্বল উজাড় হবার উপক্রম বললে অত্যুক্তি হবে না। বাকি অল্প কিছু ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া হচ্ছে– তা তাদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার উৎকর্ষের কারণে, অথবা পরিবারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের কারণে।

চার

একই বিষয়ের অন্য দিকটা বলতে চাই। এ কথাগুলোর প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। লেখাপড়ার মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া আদর্শ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু উপাদান যোগ করতে হবে, যাতে প্রতিটা লেখাপড়া-করা ছাত্রছাত্রী সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। এ প্রচেষ্টা প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে শেষাবধি করতে হবে। তাই করোনা ভাইরাসের কথাই উদাহরণ হিসেবে বলি। এই যে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে সবাই নিজে বাঁচা ও পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। করোনা ভাইরাস অনেকের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকছে। কেউ পরীক্ষা করে দেখেছে, কেউ দেখেনি। অন্যকেও যে নিরাপদ রাখা নিজের দায়িত্ব এটা অনেকেই করছে না। অন্যকে আক্রান্ত না-করার মানসিকতা মাথার মধ্যেই আনছে না। কেউ কেউ লুকিয়ে রেখে নিয়মিত অফিসও করছে। আমি দেখেছি এবং নিজের কানে শুনেছি। ভাবতেই অবাক লাগে, দায়িত্ববোধটা কোথায়? অন্যকে ভোগাবো, কষ্ট দেবো, কিংবা অন্যের বিষয়ে উদাসীন থাকবো, এ বোধটা ভারি অন্যায়। 'নিজের বেলায় মুচকি হাসি, পরের বেলায় চুপটি আসি' মনোভাব বাদ দিয়ে আমি অন্যকে আক্রান্ত করবো না– এই মানসিক বোধটা যদি শিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে সমাজের অনেক উপকার হয়। করোনা-পরবর্তী সময়ে এ-মূল্যবোধটা সমাজ উন্নয়নে বিভিন্ন দিকেই কাজে লাগে। আমাদের সমাজে এ-ধরনের দায়িত্ববোধের বড় অভাব। এটাকে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ বলা যায়। এটাও শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য। এমনই শত ঘটনার আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। এ দেশে প্রতিটি পর্যায়েই তো লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়– কোথায় নয়? প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিছনের লোকের দিকে না তাকিয়ে লাইনের মাঝে ঢুকে পড়ে। আসবো পরে, অথচ কাজটা করতে চাই সবার আগে– এ আবার কেমন মানসিকতা? নেতা-গোতা হলে তো কথাই নেই। অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধের বড় অভাব সেখানে। আরেকটা গল্প না বলে পারছিনে, ভিতর থেকে তাড়া দিচ্ছে। একসময় আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করতাম। ছেলে-মেয়েরা অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য রক্ত দিতো। বছরে দুটো রক্তদান কর্মসূচি করতাম। প্রতিবার অন্তত

পাঁচ/ছয়শ ব্যাগ রক্ত ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছায় দিত। অনেক বছর এ প্রোগ্রাম আর করিনি। জীবনটা অন্য পথে চলে গেছে। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খুব অসুস্থ, রক্তের প্রয়োজন। গেলাম 'রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র ব্লাড ব্যাংকের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকের কাছে। উনি আমাকে চিনলেন। চা খাচ্ছি আর গল্প করছি। উনার এক সহকর্মী এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার আগামীকালের জন্য কয়টা বেড সেট করবো?' 'একবারে একশটা করতে পারলে অনেক ভালো হয়। দেখুন, যত বেশি পারেন'– পরিচালক নির্দেশ দিলেন। আমি পরিচালক মহোদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, 'এত বেড কেন?' আমি জানি, দশ থেকে পনেরোটা বেডই যথেষ্ট রক্ত সংগ্রহের জন্য। কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উনি সহাস্যে বললেন, 'আর বলেন না ভাই, আগামীকাল 'অমুক' নেতার মৃত্যুবার্ষিকী। রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আমাদের যেতে হবে রক্ত সংগ্রহ করতে। ওদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আসলে ওরা তো রক্ত দিতে আসে না, আসে নেতা-নেত্রীদের পাশে নিয়ে রক্তদান অবস্থায় ছবি উঠাতে। সে-ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখালে তো সোনায় সোহাগা। নেতা-নেত্রী যতক্ষণ থাকে, রক্তদাতাও ততক্ষণ থাকে, তারপর আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য, প্রথম দিকে নেতা-নেত্রী থাকাকালীন একবারে যতটাকে শুইয়ে ফেলা যায় ততই ভালো।' বুঝলাম, নেতা-নেত্রী ও ক্যামেরাভিত্তিক জনসেবা। দুজনে চা-খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বেশ করে হাসলাম।

যুবসমাজ এরকম দায়িত্ববোধে প্রায়ই উদ্বুদ্ধ হয়। এমন অনেক ঘটনা আছে। মেকি সমাজসেবা। মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। কার জন্মতারিখ কবে, মৃত্যুদিবস কবে, ওগুলো মুখস্থ করিয়ে লাভ নেই, বড় হলে পরে এমনিতেই জানবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্যমে মন রাঙাতে হবে। একটা কথা আছে, 'মন না-রাঙিয়ে, বসন রাঙিয়ে কী করিলি ওরে যোগী!'– এমনিতে বসন রাঙিয়ে কোনো লাভ নেই। মন রাঙানো দরকার। সুশিক্ষাগুলো যেন ক্লাসে বসিয়ে সাঁতার শেখানোর মতো না হয়। কোনো বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে দায়িত্ববোধকে মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারেন। একজন শিক্ষাগুরু ইচ্ছা করলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কথা বলে উজ্জীবিত করে হাতের

তালুতে তুলে নাচাতে পারেন। দরকার সদিচ্ছা ও নিজের চেষ্টা। আমার বিশ্বাস, একজন শিক্ষক প্রতিটা ক্লাসে পাঠ্যসূচি পড়ানোর পাশাপাশি শেষের দশ-পনেরো মিনিট জীবনমুখী-বাস্তবধর্মী বিষয় আলোচনা করতে পারেন। এ দেশে এখনও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের মান্য করে এবং শিক্ষকের কথাকে গুরুত্ব দেয়। এ অবস্থাকে ছাত্রছাত্রীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজে লাগানো যায়। এতে একশ ভাগ ছাত্রছাত্রী দায়িত্ব-সচেতন না হলেও ষাট-সত্তর ভাগ যে উপকৃত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শিক্ষকদের অবশ্যই রাজনৈতিক স্লোগান, স্বজনপ্রীতি ও দলবাজি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শ্রদ্ধার ঘাটতি থেকে যাবে।

শিক্ষিত লোকের মধ্যে আরেকটা উপাদান থাকা জরুরি– তা হচ্ছে সততা। এর সাথে অবশ্য সত্যবাদিতাও দরকার। ‘সততা’ এবং ‘সত্যবাদিতা’র মধ্যে অবশ্য একটু পার্থক্য আছে। ‘সততা’ অর্থ ন্যায়পরায়ণতা এবং ‘সত্যবাদিতা’ অর্থ সত্য বলার অভ্যাস। অসৎ লোক নরাধম। তাকে মানুষ বাদে নিম্নশ্রেণির কোনো সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এ দেশ মুসলিমপ্রধান দেশ। আমি বলছিনে যে, সততা ও সত্যবাদিতা দেখাতে হলে তাকে মুসলমান হতেই হবে। তবে এ কথা বলছি যে, যে-ব্যক্তির মধ্যে এ-দুটো গুণ নেই, সে মুসলমান হয় কী করে? যেসব গুণ মানুষের জীবনকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে তার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতার অবস্থান সর্বোচ্চ। ‘সততা ও সত্যবাদিতা মুমিন মুসলমানের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাদের মাঝে থাকবে না কোনো মিথ্যাচার, কোনো অসততা। এমনকি তাদের সঙ্গীর মাঝেও না।’ আমরা এ অবস্থান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এ দেশে সত্যবাদী ও সৎ লোকের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়। ডাহা-মিথ্যাচারীর সংখ্যা অসংখ্য। সত্য-মিথ্যার গোঁজামিল দিয়ে কথা বলার লোকের সংখ্যাই বেশি। মিথ্যা বলে বা কথাকে বাঁকা করে বলে কান-ভাঙ্গানি দিয়ে কর্তাব্যক্তির কাছে ভালো হবার ঘটনা তো এ দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে, কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনে সকালের নাস্তা। ডাহা মিথ্যার বেসাতি দিয়ে লাঞ্চ ও ডিনার। দেশের পুরো পরিবেশটা নরকতুল্য হয়ে উঠেছে। ফলে সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ লোক তার পদমর্যাদা থেকে পদে-পদে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ব্যবস্থাপনা-না-জানা অনেক কর্তাব্যক্তিও এমনই

কানপাতলা ও অবিবেচক যে, একাধিক উৎস থেকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই না করে তোষামোদকারীর মিথ্যা কথাতেই লাফাতে থাকে। প্রতিটা পর্যায়ে মিথ্যার দাপট জয়জয়কার; সত্য অপসৃত।

এ দেশে নাকি ইসলাম ধর্ম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রাইমারি স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাস্তবে এ ধর্ম শিক্ষা কাগুজে বিড়াল, কোনো ইঁদুর ধরে না। ধর্ম শিক্ষা যেনতেন, নম্বর অর্জনের আখড়া তৈরি হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করেছি, তোমরা এসএসসিতে 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' চতুর্থ-বিষয় হিসেবে নিয়েছো কেন? সবার একই উত্তর, নম্বর বেশি পাওয়া যায়। এ-প্লাস পেতে সাহায্য করে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। শুনেছি, ধর্মসভার নাম করে দলীয় লোকজন অনেক ফান্ড হাতিয়ে নিয়েছে। বাস্তবে সভার কোনো নাম-গন্ধই নেই। এটা না-হয় নৈতিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ, ধরে নিলাম। আসলে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' নামেই নৈতিক শিক্ষা; কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। 'নামেই তালপুকুর, ঘাটে ঘটি ডোবে না।' নামাজ কত প্রকার ও কী কী– এগুলো শেখায়; ইমান কাকে বলে শেখায়; নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব শেখায়– এমনই আরো কত কি! সব ঝাড়া মুখস্থ। কোনোটাই কাজ করে না। এগুলো মুখস্থ করে লাভ কী, বলুন? মুখস্থ করছে, পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গীরণ করছে। ভালো নম্বর প্রাপ্তিই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পাস করছে, শিক্ষকও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু কাজের বেলায় ঠন-ঠনা-ঠন। প্রায়োগিক দিক পুরোপুরি উপেক্ষিত রয়ে যায়। সততা ও সত্যবাদিতাসহ একজন মুসলমান হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোও আমরা মুখস্থবিদ্যা আউড়িয়ে চালিয়ে যাচ্ছি। এ-শিক্ষা শিক্ষা না-দেওয়ার নামান্তর। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে বিলের মধ্যে এক গ্রামে গিয়ে কিছুদিনের জন্য এক বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। একদিন এক মৌলভিসাহেব ঐ বাড়িতে এসে গল্পচ্ছলে বললেন, 'তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ্ করলো না।' আমি বরাবরই মোটা বুদ্ধির লোক। কথার যথার্থতা না-বুঝতে পেরে আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'উনুনে কড়াই দেওয়া হয়েছে, কড়াইতে তেল ও পেয়াজ-রসুনকুচিও দেওয়া হয়েছে। কড়াই গরম হয়নি, সেজন্য পেয়াজ-রসুনকুচিও গরম হয়নি।

ঠান্ডা কড়াইতে ডাল ঢেলে দেওয়া হলো– কোনো শব্দই হলো না। এমনকি 'ফ্যাচ্' শব্দটাও হলো না। তেলটা অযথাই ব্যয় হলো। এ দেশে ধর্মের নামে নৈতিক শিক্ষাও তাই। কয়টা কথা লিখবো– সব জায়গায় তো একই অবস্থা। টাকা ঢালছি তিন গুণ, রাস্তা তৈরি হচ্ছে একগুণেরও কম। কোনো জায়গায়ই তো 'ফ্যাচ্' শব্দটা হচ্ছে না। সিস্টেম লস তো নৈমিত্তিক, চতুর্দিকে। পারস্পরিক সম্পর্কেও সিস্টেম লস। মুখে যা বলছি, তা করছিনে। কারো কথার উপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। ধর্মের ক্ষেত্রেও অধর্ম। ছাত্রছাত্রীদের প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যগুলো শেখাতে হবে, তাদের মধ্যে এ-গুণগুলো ফুটে উঠবে। এখানেও মুখস্থ, সেই সিস্টেম লস।

আমরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমান হয়েছি, মুসলমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে নয়। এজন্য কাজীর গোয়ালের হিসাব এবং খাতার হিসাবে অনেক ফারাক। কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করেন, 'সর্ব গায়ে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা?' আমি বলি, কোনো জায়গা না পেলে 'মনে' কিংবা 'চেতনায়' ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফলও পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী। মন ও চেতনা সুস্থ, তো কথা সুস্থ, কাজও সুস্থ, অন্যান্য মানুষও আমার থেকে নিরাপদ, তাই সমাজও নিরাপদ। একটা সহি হাদিসে এসেছে, 'প্রকৃত মুসলমান তো সে, যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকবে।' আমরা মুসলমান বলে দাবি করছি; অথচ এ বৈশিষ্ট্যতে অভ্যস্ত হচ্ছিনে। আমরা কতটুকু 'প্রকৃত মুসলমান' হয়েছি?

অন্য যে বিষয়টা আমি শিক্ষিত লোকের মধ্যে খুঁজে পেতে চাই, তার নাম 'জাগ্রত বিবেক'। বিবেকের সাথে বোধশক্তিরও একটা সংযোগ আছে। একজন চাষি তার গরুর জন্য অন্যের জমি থেকে চুরি করে কিছু কাঁচা ঘাস এনে গরুর সামনে দিলো। গরুটা এদিক-ওদিক না তাকিয়ে ঘাসগুলো পরিতৃপ্তির সাথে গলাধঃকরণ করলো। গরুর কি চাষিকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে, ঘাসগুলো চোরাই কিনা? যদি সে প্রকৃতই গরু হয়ে থাকে, তবে বলা যায়, তার কোনো জিজ্ঞাসা নেই, বিবেকের কোনো দংশনও নেই। কারণ, চাষির নিজের জমির ঘাস ও চোরাই ঘাসের স্বাদে গরু কোনো পার্থক্য পায় না। তাছাড়া, গরু গরুই। তার জাগ্রত বিবেক নেই। গরুর কাছে বৈধ-

অবৈধ দুইই সমান। মানুষের বৈধ-অবৈধ জ্ঞান থাকা উচিত। যদি কোনো পূর্ণবয়স্ক ছাত্রছাত্রী তার বাপের অবৈধ অর্থে গড়া সম্পদ, তার বাপকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে গো-গ্রাসে গিলতে থাকে; ধরে নেয়া যায়, তার চিন্তা-চেতনা, স্বভাব বাপের মতো– গরুর চেয়ে উন্নত তো নয়ই। বানু মোল্লা তার সায়েরিতে লিখেছিলেন, 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি।' এর ব্যতিক্রম খুব কমই হয়। সুশিক্ষার জন্য শাণিত বিবেকের প্রয়োজন।

গত বছর ঈদুল আজহাতে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। একটা গরুকে খাইয়ে-দাইয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। পনেরো-বিশ হাত দূরে একটা ছোট্ট গর্ত খোঁড়া হয়েছে, এর পাশে কোরবানি দেয়া হবে বলে। একজন গরুটাকে খুঁটি থেকে দড়ি খুলে গর্তের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি দ্রুত বাড়ির মধ্যে চলে যাওয়ায় ব্যস্ত। খুঁটি থেকে দড়িটা খুলতেই গরুটা একটা ঘাসের দিকে মুখ বাড়ালো। মুখ দিয়ে নাগাল পেল না; এবার জিভটা লম্বা করে বের করে দিয়ে জিভ দিয়ে ঘাসটা টেনে নিয়ে এসে মুখে পুরলো। লোকটা গরুর দড়ি ধরে টানছে। ঐ গরুটা কি একবারও ভাবছে– আর আধা-মিনিট পর তার জীবন শেষ হয়ে যাবে? তার ঐ ঘাসটা মুখের মধ্যেই রয়ে যাবে, পেট পর্যন্ত পৌঁছাবে না? গরুটার বোধশক্তি কতটুকু? এ দেশের এক 'মহান নেতা'র পুত্র মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে ঐ জায়গাতেই জীবনের যবনিকাপাত ঘটলো। একজন প্রভাবশালী রাজনীতিকের ছেলে রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে পথচারীর গায়ের উপর গাড়ি উঠিয়ে মেরে ফেললো। তার আর ঐ গরুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

আমি যে লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা, তুমিও সেই বাহিনীর সদস্য। আমি যে সুরে জিগির তুলি, তুমিও সে-সুরে দোয়ার সেজে সুর টানো। ফলে, তুমি প্রকৃতপক্ষে যত খারাপই হও না কেন, ভালোমানুষ। আর বাদবাকি যত লোক আছে তারা যত মনুষ্য-বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহকই হোক না কেন– সবাই খারাপ মানুষ, বিলকুল ঝুট হ্যায়। জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন কোনো লোক এই বিচারে মানুষকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে কী-না? যদি কোথাও এ বিচারে মানুষে-মানুষে পার্থক্য করা হয়– নিশ্চয় তা অভিশপ্ত, মনুষ্যত্ববিহীন, বিবেকবোধহীন বিচার; নিশ্চয়ই তা অন্য কোনো জীবের সাথে

তুলনীয়, নয় কী? এ দেশে কতজন লোকের জাগ্রত বিবেকবোধশক্তি আছে, শুমার হয়েছে কী? জাগ্রত বিবেক দিয়েই কেবল বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করা যায়। যদি সেই বিবেকটাই ভোঁতা হয়, পক্ষপাতদুষ্ট হয়, বোধশূন্য হয়? শিক্ষা মানুষের বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। নইলে মানুষ এবং অন্য প্রাণির মধ্যে পার্থক্য থাকে কী করে? কোনো প্রাণিই তার বংশধরদের দিকে তাকিয়ে অবৈধ পথে কাড়ি-কাড়ি সম্পদ মজুদ করে না– মানুষ তা করে। পুরো সৃষ্টিতেই বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য চিন্তার খোরাক রয়ে গেছে। যে দেশে আইন-কানুনের বালাই নেই, নৈরাজ্যবাদী শাসন বিদ্যমান, যেখানে কাড়ি-কাড়ি অবৈধ গোপন টাকা যত্রতত্র মজুদ অবস্থায় পড়ে থাকে, ফলাও করে কেউ আবার সে টাকার গর্ব করে এবং বুক ফুলিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে পথ চলে; সে সমাজে বিবেকী মানুষের সংখ্যা কত হতে পারে? মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করার জন্য, বৈধ থেকে অবৈধকে পৃথক করার জন্য, 'সরল-সঠিক পথ' বেছে নেওয়ার জন্য– এ গূঢ় তত্ত্ব বিবেকী ছাত্রছাত্রীদের খোলামেলাভাবে শিক্ষাঙ্গনে শেখাতে হবে। তা হলেই সেটাকে একটা শিক্ষা বলা যাবে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে প্রতি রাকাতে 'সিরাতাল মুস্তাকিমের' শপথ করে প্রতিনিয়ত শপথ ভঙ্গকারীকে মোনাফেক ছাড়া আর কী বলা যায়? হ্যাঁ, মূর্খ বা গোমরাহও বলা যেতে পারে। এই 'সিরাতাল মুস্তাকিম'-কে চিনতে জাগ্রত বিবেকের দরকার। আরেকটা জিনিস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এ দেশের রাজনীতি নোংরামি ও পঙ্কিলতায় ভরে গেছে, চারদিক থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। সেজন্য আপাতত যে কোনো প্রকারে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি থেকে যথাসম্ভব যতটা দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। কোনো রাজনীতিক এ-কথায় রাজি হবে না বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে তো তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। এইডস আক্রান্ত দম্পতিকে এইডস-মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে সন্তান জন্মদান থেকে বিরত থাকতে হয়, এ দেশে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা ফিরে না আসা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ রাখা শ্রেয়। তাহলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী টেইনিং বন্ধ হয়ে যাবে; শিক্ষক-রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে; শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি হবে না। শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়া চর্চা করার নতুন সুয়োগ তৈরি হবে। কোনো শিক্ষক রাজনীতি করতে চাইলে আমরা বলবো– শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে সাধারণ সমাজে গিয়ে রাজনীতি করুন।

শিক্ষার আরেকটা অনিবার্য বৈশিষ্ট্যের নাম চিন্তাধারার উৎকর্ষ। সার্বিক কর্মধারা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হবার একমাত্র ভিত্তি। চিন্তার ফল কর্ম। মূলত উন্নত চিন্তাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে আলাদা করেছে। আবার এই চিন্তাধারার বিকৃতি মানুষকে নরাধম করেছে। জীবনের যত কাজকর্ম চিন্তাধারা দিয়ে পরিচালিত। একজন মানুষের চিন্তাধারা তার কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তারপর কর্মধারা দিয়ে মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি। কর্ম নেই, কর্মফলও নেই। কর্মই মূল বিচার্য বিষয়।

একজন কবি এভাবে বলেছেন, 'কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, ধরণী চাহিছে শুধু, –হৃদয়, –হৃদয়।' কবি 'হৃদয়' কথাটা ব্যবহার করেছেন। আমরা এটাকে 'মন-মানসিকতা' বলতে পারি। মনের উৎকর্ষ সবার আগে প্রয়োজন। উন্নত মন, উন্নত চিন্তা– উন্নত কাজ, জীবনের উন্নতি। এ দেশে যদি আমরা কোনো বয়োজেষ্ঠ্যকে সম্মান করি, নারীজাতিকে মায়ের জাতি হিসেবে শ্রদ্ধা করি, বয়োবৃদ্ধ বাপ-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে না-পাঠিয়ে নিজ হাতে সেবা-শুশ্রূষা করি, অনাথ-অসহায় ব্যক্তির পাশে দাঁড়াই– এগুলো সবই চিন্তার উৎকৃষ্টতা এবং ভালো কর্ম। এ শাশ্বত মূল্যবোধে বর্তমানে বড় রকমের ফাটল ধরেছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র আমাদেরকে সে-কথাই শুনিয়ে যায়। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে এক ভাইয়ের হাতে অন্য ভাই খুন, পিতার হাতে শিশুসন্তান খুন, প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন, নারী-শিশু অপহরণ ও পাচার, গণধর্ষণ, রাজনৈতিক কারণে দলে-দলে খুনোখুনি, মুরগির ক্ষেত খাওয়া নিয়ে খুনোখুনি, মুরগির ডিম নিয়েও খুনোখুনি ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের নিত্যদিনের ঘটনা– কোথায় খুন নেই! মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পারদ কমতে-কমতে তলানিতে ঠেকেছে, অন্যদিকে উগ্রতা ও স্বার্থান্ধতার পারদ বেড়ে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব, দয়া-মায়া লোপ পেয়েছে। নিরুদ্দিষ্ট অধঃপাতে যাচ্ছি। এটা দেশের নীতিভ্রষ্ট, দেউলে, দখলদার রাজনীতির প্রত্যক্ষ অবদান। এ-সাথে আছে যথেচ্ছ মিথ্যাচার এবং যথেচ্ছাচারী বৈধ ও অবৈধ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। সবকিছুই বিকৃত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ– সুশিক্ষার অভাব। অবস্থা দেখে মনে হয়, কে যেন কোন অদৃশ্য আস্তানা থেকে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে

চলেছে। চারদিক যেন বিকারপ্রাপ্ত, বীভৎস-বিকৃত নরপিশাচের প্রণয়লীলা মহারাত্রির রূপ নিয়েছে। এ অমানিশা শেষ হবার নয়। এ পরতন্ত্র জাতির বুকে যগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সবকিছুই চিন্তাধারার নিকৃষ্টতার উদাহরণ।

এ দেশ তো মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দৈনন্দিন প্রতিটা কাজে ঘুরতে-ফিরতে অফিস-আদালত কিংবা প্রত্যেক জায়গাতে গিয়েই দেখবেন, ধনী-গরিব নির্বিশেষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জিভ ঘোরে-ফেরে। আমি নিখাদ বাস্তবতা থেকে পর্যবেক্ষণ করে বলছি, কথার সাথে কাজের মিল কদাচিৎ পাবেন। আমাদের দেশের যে শাশ্বত মূল্যবোধ, সেখানে লিখিত দলিলের তুলনায় কথার মূল্য মানুষ বেশি দিত। বর্তমান সমাজে তার উল্টোটা বিদ্যমান। এমনকি লিখিত থাকলেও নিজে নিজের কথাকে উল্টানোর চেষ্টা করে, ভিন্ন ব্যাখ্যা করে। একজনের কথা যদি দলিল অনুযায়ী প্রমাণ করতে হয়, তাহলে তার তুলনায় দলিলকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হয়। একজন যখন থাকবে না, তখন দলিল তার কথার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মানুষ বর্তমান কাগজের তুলনায়ও অধম হয়ে গেছে। মানুষ আত্মস্বার্থের তাগিদে নিজের কথাকে তুচ্ছ করে তুলছে। এতে নিজের অস্তিত্বকেই খর্ব করছে। প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা ও কুটিল বুদ্ধির বিবেচনায় মানুষ বর্তমানে অন্য প্রাণিকুলের চেয়ে অধম সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। এটা বর্তমান যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব– বলতে আমি দ্বিধান্বিত। মানসিক বিকলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রশ্ন জাগে, নামে তো অধিকাংশই মুসলমান; কিন্তু মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য কোথায়? চিন্তার উৎকৃষ্টতা কোথায়? প্রতিটা ক্ষেত্রে শুধু তর্ক করে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলে। মুসলমানের মধ্যে তো বিবেকের পরিশুদ্ধতা ও চিন্তার উৎকৃষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তা কোথায়? সে-জন্য এ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে মুসলমান জনগোষ্ঠী বলতে বিবেকের কোথায় যেন একটু বাধে। মুসলমান বলে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে গেলেও গলার মধ্যে তিতা তিতা লাগে।

চিন্তার নিকৃষ্টতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নগ্নতা। আদিম যুগে মানুষ লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য গাছের পাতা, গাছের ছাল ব্যবহার করতো, শুনেছি। বর্তমান সভ্যতায় আমরা ক্রমশই অসভ্য হচ্ছি। পরা-কাপড়ের বড্ড অভাব। কাপড়ের টানাটানি, শরীরে

কাপড় রাখতে খুবই আপত্তি। নারী-পুরুষ কাপড়ের অভাবে আঁটসাঁট পোশাক ব্যবহার করে। এ উলঙ্গতা ও অর্ধ-উলঙ্গতার নাম দিয়েছি ফ্যাশন। ‘লজ্জা’ শব্দটা অভিধানে থাকলেও সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। নগ্নতা দিয়ে অকৃত্রিম সৌন্দর্য প্রকাশের ছবক নিয়েছি। নিজের শরীরকে দেখিয়ে কী তৃপ্তি আছে বুঝিনে। উলঙ্গতা সমাজ-অসুস্থতার একটা কারণ। এতে সামাজিক শালীনতা বিঘ্নিত হয়। সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। নগ্নতা এবং ফ্রি-মিক্সিং সামাজিক অপরাধের অন্যতম একটা কারণ।

লেখাপড়ার সুবাদে ইউরোপের কয়েকটা দেশে যাবার সুযোগ হয়েছিল। পথে-ঘাটে একজন পুরুষকে বিপরীত জনের সাথে জড়াজড়ি করার দৃশ্য অহরহ চোখে পড়তো। কোনো দিকে তাকানো অনেক কঠিন হয়ে যেত। ঐসব দেশের মানুষ হয়তো এতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য এগুলো স্বাভাবিক লাগতো। ট্রেনের বগিতে একজন পুরুষের কোলে একজন মহিলাকে বসে জনসমক্ষে অরুচিকর অঙ্গভঙ্গিতে আলিঙ্গন করতে দেখেছি। আমাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে বিকারগ্রস্ত মানসিকতাকে হজম করতে হয়েছে। মানুষ এবং পশুর কোনো পার্থক্য পাইনি। আমরা পশ্চিমা সভ্যতাকে ও সামাজিক সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে আধুনিকতা, স্মার্টনেস ও মনের তৃপ্তির অনুষঙ্গ টেনে নিজেরা অনেক বড় মাপের মানুষ, প্রগতিবাদী ও মুক্তমনা ভেবে গৌরবান্বিত বোধ করি। আসলে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনেক কিছুই ভালো; তবে সবকিছুই মানবসভ্যতার অনুকূলে, তা নয়। তাদের অনেক কিছু নিম্নমানের প্রাণিকেও হার মানায়। আমাদেরকে বিবেক ও বিচার-ক্ষমতা দিয়ে ভালো দিকগুলো বেছে নিতে হবে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মানুষ ইহজাগতিক সুখ-শান্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদেরকে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক মঙ্গলের জন্য ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে।

এ দেশে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রচলন বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আমরা চিন্তা-চেতনায় সভ্য ও রুচিশীল হচ্ছি– নাকি অসভ্য, নিকৃষ্ট প্রাণিসদৃশ হচ্ছি, সেটা কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখিনে।

শিক্ষার উপাদান নিয়ে কথা বলছিলাম। এ দেশের এক-ধরনের শিক্ষাবিদ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাসূচি কপি এ্যান্ড পেস্ট

করে এ দেশে প্রয়োগ করতে চান। সমাজজীবনকে ইউরোপ-আমেরিকা বানাতে চান। জনগোষ্ঠীকেও ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, কানাডিয়ান ইত্যাদি বানাতে চান। আমি শিক্ষাসংক্রান্ত সেমিনারে গিয়ে এসব দেখেছি। আমি এধরনের চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী। আমি আজীবন বাঙালি হিসেবে বাঁচতে চাই; সমস্ত বাঙালি– বাঙালি হিসেবেই বাঁচুক, এটাও চাই। বাঙালি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, পরিচয়, সামাজিকতা, সমাজের বুনন, অস্তিত্ব ধরে রাখতে চাই। ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাসূচি উন্নত হলে– এ দেশের সমাজ ও সামাজিক বুননের মধ্যে এনে, দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বজায় রেখে এ দেশের উপযোগী করে বাস্তবে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। এ-নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। অন্য কোথাও প্রসঙ্গক্রমে বলার ইচ্ছে করি। অন্য কথায় আসি।

বলতে ইচ্ছে করে না– তবু বলি। মানব সভ্যতা আজ অসভ্যতার নিগড়ে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে আমরা সমাজকে কলুষিত করছি। পার্শ্ববর্তী দেশে কিংবা বিদেশী টিভি চ্যানেলে অশ্লীলতা দেখে-দেখে আধুনিক, আল্ট্রামডার্ন হচ্ছি, বেহায়াপনা শিখছি। সুপ্ত রিপুর তাড়নাকে প্রকাশ্যে জাগিয়ে তুলছি। নিজেদের আর অন্য-প্রাণি থেকে আলাদা করে রাখতে চাচ্ছিনে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়ার এটাও একটা কারণ। এমনকি ইদানীং ইন্টারনেটে দৈনিক পত্রিকা পড়তে গেলেও পত্রিকার খবরের চারপাশে এমন-এমন উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ অশ্লীল ছবি শোভা পায় যে, পরিবার নিয়ে পত্রিকা পড়াটা নিতান্তই অরুচিকর ও বিব্রতকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে ঐ পত্রিকার ব্যবস্থাপনার রুচির বৈকল্য প্রকাশ পায়। এ-সমাজের ছেলে-মেয়ে, ছাত্রছাত্রীরা তো এ পত্রিকাই পড়ছে এবং ছবিগুলো দেখছে। এতে একে অন্যের মনো প্রকাশ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করছে। উন্নত চিন্তার, মার্জিত রুচিবোধের স্ফুরণ কোথায়? মূলত জীবনাচার ও কর্মযজ্ঞ ম্যাক্রো ও মাইক্রো লেভেলে এমন এক স্থানে নিয়ে চলেছি, যেখানে মানুষ ও পশুর মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য যেন আর না থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিদেশী নগ্ন টিভি চ্যানেলের অনুপ্রবেশ দেশের শাশ্বত মূল্যবোধ ও সামাজিক আব্রুকে বেইজ্জতি করে ছাড়ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেশা, অশ্লীলতা, ভোগ-বিলাসিতা, নীতিহীনতা, নৈরাজ্য, সামাজিক অন্যায়-অবিচার ইত্যাদিকে দলবাজ

মোসাহেবি লোকজনের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশটাকে উচ্ছন্নের প্রান্তসীমায় উন্নীত করছে। এ পর্যায় থেকে সহসা বেরিয়ে আসাটাও অনেক চেষ্টা ও সদিচ্ছার ব্যাপার। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছি, কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামাজিক অবিচার, মূর্খতা ও অচলায়তনের মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে প্রথমে কুঁজো বানিয়ে, অতঃপর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার জন্য মাস্টারসাহেবদেরকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে, 'তোমাদের কেমন মুরদ দেখাও তো, সবাইকে চিৎ করে শোয়াও।' বড় আজব দেশ এটা।

এ বিষয় নিয়ে এ দেশের এক-শ্রেণির জ্ঞানবিধ্বস্ত পণ্ডিতদের আপ্তবচন-বাচন শুনলেই ঘৃণায় মনটা রি রি করে। তারা এই উগ্রতা, নগ্নতা ও নীতিহীনতাকে প্রগতিশীলতার মোড়কে রং মাখাতে চায়। ঘরকে বাতাসে ভরপুর করার জন্য জানালা-দরজা খোলা রাখার জন্য নুসকা বাতলায়। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, টর্নেডো, কালবৈশাখীর ঝড়ো বাতাস প্রবল বেগে ধেয়ে এলেও কি জানালা-দরজা খোলা রাখতে হবে? এটা বোঝার জন্য সাধারণ বোধশক্তিই যথেষ্ট। আমার মনে হয়, এরা প্রগতিশীলতার অর্থটাই বোঝে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে, এরা প্রগতিশীলতার দোহাই পেড়ে রুচিশীল চিন্তা-চেতনা, শালীনতা এবং উন্নত সভ্যতার অন্তরায় সৃষ্টি করে। এরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করতে চায়, যা প্রকৃতির নিয়ম ও বিধানের অন্তরায়।

সমাজে শিক্ষার উন্মুক্ত আলো দিতে আপত্তি নেই। আলোর যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি সমস্যাও কম নয়। সব জায়গায় একই আলো খাটে না। আলো চলার পথে দিশারী হিসেবে কাজ করে সত্য, অন্ধকারেরও দরকার আছে– অনেক অন্ধকারের প্রাণি আলো দেখলে ছুটে পালায়। আবার আলো দেখে অনেক কীট-পতঙ্গ আলোতে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয়– সেটাও লক্ষ রাখার বিষয়। আলো এবং অন্ধকারের সম্মিলিত সহাবস্থানই সৃষ্টির নিয়ম।

পাঁচ

এখন আমাদের স্নেহাস্পদ ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষাব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত মহারথীদের উদ্দেশে কিছু কথা বলবো। কথাগুলোকে একটু গভীরভাবে ভাবলে এবং অনুসরণ করলে কাজ হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে– জীবন এমন একটা ব্যাপ্ত-সময়, যা একবারই আসে, একবারই চলে যায়। জীবনের অতীত সময়কে, কৃতকর্মকে কালির মতো ফ্লুইড দিয়ে মুছে ফেলা যায় না বা আবার পিছিয়ে নেওয়া (রিওয়াইন্ড) যায় না। তাই অতীত সময়ের জন্য বা কর্মের জন্য (যদি ভুল পরে বোধগম্য হয়) আজীবন নীরবে ভুগতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়; কখনো-কখনো অন্য কাউকে দোষারোপ করে মনকে প্রবোধ দিতে হয়; ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে কালাতিপাত করতে হয়। যত কিছুই করা হোক, অতীত কর্ম এবং সময়কে আর ফিরে পাওয়া যায় না। এর গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়। একটা জীবনকে কুঁড়িতেই পোকায় না খাইয়ে, ঝরে যেতে না-দিয়ে, জীবন-গোপালকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্ফুটিত হতে দেওয়াই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীর কাজ। জীবন-গোলাপের শোভা ও ঘ্রাণে যে তার চারপাশ বিমোহিত করতে না পারে– সেই মূর্খ। এর জন্য গভীর ভাবনা ও শ্রম তো থাকতেই হয়!

মানুষ কোনো বন্যপ্রাণির মতো শুধু খেয়ে-দেয়ে বংশবিস্তার করে মারা যাবার জন্য জন্মায়নি। মানুষকে খাদ্য উৎপাদনে অংশ নিয়ে, রুজি-রোজগার করে টিকে থাকতে হয়। তার জন্মের নিশ্চয় কোনো একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, সেটা গভীরভাবে ভাবতে হবে। নিজের জীবনের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয়। সেখানেই জীবনের সার্থকতা। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে জীবনের দীর্ঘতা, বিভিন্ন পর্যায় এবং জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। উঠতি বয়সেই চোখে-মুখে রং, রোমান্টিকতা– রঙিন চশমা পরে জীবনের সব রং একবারেই মেখে নিতে চায়। অলীক কল্পনায় উড়তে চায়। সব রং যে সব-সময়ের জন্য উপযোগী নয়, তা বোঝার ফুরসত থাকে না। জীবনের পিচ্ছিল পথে আছাড় খায়, কখনো ধরাশায়ী হয়। ঘর বাঁধা, বংশস্তিার করার স্বপ্নে বিভোর হয়। এটা যে প্রকৃতির নিয়ম, প্রত্যেকটা প্রাণিই যে বংশবিস্তারের মাধ্যমে

টিকে আছে– এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব অথবা কৃতিত্ব কোনোটাই নেই, তা বুঝতে চায় না। ভবিষ্যৎকে অজানা এক অধ্যায় হিসেবে কালস্রোতে জীবনটাকে ভাসিয়ে দেয়। এরও যে একটা যথাসম্ভব সঠিক পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ আছে– তা ভুলেও ভাবে না। কেউ কেউ এ বয়সে ধর্মের গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত হয়। সন্ত্রাসী কিংবা জঙ্গি কর্মকাণ্ডকে জীবনের পাথেয় হিসেবে বেছে নেয়। ধর্ম যে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত; কিংবা পূজা পার্বণে নয়, তা বুঝতে চায় না। ধর্ম আছে কর্মে, চিন্তা-চেতনায়, সুস্থ-নির্মল মানসিকতায়, সৃষ্টির সেবায়– এটা বুঝে আসে না। আমরা সব বাদ দিয়ে নামাজ-পূজা, বারবার তীর্থযাত্রার মধ্যে তা পালনে নিজেকে নিয়োজিত করছি। কপালে দাগ পড়লো কিনা ভাবছি; নইলে চারদিক তাকিয়ে সময়-সুযোগ বুঝে দাগ তৈরিতে কপাল ঘষছি। চিন্তাধারার নির্মলতা আনছিনে, অহিংস সমাজের কথা ভাবছিনে। তাই সমাজে এত দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিদ্বেষ, সংঘাত, অকালমৃত্যু ও জিঘাংসাবৃত্তির হোলিখেলা।

ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার গড়তে হলে কোনো একটা বিশেষ বিষয়কে নির্বাচন করতে হবে। হতে পারে ফুটবল খেলা, বিখ্যাত আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন, হতে পারে তা সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসাবিজ্ঞানের কোনো বিষয়, কিংবা কোনো টেকনোলজিক্যাল বিষয়। এরকম শত-শত বিষয়ের যে কোনো এক বা একাধিক বিষয়। আমার দু-তিন জন আত্মীয় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করে। জীবনের প্রায় সবকিছুকে বাদ দিয়ে সকাল এগারোটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একটানা খেলা দেখে। শৌখিন খেলা-দেখনেওয়ালা। কখনো-কখনো কম্পিউটারে বসে খেলা করে। কার্সর দিয়ে বল মারে। আমি রসিকতা করে বলি, 'বাসায় বসে কার্সর দিয়ে যত বল মারার প্রাকটিসই তুমি করো না কেন, তুমি ভালো খেলোয়াড় হতে কখনোই পারবে না। খেলার মাঠে যাও। ভালো খেলোয়াড় না হতে পারলেও প্রতিদিন বিকালে ব্যয়ামটা অন্তত হবে। 'সুস্থ দেহ সুস্থ মন'। কার কথা কে শোনে! এ দেশে সৌখিন খেলা-দেখনেওয়ালার পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলে তারা হয়তো তা পেত– কিন্তু সে ব্যবস্থা তো নেই; জীবনকে বুঝে সঠিক সময়ের কাজটা ঠিক সময়ে করেনি– তাই বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে, পুত্র রত্ন যে কোনো একটাকে বেছে নিয়ে কাজে নেমে যেতে হবে। 'না-ঘরকা, না-ঘাটকা' হলে হবে না। বর্তমান

সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসাবিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে হলেও টেকনোলজির সহায়তা নিতে হয়। সুতরাং ভালো টেকনোলজির জ্ঞান বাধ্যতামূলক। আবার অনেক টেকনোলজিক্যাল জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে দেখি সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসাবিজ্ঞানের দিকগুলো ভাবতে চায় না, ইতিহাস জানে না– জানতে চায়ও না, অথচ দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালাতে চায়। যদিও সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবসাবিজ্ঞানের সব তত্ত্ব ও বাস্তবতা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু যদি কোনো টেকনোলজিস্ট এটাকে হালকাভাবে নিয়ে বিষয়গুলোকে পাত্তা না দেয়, অথবা উপেক্ষা করে; এটা হবে তার মনোকল্পিত ও মনোবৈকল্য। প্রশাসনিক ব্যর্থতার গ্লানি ও ব্যর্থতার অপবাদ নিয়ে তাকে এ-ঋণ শোধ করতে হয়। প্রয়োজনে ডিগ্রির সার্টিফিকেট নাই-বা নিলাম; বই পড়ে এবং বাস্তবতার শিক্ষা ভেবে দেখে প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক কিছুই শেখা যায়, করা যায়; কিন্তু শুধু টেকনিক্যাল ডিগ্রি যে সমাজে প্রয়োগযোগ্য হয় না, তা একবারও ভেবে দেখে না। প্রশাসন চালাতে গেলে বাস্তবতাসমৃদ্ধ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হয়। ব্যবস্থাপনার কৌশল জানতে হয়। এছাড়া, যার দূরদর্শিতা যত বেশি, সে তত সফল ব্যবস্থাপক হতে পারে। যদিও এ দেশের বাস্তব বিবেচনায় এগুলো কোনো গুণ নয়। যার যত মুখের জোর, ঘুরিয়ে-পেচিয়ে আঁখড়া জিততে পারে, তৈল-মর্দন করতে পারে, সে তত সফলকাম। অথচ এভাবে প্রশাসন চলে না। ধরা একসময় খেতেই হয়। এজন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করলেও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ‘কমিউনিকেশন স্কিল’ বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে বড় কোনো সংজ্ঞা দেওয়ার দরকার নেই। পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাষাতে, ‘বিনি সুতা মালা গাঁথিছে নিতই এপার-ওপার দিয়া, বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।’ পঙ্‌ক্তিটি ভালোভাবে বুঝে নিতে পারলেই ‘কমিউনিকেশন স্কিল’ বাড়ানো সম্ভব। তবে কোনো শিক্ষার্থীর ‘মাছি মারা কেরানি’ না-হয়ে, দক্ষ ব্যবস্থাপক হতে হলে ‘এনালাইটিক্যাল এবিলিটি’ থাকতে হবে। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অঙ্কের বিভিন্ন পরিমণ্ডল দিয়ে শিক্ষার্থীকে এই ‘এনালাইটিক্যাল এবিলিটি’ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তবে পিওর ম্যাথ ছাড়া ‘প্রায়োগিক ম্যাথ’ এক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্যভাণ্ডারকে সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতির সাহায্যে প্রয়োজনানুযায়ী বিশ্লেষণ

করে সিদ্ধান্তে আসার ব্যবস্থাই হলো ‘এনালাইটিক্যাল এবিলিটি’। বতর্মানে কম্পিউটার ব্যবহার করে কাজটা সুন্দরভাবে করা যায়। ছাত্রছাত্রীরা যত উপর ক্লাসে উঠবে, তাদের এ বিষয়ে তত পারদর্শী হতে হবে। বাস্তব কর্মযজ্ঞে এ-বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্য অরেকটা বিষয়কে এর কাছাকাছি হিসেবে ধরা হয়, সে ‘প্রবলেম সলভিং এবিলিটি।’ যে-কোনো একজন ম্যানেজারের ‘প্রবলেম সলভিং এবিলিটি’ থাকা জরুরি। সংক্ষিপ্ত একটা টেকনিকের কথা বলি: একজন শিক্ষক যদি প্রতিদিনের ক্লাসে একটা দৈনিক পত্রিকা নিয়ে ঢোকেন, তাহলে শিক্ষক প্রতিদিন নিত্যনতুন ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের শোনাতে পারেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ছোট-ছোট গ্রুপ করে প্রত্যেকটা গ্রুপকে একেকটা ঘটনার বিবরণ, ঘটনার কারণ ও সুষ্ঠ সমাধানের উপায় বের করতে বললে তারা গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে এটা করতে পারে এবং শিক্ষক নিজে পরিশেষে সবিশেষ সমাধানগুলো সবাইকে বলে দিলেই এ বিষয়ে প্রতিটা ছাত্রছাত্রী ক্রমশই পারদর্শী ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে। যত উপরের ক্লাসে উঠবে, ছাত্রছাত্রীদের তত কঠিন সমস্যার সুচিন্তিত কারণ ও দিকনির্দেশনামূলক সমাধান বের করতে বলা যেতে পারে। এজন্য কোনো বিষয়ের উপর বাড়ির কাজও দেওয়া যেতে পারে। দরকার শিক্ষকের শিক্ষা, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দলনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান। নইলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। সমাজের জনশক্তি সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্রতী হলে এবং স্বেচ্ছাজাগরূক হলে দেশের মঙ্গল অনিবার্য। তবে এটা সত্য যে, প্রাইমারি এবং নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের বোঝা কমানো বাধ্যতামূলক। মূল কথা হলো প্রায়-প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস এবং পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষা-ল্যাবের গিনিপিগ না বানানো এবং সুস্থ দলহীন মস্তিষ্কে শিক্ষকদের নিয়ে, শিক্ষার্থীদের নিয়ে, শিক্ষার উপকরণ নিয়ে ও সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনকে নিয়ে রাজনীতির খেলা বন্ধ করলেই এ দেশে শিক্ষার মান বাড়তে বেশি দেরি হবার কথা নয়। সে-রকম একটা পরিচ্ছন্ন শিক্ষাঙ্গন জীবদ্দশায় দেখে মরতে পারলে মরণেও শান্তি। ‘আশা সিন্ধু-তীরে বসে আছি সদাই।’

ক্যারিয়ার গড়তে দু-তিনটা দক্ষতার বিষয় উল্লেখ করলাম। এ-বিষয়ে আরো অনেক কথা বলার আছে। এতে লেখার কলেবর বেড়ে যাবে বিধায় বারান্তরে বলার

আশা রাখি। তবে আমার কথা হলো, চলতি অশান্ত পরিবেশেও একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাদান করলেও ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এটা তো সত্য যে, প্রতিটা বাপ-মা তাদের সন্তান মানুষের মতো মানুষ হোক– এটাই চায়। আমরা এই ইচ্ছেশক্তিকে কাজে লাগাতে পারি। দরকার শুধু দল-নিরপেক্ষ ব্রতী শিক্ষক এবং রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমিটি। সিলেবাসটা হাতে-কলমে শিক্ষা, অর্থাৎ প্রায়োগিক শিক্ষার উপযোগী হতে হবে। শিক্ষাদানের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের মাঝখানে অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করতে হবে। অভিভাবক তার সন্তানকে শিক্ষাদানে সহযোগিতা করবেন। বাড়িতে তার সন্তানকে উপযুক্ত পরামর্শ ও স্নেহ দিয়ে সার্বক্ষণিক চোখে-চোখে রাখবেন, যা একজন শিক্ষকের পক্ষে শুধু স্কুলে বসে সম্ভব নয়। আমাকে হাজার হাজার সেয়ানা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডিল করতে হয়। ভিতরের অনেক কিছুই আমার জানা।

একটা ঘটনা আগে বলি: এক ছেলের বাবা আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। ভদ্রলোক সহকারী রেজিস্ট্রারের সাথে অনেক অসৌজন্য আচরণ করছেন, যা আমার কানে আসছে। আমি সহকারী রেজিস্ট্রারকে দিয়ে তাঁকে আমার রুমে আনার ব্যবস্থা করলাম। ভদ্রলোক এসেই আমার সাথে ক্ষিপ্ত আচরণ শুরু করলেন। উনি আমাদেরকে ‘লক্ষ-লক্ষ টাকা নিচ্ছেন, অথচ আরো টাকা ধরার জন্য আমার পড়ুয়া ছেলেকে বার-বার ফেল করিয়ে দিচ্ছেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অভিযোগ আনছেন। আমি তাঁকে হাসিমুখে বসতে বলে চা-বিস্কুটের অফার দিলাম। সহকারীকে চা-বিস্কুট দিতে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর ছেলে খুব ভদ্র, সারারাত জেগে লেখাপড়া করে এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখেন। অথচ ছেলেটা এই তিনবার ফেল করেছে বলে আমরা তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছি। ছেলেটা তার চেয়ারের পিছনে চেয়ার ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। আমি ছেলেটাকে একটু রুমের বাইরে যেতে বললাম। ছেলেটার রুমে কম্পিউটার আছে কি না, ইন্টারনেট আছে কি না, কম্পিউটারটা কোন দিকে ঘোরানো– এসব জানতে চাইলাম। ছেলেটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে পড়াশোনা করে কি না– তাও জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে উনি সবকিছুই সত্য করে বললেন। ছেলেটা আসলেই দেখতে ভদ্র ও নম্রগোছের বলে আমারও মনে হলো। প্রসঙ্গ বদল করে অন্য কথা বলা শুরু করে

দিলাম। লেখাপড়া জানা লোক, ভালো চাকরি করেন, জানলাম। চা-বিস্কুট খাওয়া শেষে তাঁকে অনুরোধের সুরে বললাম, 'ভাই, আমার একটা কথা রাখবেন কী? আজ থেকে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। ছেলেকে ঘরের দরজা খোলা রেখে রাতে পড়াশোনা করতে বলতে হবে। আপনি একটু কষ্ট হলেও কয়েকটা রাত মাঝে- মধ্যে হঠাৎ তার রুমে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখবেন, সে কী করছে। আগামী এক সপ্তাহ পর আমার এখানে আরেকবার চায়ের দাওয়াত নিন।' এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। মনটা ভার। সাথে ছেলে আসেনি। তিনি বললেন, 'শতবার বলেও তাকে রুমের দরজা খোলা রেখে পড়াশোনা করাতে পারিনি।' তিনি আরও বললেন, 'আমি বুঝেছি ছেলেটা সারারাত জেগে ইন্টারনেটে খেলা করে, অথবা অন্য কিছু করে।' আমি পত্রিকায় পড়া এক ভদ্রলোকের তথ্যের জের টেনে বললাম, 'বর্তমানে এ দেশের শতকরা পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর ভাগ উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি দেখে।' তাঁর ছেলের ক্রমশ বিবর্ণ চেহারার কথাও উল্লেখ করলাম। ঐ ভদ্রলোক খুব কষ্ট পেলেন। আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। জানিনে, ঐ ছেলের ভবিষ্যৎ কী হয়েছে। ভদ্রলোকও আর কোনোদিন আসেননি।

এ দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-বাহাদুর নিশ্চয় অশ্লীল ছবির রমরমা ব্যবসা যবুসমাজের ভালোর দিকে তাকিয়ে বন্ধ করতে চাইবেন না। আমার মতো এক ক্ষুদ্র মাস্টারসাহেব সেটা দাবি করতে হয়তো পারেন– তবে তাতে কাজও হবে না। অথচ নিরুদ্দেশ থেরাপির ভয় থেকে যাবে; কারণ এর সাথে বড় ব্যবসা ও ব্যবসায়ী জড়িত।

এ দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সকাল দশ-এগারোটার আগে বিছানা ছাড়ে না। তারপরেও ক্লাসে এসে ঢুলুঢুলু চোখ। চোখ দেখেই বলে দেয়া যায়, সে রাত জেগেছে, না নেশা করেছে। এ তো সারা দেশের অবস্থা। দেশের অবস্থাই বা বলি কেন! ইউরোপেও বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের একই অবস্থা দেখেছি। সেখানেও সারারাত জেগে ফেসবুক ব্যবহার করে রাত তিনটার পর ঘুমাতে যেতে দেখেছি। সকালে উঠতে বড্ড কষ্ট। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের বাপের টাকায় পড়াশোনা;

এছাড়া হোটেলের পার্টটাইম চাকরি, সাথে ফেস-বুক। পড়ার বেলায় লবডঙ্কা। এ দেশে যত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে নেশার বাজার বসে, তা রাজনৈতিক স্থানীয় নেতৃত্ব, রক্ষকবাহিনী এবং নেশাখোরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এটা এ দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে। মাঝখানে ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এই ত্রি-ভুজ প্রেমের বন্ধন না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ভালো পথে ধরে রাখা দুরপনেয়। আর এ কথা বলার আমিই-বা কোন ছার! এই যে ছাইভস্ম খেয়ে, মোবাইলে শতেক খেলা খেলে ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুমোতে যায়, এ-ধরনের ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বা জীবনকর্ম হওয়া উচিৎ কি না? শুধু খনার বচনের উদ্ধৃতি টেনে উচ্চকিতভাবে বলা যায়, 'দিনে ঘুমায় রাতে জাগে, তার রোগ সকলের আগে।' তবে অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে অন্তত আন্ডারগ্রেড পর্যন্ত গড়ে তোলা একজন প্রকৃত শিক্ষকের পক্ষে এখনও সম্ভব। আমি দেখছি, ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অশ্লীলতা ও নেশার ব্যবহার এখনও অতটা পৌঁছায়নি। কারণটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ছাত্রছাত্রীদেরকে আগেই এক বা একাধিক ভালো সহপাঠী দিতে হবে, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কথায় আছে, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।' এমনটি না করি। সেটা ধর্মীয় শিক্ষায় সম্ভব। মহামানবদের জীবনী তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে বেশি বেশি পড়াতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের বীজ জীবনের প্রারম্ভেই মনের মুকুরে প্রোথিত করতে হবে। শক্তি প্রয়োগ না করে, নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে হবে। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে, সুশিক্ষা নিলে ভবিষ্যতে কী কী ভাবে উপকৃত হতে পারবে, তা বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন। মনের পজিটিভ পরিবর্তন আনতে হবে। কাঁচা মনের প্রথম শিক্ষা আজীবন থাকে।

ধর্ম (ধৃ+মন) ছাড়া নৈতিক শিক্ষা আসতে পারে না। মন যে বিশ্বাসকে ধারণ করে রাখে সেটাই ধর্ম। তার মানে এই নয় যে, ধর্ম পড়লেই সে নীতিবান হবে, কিংবা যাদের ধর্মাচার মানার অভ্যেস নেই, তারা সবাই নীতিহীন। এর সাথে আরো অনেক ফ্যাক্টর জড়িত। তবে ধর্ম না থাকলে সেখানে অধর্ম থাকাটাই স্বাভাবিক।

সংক্ষেপে আরেকটু বলি, আমরা যে জ্ঞানার্জন করি তা বিভিন্ন শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই শিক্ষাগুলো আবার অসংখ্য আন্ডারলাইং এজামশনকে ভিত্তি করে মনের মধ্যে টিকে আছে। এই এজামশনগুলো যত সঠিক হবে, শিক্ষা তত মজবুত হবে, কারো অর্জিত জ্ঞান তত সমৃদ্ধ হবে।

একসময় রোভার স্কাউট লিডার হিসেবে প্রায় নয় বছর কাজ করেছিলাম। রোভার স্কাউটে একজন স্কাউটকে সমাজসেবা. নৈতিক শিক্ষা, স্বনির্ভরতাসহ জীবনমুখী বিভিন্ন বিষয়ে টেইনিং দেওয়া হয়। এগুলোর প্রায়োগিক দিককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। রোভার স্কাউটের মূলনীতিমালা খবু ভালোভাবে ভেবে দেখেছি। ধর্ম থেকেই এর বিভিন্ন কাজ ও সেবাকে নেওয়া হয়েছে; স্কাউট শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একই কাজকে ধর্মের নামে দিলে হয়তো আমাকে মৌলবাদী বলা হতো। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদেরকে রোভার স্কাউট ও গার্লস গাইডের ছায়াতলে প্রশিক্ষণ দিলেও তারা সুশিক্ষিত, সমাজসেবক ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্কাউটের মূলনীতিতে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদেরকে আনন্দদায়ক প্রায়োগিক শিক্ষার দিকে প্রথম থেকেই আনতে হবে। আমার ভালো মনে আছে, আমার এক সম্মানিত শিক্ষক আমাদেরকে ক্লাসে খুব হাসাতেন। আমাদের কিশোর মনে যে বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় ভাবতাম, তিনি সেখান থেকে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যি দিয়ে যা শিখতাম আজও মেনে চলি এবং এখনো অনেকটাই মনে আছে। শিক্ষাগুলো আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। অথচ ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত যতবারই ‘কাউ’, ‘জুট’, ‘জার্নি বাই বোট’, ‘এইম ইন লাইফ’ রচনা মুখস্থ করিয়েছে, ততবারই পরীক্ষার পরপরই ভুলেছি। শিক্ষকদের মুখস্থ করানোর প্রবণতা কমাতে হবে; শেখাতে হবে। প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করতে হবে। নোট বই, গাইড বই বাজার থেকে উঠিয়ে দিতে হবে। রেডি জিনিস মুখস্থ বন্ধ করালেই নোট বই আপনা-আপনি বাজার থেকে উঠে যাবে। এছাড়া স্কুল কমিটিতে যদি দলীয় টাউট, গম চোর, লম্পট না-ঢুকে থাকে, কমিটি যদি এলাকার সুশিক্ষিত, সুনীতির লোকবল দিয়ে পরিচালিত হয়– তাহলে শিক্ষার উন্নতি হতে বাধ্য।

শত-শত ঘটনার মধ্য থেকে একটা আবার বলবো:

খুলনা-যশোরের মাঝামাঝি কোনো এক এলাকার এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমার অফিসে একদিন এলেন। সাথে তাঁর ছেলেটা। আমার ছাত্র। বসিয়ে চা খাওয়ালাম। স্বল্প-আয়ের লোক। লেখাপড়াও যে খুব বেশি জানেন, তাও নয়। ছেলের কথা খুলে বললেন। চারবার পরপর ফেল করেছে। এখানে পড়া খরচ ছাড়াও বেশি বেশি করে টাকা ছেলেটা বাড়ি থেকে নিচ্ছে, খুব অসুবিধার মধ্যে আছেন। ছেলেটা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার আব্বার কথাগুলো ছেলেটাও শুনলো। ছেলেটাকে নম্র ও ভদ্রগোছের বলে মনে হলো। আমি কোনো উত্তরবাদ করলাম না। দুপুর হলো। ভদ্রলোক অনেক দূর থেকে এসেছেন ভেবে ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়ে তিনজন খেলাম। ভদ্রলোককে এবার বুঝিয়ে বললাম, ‘আমি আগামীকাল আপনার সাথে কথা বলবো। আজ আপনাকে ঢাকায় কোথাও থাকতে হবে। আজ আমি ছেলেটার সাথে আলাদাভাবে বসতে চাই।’ উনি ছেলেটাকে রেখে চলে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে পাশের একটা রুমে নিরিবিলি বসলাম। ছেলেটা তার আব্বার কথা সত্য বলে জানালো। আমি তার এ অবস্থার কথা অকপটে খুলে বলতে বললাম। তার কোনো অসুবিধা আমি করবো না বলে অভয় দিলাম। সে এবার বলে চললো– ঢাকায় এসে কোথাও থাকার জায়গা ছিল না। কয়েক বন্ধুর সাথে শাহবাগে মেসে উঠেছিল। তারাও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কেবল সে-ই আমাদের এখানে পড়ে। এসএসসি এবং এইচএসসিতে রেজাল্ট মোটামুটি ভালই করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তার এলাকায় এক বড় ভাই আমাদের এখানে ভর্তি হতে বলেছিল। ভর্তির পরপর মেসের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা উঠিয়ে রুমে টেলিভিশন কিনেছে। সে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে একটা ল্যাপটপও কিনেছে। নতুন নতুন প্যান্ট ও জামা-জুতো কিনেছে। বন্ধুরা বলে, গ্রাম থেকে ঢাকায় এলে প্রথমেই আধুনিক হতে হয়, নইলে মানুষ ‘খ্যাত’ বলবে। হাঁটুতেসহ সাত-আটটা পকেটওয়ালা প্যান্ট বন্ধুরা কিনিয়েছে। প্রতিটা কেনাকাটায় বন্ধুদের খাওয়াতে হয়েছে। এলাকার ভাষা ছেড়ে এখানকার প্রচলিত ভাষা যেমন–‘হ, কয়ছি’, ‘বুচতাছি না’, ‘চাক্কা ফাইট্টা গ্যাছে’, ‘খাইচোস’, ‘করচোস’, ‘ভাবচোস’ ইত্যাদি

করে কথাকে বিকৃত করে বলে আধুনিক হবার ট্রেইনিং বন্ধুরা দিচ্ছে। ক্লাসে কম থাকে। সারা দিন বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা দিয়ে কাটায়। সন্ধ্যার পর যে যেখানেই থাকে, মেসে ফেরে। বন্ধুদের কেউ-কেউ দশটার পর মেসে ফেরে। সবাই একসাথে বসে খায়। সন্ধ্যা থেকেই টিভি ছাড়া হয়। ভারতীয় বিভিন্ন সিরিয়াল, নাটক, ছায়াছবি দেখে। রাত বারোটা পর্যন্ত টিভি চলে। তারপর ল্যাপটপে দূরের বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন কথা, আড্ডা, ছবি পাঠানো, গেম ইত্যাদি করে রাত তিনটা-সাড়ে তিনটা বাজায়। শরীর খারাপ লাগলে একটু আগে শুয়ে পড়ে। সকাল দশটা-এগারোটার আগে ওঠে না।

সে তার বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। তার আব্বার বাস্তব পরিস্থিতির কথা, শারীরিক অবস্থার কথা, তার জীবনের পরিণতির কথা বেশ বিষাদময় ভঙ্গিতে তুলে ধরলাম। তাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ভালো ছাত্রের সাথে থাকার জন্য মেস খুঁজে দেবো বলে জানালাম। প্রতি সপ্তায় আমার সাথে একবার দেখা করতে হবে– এ প্রতিশ্রুতি নিলাম। পরের দিন তার আব্বাকে সাথে নিয়ে আমার কাছে আবার আসতে বললাম। পরের দিন সে তার আব্বাকে নিয়ে আমার কাছে এলে ভদ্রলোককে 'বিষয়টা আন্তরিকভাবে দেখবো, ওর জন্য দোয়া করবেন, আবার আসবেন, দেখা হবে' বলে বিদায় জানালাম। ছেলেটা আমার পরিচিত-জনের সাথে মেসে থাকলো। বছরখানেক আমার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আমি দেশের বাইরে চলে যাওয়াতে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক বছর দূরে দূরে। দেশে এসেছি। আমার নির্ধারিত রুমে বসে আছি। একটা ছেলে অনুমতি নিয়ে আমার রুমে ঢুকলো। তাকে বসতে বললাম। সে সামনে না বসে টেবিলের পাশ দিয়ে আমার দিকে আসতে চাইলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এবার সে আমার পা ছোঁয়ার চেষ্টা করলো। আমি দু-হাত দিয়ে তার হাত দুটো ধরে সামনে বসালাম। সে তার পরিচয় দিলো। আমি চিনলাম। বেশ মোটা-সোটা হয়ে গেছে। চেহারায় কমনীয়তা এসেছে। একজন অফিসার-অফিসার ভাব তার মধ্যে চলে এসেছে। সে নাকি আমার সাথে দেখা করার জন্য আরো দু-দিন এসেছে কিন্তু আমাকে রুমে না-পেয়ে ফিরে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ক্ষণকালের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে গেলাম, চোখে পানি চলে আসতে চাইলো। কোনোভাবে ঠেকালাম।

সাধারণত কোনো লোক আমার চোখে খোঁচা না মারলে পানি কখনো আসে না। তার বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। চা খাওয়ালাম। সে একটা বড় কোম্পানির মধ্যম পর্যায়ের অফিসার বলে জানালো। রেজাল্ট খুব বেশি ভালো করতে পারেনি। প্রথম দিকের কিছু বিষয়ের ফল অপেক্ষাকৃত খারাপ থাকায় গড়ে এরকম হয়েছে। সে একটা ভালো বিষয় নিয়ে 'মেজর' করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচজন আন্ডারগ্রাজুয়েট পাস ছাত্রছাত্রী তার কোম্পানির জন্য নিতে চায়, জানালো। আমাকে প্রার্থী সিলেক্ট করে সিভিগুলো তাকে দিতে বললো।

আমাদের এখানকার বেশ কিছু শিক্ষক একই কাজ করেন বলে আমি জানি। এভাবেই শিক্ষকদের ট্রেইনিংও দেওয়া হয়। এতে এই অধঃপতিত সমাজব্যবস্থায় অনেক ছাত্রছাত্রীকে নিশ্চিত-পতিত অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। অভিভাবকমহলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেলে এবং শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাগুরু হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সিলিং করলে, এখনও ছাত্রছাত্রীদের মানুষ বানানো সম্ভব। একটা কারণ হলো, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতি নামক বিষাক্ত বস্তুটা এখনো নেই। এটা শত হতাশার মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো। শিক্ষকদের নিজের টাকা নিজে রোজগার করে বেতন পেতে হয়, এটাও একটা দিক। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ প্রক্রিয়া শুরু হলে কুঁড়িতে পোকায়-খেয়ে ঝরে-যাওয়া ফুলগুলোকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ করে দেওয়া যায়। এতে ছেলেমেয়েরাও নিজের প্রতিভার জোরে বিকাশ লাভে সক্ষম হয়, তাদের বাপ-মাও এদেরকে রেখে একটু শান্তিতে মরতে পারেন। রাজনীতিবিদদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমি নিজ উদ্যোগে শেষ বয়সে এসে আমার গ্রামে 'কেএসএম শিক্ষা-সেবা কমপ্লেক্স' নামে একটা মডেল একাডেমি, একটা এতিমখানা, একটা টেকনিক্যাল স্কুল, একটা হেফজখানা এবং একটা কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছি। এ কাজে এলাকার সমাজসেবকদের সাথে নিয়েছি। কাজ বেশ দূর এগিয়েও গেছে। এ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটা

পরিচালনা কাউন্সিলও গঠন করেছি। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে আধুনিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করাই আমার লক্ষ্য। আমার বিশ্বাস, এতে গরিব, এতিম ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবিকভাবে, এ দেশে তো প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। জীবনের শেষ-বিকেলের এ আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা কতদূর এগিয়ে নিতে পারবো, জানিনে। তবে চলার পথে কোনো কলুষতার আবর্তে আমি আটকা পড়তে চাইনে। আমার জীবনাবসানের পর কোনো সহৃদয় রাজনৈতিক উচ্ছিষ্টভোগী ব্যক্তিত্ব 'শিক্ষার জীবন্ত পৃষ্ঠপোষক' বাতাবরণে উড়ে এসে জুড়ে বসলেও বসতে পারেন। সবই ভবিষ্যৎ ও বাস্তবতার নিরিখে আমার মনের ভয়।

এ বিষয় একটা কথা সত্য যে, আমি একজন বেতনভোগী শিক্ষক হিসাবে সেখানে পুরো কমপ্লেক্সের জন্য কত টাকাই-বা নিজের পকেট থেকে ব্যয় করতে পারবো! সাধ্যমতো করবো। এলাকার সমাজসেবকরাই আমার ভরসা। এ দেশের অনেক পরিবার আছে, যাদের জীবনটা বিত্ত-বৈভবে পূর্ণ, মানসিকভাবে উদার ও দয়াবান। দাতব্য ও জনহিতকর কাজে উদারহস্ত, এতিমদের শিক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগী। এজন্য কোনো 'দানবীর' বা 'প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক' কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খোলা মন নিয়ে এগিয়ে এলে সে-দান ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে আজীবনের জন্য লেখা থাকবে। দাতাও মানসিকভাবে তৃপ্তি পাবেন। এ-দান কোনোভাবেই ব্যক্তির পকেটে যেতে দেব না। এছাড়া আমার এ উদ্যোগে এ দেশের আরো অনেকে খোলামন নিয়ে এমন কাজে উৎসাহিত হলে নিজেকে সার্থক বলে মনে হবে।

ছয়

শিক্ষার প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে এতক্ষণ আলোকপাত করেছি। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারি ও বেসরকারি মিলে বেশুমার। তাদের কর্মকাণ্ডও বেশুমার। 'বেশুমার বাতি আসমানের অত বড় ছাতি ছাইয়া আছে'-র মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জীবনাকাশে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে। বেসরকারিগুলো কেউবা দোকানের উপর, কেউবা গাড়ির গ্যারেজের উপর, কেউবা গলিপথে, আবার কেউবা প্রকাণ্ড বিল্ডিং করে বাতি জ্বালার কাজে ব্যস্ত। সবাই নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এ-দেশের সেরা বলে দাবি করে। ঢাকায় বসবাসকারী কাউকে কাউকে উল্লাস করে বলতে শুনেছি, 'আমাদের গলিতে অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আমরা জিইত্তা গেছি।' শুনতে ভালোই লাগে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এদেশ আলোকিত হয়ে উঠবে, এটাই একমাত্র আশা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষের রুজি-রোজগার-ব্যবসা। ঢাকায় যত কোচিং সেন্টার ছিল, প্রায় সব ক'টিই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স নিয়েছে। প্রদীপ যত আলোও তত। সার্টিফিকেট বিক্রিও তত। আজব এক গোঁজামেলে পরিসংখ্যান। মেলানো অতটা সহজ নয়। বাস্তবতার রকমফের আকাশের সুদূর নীলিমায় হারিয়ে গেছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি পাসের সার্টিফিকেটটা জমা দিয়ে নামটা লিখিয়ে রাখলে ও কিছু পয়সাপাতি খরচ করলেই সময় শেষে উচ্চ-মানের কাগজে প্রিন্ট করা ও সিল মারা সার্টিফিকেট হাতে চলে আসে। দৈনিক পত্রিকার ভেতরের পাতায় ফোন নম্বর দিয়ে এক কলামে চার-লাইন জুড়ে সার্টিফিকেট পেতে আগ্রহীদের যোগাযোগ করতে বলেন। আমি কয়েকবার ফোন করেও দেখেছি। টাকা দিলে অনার্স থেকে শুরু করে পিএইচডি ডিগ্রির সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। সেজন্য দুর্মুখেরা 'সার্টিফিকেট বিক্রি' শব্দটা উল্লেখ করলেই সুবিধাভোগীরা তেড়ে আসেন। বুঝতে চান না যে, এ-দেশে বসবাসকারী প্রতিটা মানুষেরই এক-জোড়া করে চোখ আছে। তাছাড়া, তারা একটু-আধটু ভাতও খায়। ফলে তারা বোঝে। আমি চুপ থেকে মুচকি হাসি। এদেশে সত্যকে সত্য বলার সাহস ক-জনের আছে? চুপ থাকলেই তো আর 'সত্য' মিথ্যা হয়ে যায় না। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণের

ইচ্ছেও নেই। যারা নিয়ম মানেন, শুধু তাদের উপরই যত খবরদারি। ‘ওপেন মার্কেট ইকোনমি’। চাহিদা আছে, তাই জোগান আছে। জোগানদাতাও আছে। কোনো জায়গায় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে শুধু সার্টিফিকেট বিক্রির ক্ষেত্রেই-বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে কেন? যত পারো সার্টিফিকেট প্রিন্ট করিয়ে নাও। ‘মাকালের ফল দেখতে ভালো, উপ্‌রি লাল ভিত্‌রি কালো।’ আমি বলি, সবই ভালো। ‘ফুলের বনে যার পাশে যায় তাকেই লাগে ভালো।’ বাইরে উন্নয়নের জোয়ার এবং ভিতরে সার্টিফিকেটের জোয়ার, আর কী! আমাকেও অতীতে অনেকবার রিক্সাওয়ালাকে জায়গা চেনাতে হয়েছে। ঐ যে, কালাচাঁদপুর রোডের লালচাঁদ রেস্তোরাঁর গলির মধ্যে ‘ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি’ নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে-না? ওখানে যাবো। না চিনলে ঐ গলির ধারে নামিয়ে দিলেই হেঁটে চলে যাবো, অসুবিধে নেই। ভাড়া কত দিতে হবে একটু বলুন? অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি, চুলপাকা জাঁদরেল নামকরা লোকজন বিভিন্ন পদে বসে আছেন। মালিকের সেবাদাস, যাকে বলে ট্রাস্টি-বোর্ডের সেবাদাস। ইউনিভার্সিটি চালায় মালিক, টাকা নেয় মালিক, পাঁচ শ টাকার চেকেও সই করে মালিক, সিদ্ধান্ত নেয় মালিক, অন্যান্য পদাধারী জনবল সাক্ষীগোপাল। গণেশ ধ্বজা ধরে বসে আছেন। কোচিং ব্যবসার মালিক হয়েছিলেন, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক হয়ে বসে আছেন। একই তো ব্যবসা, পড়ানোর ব্যবসা। আগেও নোট মুখস্থ করাতো, এখনো তাই। শুধু ফি-র হার বেড়েছে। একজন মালিক ও চেয়ারম্যান, প্রথম স্ত্রী বোর্ড মেম্বার, দ্বিতীয় স্ত্রী ভিসি, শাশুড়ি ট্রেজারার– আবার কী চাই! বাকিরা অনুগত সার্ভেন্ট। খেলা চলছে হরদম।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন রাজনৈতিক দলের সেবাদাস। রাজনীতির ধ্বজা ধরে বসে থাকা মূল দায়িত্ব। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক যুগেও শত শত বছর আগের দাস ব্যবসা রমরমা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পদে যাওয়া তো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। শতাধিক ক্ষমতাধর লোকের তৈলমর্দন করে, মন জুগিয়ে, জুতার তলা ক্ষয় করে কস্মিনকালে যদি পদটায় বসতে পেরেছেন, তো মরেছেন। ‘স্ট্যান্ড এট ইজ’ না হয়ে ‘এটেনশন’ হয়ে সদা-সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দেখতে হবে কোথায় দলবাজ লোকের স্বার্থহানি হচ্ছে। দায়িত্ব পাওয়ার পর একটু

নড়াচড়া করেছেন তো মরেছেন। কিংবা দলীয় তোষামোদকারীদের মুখে স্বার্থের ফোঁটা একটা কম পড়েছে তো শতেক কল্পিত অভিযোগে আপনি সাক্ষাৎ আসামি। আর আপনিও তো তদবির করে দলবাজি করার জন্য পদে এসেছেন; শিক্ষার উন্নতি করার জন্য নিশ্চয়ই আসেননি। সুতরাং দলবাজদের প্রশ্রয় দিয়েই তো আপনাকে টিকে থাকতে হবে। ঐ পদে আসার জন্য ওত পেতে বসে থাকা অগণিত পদ-প্রত্যাশী ব্যক্তিগত সতীর্থদেরকে টাকা খরচ করে হলেও আপনার পিছনে লেলিয়ে দেবে। সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার আপনার মাথায় নিয়ে চুনকালি মেখে পালিয়ে পদ ছাড়তে হবে। নইলে খুঁটির জোর দেখিয়ে এ-বারের মতো হয়তো টিকে যেতেও পারেন। তবে প্রথম মেয়াদ শেষ হবার এক বছর আগে থেকেই একটা ধাক্কা ক্রমশই আসতে থাকবে। সময় যত কাছাকাছি হবে, ধাক্কা ও স্লোগানের পাল্লা তত ভারী হবে। সবশেষে পত্রিকাগুলো ওদের কেনা এজেন্ট হয়ে আপনার খুঁত বের করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে। শেষে অপদস্থ হয়েও 'ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন' হতে পারে। পেশার কারণে অনেক সরকারি ইউনিভার্সিটির সাথে মোটামুটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। তাদের অবস্থা, দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মকাণ্ড শিকেয় উঠেছে। বিভাগীয় প্রধান, ডিন, প্রতিটা শিক্ষক রাজনৈতিক চালবাজিতে মেতেছে। বেশ কিছু জায়গায় ইন্টারভিউ বোর্ডেও দেখেছি, ঐ সমস্ত জায়গার লেখাপড়ার অবস্থা খুব হতাশাজনক। অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামেও হাতে গুনে নোট মুখস্থ করিয়ে পড়ায়। শিক্ষার মান অতি নিম্ন। শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপ্রীতি। যার ছাত্রকে জ্ঞানদান করার কোনো যোগ্যতাই নেই, সে শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত। খুটো ও টাকার জোরে। শিক্ষার উপকরণের বেশ ঘাটতি। কোনো বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক উপকরণ দিয়ে উপস্থাপন করতে জানে না; অথচ ভালো ফলাফল করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ নেই বলে শিখতে পারেনি। ব্যাক-ডেটেড সিলেবাস। টেকনোলজির ব্যবহার নেই। এসব ভালো ছাত্রছাত্রীকে বাস্তবে এসে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় এলামনাই সম্মেলনে গেলাম। মাত্র দু-বছর আগে সাতষট্টি বছর পর এলামনাই গঠিত হয়েছে। এই

দু-বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গেলাম মাত্র একবার। দলাদলির অন্তঃকলহের জেরে পরের কমিটি আর হলো না। কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা নেমে এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরদিন অনুষ্ঠানে আর যোগ না দিয়ে ঢাকার পথে রওনা দিলাম। এই যে দলবাজি, প্রতিহিংসা, মানসিক দেউলেপনা –এর জন্য দায়ী কে? দায় তো কাউকে না-কাউকে নিতেই হবে।

বিধাতার অশেষ কৃপায় আমাকে যোগ্যতা না-দিয়ে অযোগ্য করে পাঠানোতে সুবিধা পাচ্ছি। তাও ভবিষ্যতে যে কী অপমান এই রংচটা কপালে লেখা আছে, ভাবতে গা শিউরে ওঠে। এই ভয়ে প্রতিদিন স্নান করার সময় সাবান ও 'তিতপোল্লার খোসা' দিয়ে কপাল ঘষতে থাকি, আর বিধাতাকে বলি, বিধাতা, আমার কপালে যদি অপমানিত্বের কোনো দাগ থাকে, তো মুছে পরিষ্কার করে দাও। আমি হতভাগা, বড্ড ভয়ে আছি এ তটে বেটাইমে জন্মিয়ে, শেষতক রক্ষা করো! আবার কখনো বাথরুমে গিয়ে গুন গুন করে ধুয়ো-জারির দোয়ারকির মতো সুর ধরি, 'কালী এবারও ত্বরাইতে হবে ওহে ত্রিনয়না–আ-আ, কালী এবারও-ও।' হিন্দু মিথোলজিতে 'কল্পতরু' নামে একটা গাছ আছে, যে স্বর্গীয় বৃক্ষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়। এদেশের কল্পতরু আমি জানি চিনি; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল চাইতে কেন জানি ইচ্ছে করে না। নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখি, সঙ্গ এড়িয়ে চলি। বেতনটা বৈধ বা হালাল করার জন্য যতটুকু করা উচিত বলে মনে করি, সেটুকুই করি। কোনোভাবে এ যাত্রা রক্ষা পেলেই চিরতরে বেঁচে যায়। কেননা, আমি বুঝি, একজন শিক্ষক স্বাধীনচেতা। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায়, অবিচার ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সদা-সতর্ক ও প্রতিবাদী। কোনো ব্যক্তিপূজা কিংবা দলকানা আদর্শের নিগড়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজের জাগরূক বিবেকবোধকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য শাশ্বত শিক্ষকের জন্ম হয়নি। সেজন্য একজন শিক্ষক যদি কোনো অশুভ শক্তির কাছে, অন্যায় ও অবিচারের কাছে তাঁর মাথা ও মগজ জিম্মায় রাখেন, আপস করেন, এটা দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, যারপরনাই ঘৃণ্য এবং জঘন্য অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত। শিক্ষাপ্রশাসনে জের-জবর-নোক্তা চেনেন না, প্রশাসনিক শিক্ষাও নেই– ভালো ছাত্রছাত্রী ছিলেন, নামি-দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাসও করেছেন, ইংরেজির জ্ঞানও চলনসই; অনেক চক

ব্লাকবোর্ডে খরচ করে ভালোভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন, আবার সুযোগমতো কথাও বলতে পারেন, এমন স্কলারদেরকেও এ-জীবনে অনেক দেখলাম। এক বিষয়ে স্কলার হলে যে প্রশাসনিক বিষয়েও স্কলার হওয়া যায় না, তা কাকে বোঝাবো? মানসিক বিকলতাসর্বস্ব। সমাজবিজ্ঞান বোঝেন না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি বোঝেন না, এমন কি এইচআরও বোঝেন না; বুঝতে চানও না– নিধিরাম সর্দার। প্রশাসনে দক্ষ হতে হলে, প্রতিষ্ঠানকে উপরে উঠাতে গেলে– প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি স্ট্যাডি করে নিজের প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে হয়। কখনো সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্ট্যাডি করে, বর্তমান চাহিদাকে সামনে রেখে নতুন-নতুন অনন্য সুযোগ-সুবিধাগুলো তৈরি করতে হয়। প্রয়োগের কৌশল বেছে নিতে হয়। কাস্টমারদের (শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী ও নিয়োগকর্তা) আকর্ষণ করে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রচার করতে হয়। কাস্টমারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হয়। সম্ভাব্য কাস্টমারদের তা জানাতে হয়। পুরো প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামকে দক্ষ লোকবল দিয়ে সাজিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য বণ্টনের পর আপাতত দশ বছরের মতো একটা কৌশলগত পরিকল্পনা ফাঁদতে হয়। ছোট-ছোট টার্গেটে ভাগ করতে হয়। পুরো পরিকল্পনাটা অন্ধের মতো মুখস্থবিদ্যায় অনুসরণ করে গেলে হয় না। একদেশদর্শী হলে হয় না। প্রথম থেকে দশ বছর পর্যন্ত পরিকল্পনাটার বাস্তব রূপ-পরম্পরা হৃদয়পটে ভিজুয়্যালাইজ করার মতো সামর্থ্য থাকতে হয়। পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিকল্পনাকে কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে; এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকা দরকার। প্রতিযোগী-সুবিধাগুলো ব্যবহারের প্রায়োগিক কৌশল বুঝতে হয়। ভাবী-অজানার নীরব আহ্বান কান পেতে পরমজ্ঞানে যে যত বেশি শুনতে পারে– সে-ই সার্থক, সে-ই দক্ষ প্রশাসক; বিজয়ের মালা তার গলাতেই শোভা পায়।

প্রশাসনে অনেককে পাই, নতুনত্বকে মেনে নিতে চায় না। মুখে স্বীকার করলেও কাজে মানে না। টালবাহানা করতে থাকে। গতানুগতিক ধারার বাইরে যায় না। এভাবে প্রতিষ্ঠান ঢিমে-তেতালা তালে চলতে থাকে। এভাবে চলতে থাকলে প্রতিষ্ঠানে যত সম্পদই বিনিয়োগ করা হোক না কেন, সম-ইন্ডাস্ট্রিসমাজে লিডিং ভূমিকায় প্রতিষ্ঠান কোনোদিনই আসতে পারে না।

আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই উপমাগুলো দেবো। যদি ঢাবির আইবিএর কথা বলি, বুয়েটের কথা বলি; আইআইএম, এআইটি, লামস-এর কথা বলি; দেখবো যে, সেখান থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েই ছাত্রছাত্রীরা বাজারে কত টাকা বেতন পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানে তাদের অবস্থান কোথায়। নিজেদের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের যদি তার চেয়ে বেশি বেতন পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করাতে পারি; মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি টিউশন ফি দিয়েও এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাইবে। মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে– এটাও নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে মেধাবী অথচ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্যাডেট কলেজের মতো ট্রেইনিং মোডে শিক্ষা দিতে হবে। জীবন-ঘনিষ্ঠ কোর্স চালু করতে হবে। হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। এদেশে অসংখ্য পরিবার আছে, যাদের সন্তানদের বিদেশে না পাঠিয়ে এদেশেই পড়াশোনা করাতে অনেক টাকা বিনিয়োগ করতেও প্রস্তুত। অর্থাৎ এদেশে একটা ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এখনও বাজার আছে। আমরা বাজারটা ধরতে পারছিনে। মাসে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা, এমনকি পনেরো হাজার টাকা বেতনে আগ্রহী 'নিম্ন-বি' অথবা 'সি' গ্রেডের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করি, সেই লেভেলেই পড়াশোনা করাই। উচ্চ-লেভেলের পড়াশোনা করালে বোঝে না– ক্লাস ছেড়ে পালায়; ভালো ছাত্রছাত্রীরা এ নিম্নমানের লেখাপড়ায় আনন্দ পায় না, শিক্ষককে দোষারোপ করে। তারাও পরে আর ভর্তি হতে চায় না। শিক্ষকও টিকে থাকার স্বার্থে মানমতো পড়াতে পারে না। আসলে জগাখিচুড়ি মার্কা পড়াশোনায় কোনো প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী ভালো করে না। তাই ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেও জীবনে কোনো উন্নতি নেই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও কোনো উন্নতি নেই; আছে শুধু ব্যবসা। এ ব্যবসা চলছে, চলবেই।

কোন বোতামে টিপ দিলে কোথায় গিয়ে বাতিটা জ্বলবে, এমন দূরদর্শিতাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষাপ্রসাশক শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে সংখ্যায় কম। পিউর শিক্ষক দিয়ে প্রতিষ্ঠানের বেশি উন্নতি হয় না। তাঁরা নিজ বিষয়ে গবেষণা এবং পড়াতে জানেন। ইন্ডাস্ট্রি থেকেও প্রাকটিক্যাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ ম্যানেজারদের শিক্ষাঙ্গনে অতিথি-শিক্ষক হিসেবে আনতে হবে। তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে দিতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ইন্ডাস্ট্রি কোল্যাবোরেশন গড়তে হবে। শিক্ষকরা একটু বেশি বাচাল হয়, সেজন্য শিক্ষাঙ্গনে বা শিক্ষা-প্রশাসনে বাচালমার্কা 'সব-কিছু-বুঝি' মডেলের প্রশাসকের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ শিক্ষক সহজ-সরল জীবনযাপন করার কারণে এবং বাস্তবের ঘা-খাওয়া জীবন এড়িয়ে যাওয়ার কারণে বাস্তবতাজ্ঞান বিবর্জিত। কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ও মার্কেটিং বোঝেন না। তাই এদেশের শিক্ষাপ্রশাসন অবাস্তব, অপক্ক, 'চলনসাঁট' গোছের বা চলনসই গতিতে চলে দিনাতিপাত করে যাচ্ছে। আমরা মাস্টাররাও 'ভালো বেশ-বেশ' বলে তালে তাল দিয়ে দিন পার করছি।

এদেশে অনেক বহুজাতিক কোম্পানি সফল ও সার্থকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক দেশীয় কোম্পানিও বহুজাতিকের মতো সমান তালে উপরে উঠে গেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে কি একটা অলাভজনক এন্টারপ্রাইজ হিসাবে গণ্য করা যায় না? সেখানে লাভের পরিবর্তে 'রেট অব রিটার্ন' এবং সারপ্লাস অবশ্যই থাকতে হবে, রিইনভেস্টমেন্টও থাকতে হবে। আমি দেখছি, বাজার তো এখনো আছে। নতুন আইডিয়া নিয়ে বাজারে আসা দরকার। আমি বুঝি, 'সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, মানুষগুরু নিষ্ঠা যার, ভবে মানুষগুরু নিষ্ঠা যা-আ-র।' আমি খুঁজি, দূরদর্শী নিষ্ঠাবান একজন দক্ষ ম্যানেজার। হাতে গোনা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ এখনও বিদ্যমান। এটা একটা ভেঞ্চার হিসেবে নিতে হবে। মগজে মার্কেটিংয়ের যথার্থ প্রায়োগিক দিকটা থাকতে হবে। জানতে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে; কোয়ালিটি ফেরাতে হবে, রাখতে হবে। তারপরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নয়া দিগন্তের স্বরূপ উন্মোচন করা যাবে।

শিক্ষাপ্রশাসন ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষ নিয়ে আরো সমস্যা আছে। যদি বলা হয়, বিগত দশ-পনেরো বছর ধরে তো প্রতিষ্ঠান চলছে। এক বছরের 'রেভিনিউ লস' বা 'অপরটিউনিটি লস' বা 'অপরটিউনিটি কস্ট' কত? তার হিসাব কোথায়? 'রেট অব রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট' কত? তখনই কুপোকাত! মালিকপক্ষও এ বিষয়টা কখনো জিজ্ঞেস করেন না; শিক্ষাপ্রশাসনও এ বিষয়ে মুখ না খুলে কুলুপ এঁটে নির্বিকার বসে থাকে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রপ্রাইটি অডিট (যথাযোগ্যতা,

যৌক্তিকতা, যথার্থতা অডিট) করানো হয়, তখনই থলের বিড়াল বের হয়ে আসবে। দেশে বাস করে সৌভাগ্যবান আমরা এই কারণে যে, সরকারি, বেসরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে মাথা ঘামায় না, কিংবা মাথা ঘামানোর রেওয়াজ নেই। যা পায় তাতেই খুশি থাকে। যাকেই হাতের কাছে পায়, এসব খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনায় না-এনে তার কাঁধে ভর করে টিকে থাকতে সচেষ্ট হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতেই হয়। 'একবার চাবি মাইরা দিছে ছাইরা জনম ভইরা ঘুরতা-আ-ছে, মন আমার দ্যাহ ঘরি যতন করি কুন মিস্তুরি বানাই-আ-ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে বড় অসুবিধা হচ্ছে– কূটকৌশলী একটা পক্ষ। সেখানে বিরোধী বা স্ববিরোধীও থাকতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানেও এ আবহ বিদ্যমান। এটা জাতিগত সমস্যায় রূপ নিয়েছে। পদ ও স্বার্থান্ধতা এর কারণ। নিজে যে যেখানে আছে কেউই সুখে নেই; কর্মে শান্তি উঠে গেছে। দেশব্যাপী কাজের পরিবেশ নেই। মানসিকতার বিকলতা এর জন্য দায়ী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এর বাইরে নয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নেই, সেখানেও প্রশাসনের মধ্যে গ্রুপিং, সাব-গ্রুপিং, ল্যাং মারামারি বিরাজমান। এতে আমরা সবাই মজা পাই। কোনো-না-কোনোভাবে লাভবান হবো, সুপ্ত মনে এই বাসনা। বাসনাটা অধিকাংশ সময়েই আবার প্রকাশও করবো না। 'মনে আশা আছে রে বন্ধু যাবো তোমার ঘর, মনে আশা আছে রে বন্ধু-উ-উ।' এতে যে কাজের পরিবেশ, পারস্পরিক শান্তি উঠে যাচ্ছে, তাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই, 'বলে বলুক লোকে মানি না, মানি না, কলঙ্ক আমার ভালো লাগে-এ-এ, কলঙ্ক আমার ভালো লাগে এ-এ।' সবচে বড় অসুবিধা হলো এদের অনেকেই সর্বৈব মিথ্যার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছুতেই মিথ্যা ও কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। বাঙালি এমন একটা উৎকৃষ্ট জাতি, সবকিছুরই বিকল্প বের করে ফেলে। এর আগে সম্ভবত কোথাও লিখেছি যে, প্রশাসনের উচিত কোনো কান-কথার ক্রস-চেকিং করে নেওয়া। একটা ঘটনা বলি: একজন শিক্ষক সৎ, ক্ষমতাধর, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন– সত্যকে সত্য। মানসিক বিকলতাসর্বস্ব ও একদেশদর্শী– তাই, প্রশাসনে অতটা ভালো নন, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা আছে। প্রতিষ্ঠানে তাঁর কিছু অকথিত সুপ্ত এজেন্ডা আছে। এসব কর্মপথে কেউ বাধা হলেই তাকে সরতে হবে। তার পেছনে

উঠে-পড়ে লাগবেন। তিনি একজনের কান-কথা বিশ্বাস করেন না– প্রয়োজনে দু-জন লাগে। একটা কুচক্রীমহল তাকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দেখায়, কখনো দুর্নীতি করে। তাদের দুর্নীতির পথে বাধা, এমন কাউকে শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না, উৎপাত করে, সরিয়ে দিতে কাঠ-খড়ি পোড়ায়। অফিসে এই তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব। ক্ষমতাধর শিক্ষক এদের আসল রূপ বোঝেন না, স্বরূপ চেনেন না। এদেরকে ভালো বলে জানেন। আকাশের তারকার মতো তাদের সবকিছুকে বিশ্বাস করেন। কুচক্রীমহলের চারজন, অন্য সবাই অফিস থেকে চলে যাবার পর সন্ধ্যায় সমালোচনার আসর বসায়। তারা চারজন ঐ সৎ শিক্ষককে কোনো একটা মিথ্যা জিনিসও বিশ্বাস করাতে চাইলে সবাই একসাথে নামেন। দলবদ্ধ হয়ে ঐ শিক্ষকের কাছে যায় না। জায়গামতো বলে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাতে অন্যের ক্ষতি হয়। প্রথম দিন একজন গিয়ে কথায় কথায় প্রসঙ্গটা উঠিয়ে মিথ্যা তথ্যটা দেয়। দু-পাঁচ দিন কেটে যায়। অন্য আরেকজন আবার গিয়ে অন্য প্রসঙ্গচ্ছলে এ বিষয়টা উঠিয়ে একই কথা বলে এবং তথ্যটা ভালো করে বোঝায়। শিক্ষক ভাবেন নিশ্চয়ই কথাটা সত্য। দু-জনই তো একই রকম বললো। পরের দু-জন একইভাবে সময় সুযোগ বুঝে একই কথার পক্ষে বলে। উনি ঘটনাটাকে এবার 'ঘটমান বর্তমান কাল' হিসেবে গণ্য করেন এবং বিষয়টা একশভাগ সত্য হিসেবে ধরে নেন। এ অবস্থান থেকে তাকে কখনো আর সরানো যায় না। মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাতে অন্যের ক্ষতি হয়। মাঝখান থেকে কুচক্রীমহল জিতে যায়। এতে অন্যের প্রতি অনর্থক অবিচার করা হয়। ভুক্তভোগীর কর্মজীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এখানে কুটিল বাঙালির একটা কৌশলের কথা আলোচনা করলাম। এমন শত কূটকৌশলের ফাঁদে পড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। এভাবে প্রশাসন, পার্শ্ব-প্রশাসন কুমন্ত্রনাদাতাদের মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। নিজেদেরকে সর্বজান্তা, 'প্যানাসিয়া' ও মহাজ্ঞানী বলে মনে-মনে আত্মশ্লাঘায় ভোগেন এবং 'কনসালটেটিভ-ডিরেকশন' এড়িয়ে চলেন; আবার, অসীম ক্ষমতাবলে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিটাকেও হিপনোটাইজড করে ফেলেন। হঠাৎ করে একা একা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সত্য-মিথ্যা না বুঝে একজনের কথার উপর ভিত্তি করে বিপরীত ভাবেন। একটা মিথ্যা, কাল্পনিক আবহের মধ্যে ঘোরাফেরা

করেন। এজন্য ঠগবাজ ও শঠ ব্যক্তির কথাবার্তা-কুযুক্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখা খুব জরুরি। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা তা করেন না এবং মানুষ চিনতে প্রায়ই ভুল করেন। মতলববাজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে যান। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রশাসনের সরলতার কারণেই এটা অনেক ক্ষেত্রে হয়; মনোবিজ্ঞান অন্তত তাই-ই বলে। একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, 'তেত্রিশ বছর ধরে মাখছি, মাথা ঠান্ডা রেখে আজো কাজ করছি।' এগুলো প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ নিয়েই আমাদের জীবন। অথচ আমাদের চিন্তাধারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছুটা পরিবর্তন করলেই অনেক শান্তিতে আমরা কাজ করতে পারতাম। প্রতিষ্ঠান এবং দেশের উন্নতি হতো।

কান-কথা ও তোষামোদকারীর এ-শক্তি তো শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়; রাজনীতিতেও ছড়িয়ে গেছে। বরং বলা যায় এ-রোগ রাজনীতি থেকেই প্রতিষ্ঠানে সংক্রমিত হয়েছে। রাজনীতির পিচ্ছিল পথে তো অনেকে আছাড় খেয়ে 'কিছু হয়নি' বলে আবার উঠে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার অভিলাষে ফের কর্তাভজা শুরু করে দেন; হয়তো কখনো ভবিষ্যতে আবার স্থান করে নেওয়ার জন্য। এ নিয়েই তো আমাদের সার্বিক জীবনাচার ও কর্ম। তবে নীতিহীনতা ও ল্যাং মারামারি সংস্কৃতির প্রাধান্যের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ও সার্বজনীন জীবনযাপনে প্রদাহ; প্রাণধারণ প্রক্রিয়া এদেশে বড্ড কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয়, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও রাহাজানির কারণেই পুরো দেশের প্রশাসনিক কাঠামো বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং রাজনৈতিক বিপর্যয় রোধ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতিনিষ্ঠতা ও সুষ্ঠু বিকাশ অবান্তর ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কম-বেশি সবাই অবগত। সেখানে রাজনৈতিক বিচারে প্রশাসন পরিচালনা, রাজনৈতিক ও টাকার মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তার ছাত্রসংগঠনের অরাজক কর্মকাণ্ড অবশ্যই জঘন্য প্রক্রিয়া। তাছাড়া সমস্ত কর্মকাণ্ডে দলবাজির প্রাধান্য এবং রংবাজ শিক্ষকদের সাদা-নীল রঙে মাখামাখি শিক্ষার পরিবেশকে আরও বিষিয়ে তুলেছে। অধিকাংশ তথ্যই দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানা ও কিছু-কিছু নিজ চোখে দেখা। যদিও

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো অসংখ্য শিক্ষক আছেন, তারা সুশিক্ষিত, রংটাকে জীবনে প্রাধান্য দেন না, সাদা-নীল রং মাখতেও নারাজ; কিন্তু বিধি বাম। রং না মাখলে যে প্রজেক্ট পাওয়া যায় না, লোভনীয় পদে ইচ্ছামত যাওয়া যায় না, প্রমোশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উভয় তালিকা থেকেই বাদ পড়ে যেতে হয়– শেষে জীবনের গ্লানি প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, তাই। তবে এ কথা সত্য যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তারা বুঝে-সুজেই ভর্তি হয়। শিক্ষক ক্লাস নিক বা না-নিক, ছাত্রের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। অনেক শিক্ষক সে সুযোগটা গ্রহণ করেন। আবার নিজ নৈতিকতা ও স্বচ্ছতায় যাঁরা অটল তাঁরা এসব অন্যায় সুযোগ-সুবিধা এড়িয়ে নিজ বলয়ের মধ্যে থাকেন। নিজ দায়িত্বের অংশ মনে করে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করেন। এ-জাতীয় শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ কমতির দিকে। ছাত্রছাত্রীদের নিজ প্রচেষ্টায় শিখতে হয়। প্রয়োজনে শিক্ষকদের পিছ-পিছ ঘুরে সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। সুনজরে থাকতে হয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সীমাবদ্ধতার কারণে নব্বইয়ের দশকে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্য ভারতমুখী হয়ে উঠেছিল। সেখানে পড়াশোনার মান বজায় রাখে। দশ-বারো বছর ধরে সে ধারা চলতে থাকে। এদেশে যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার মান যথানিম্ন এবং মধ্যম মানের ও নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা কোথাও সুব্যবস্থা না করতে পেরে ভারতে যাবার হুজুগে মেতেছিল; সেখানে গিয়ে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করেছিল। তবু নিখাদ সুফল ঘরে তুলতে পারেনি। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী বেলেল্লাপনা ও অকাম-কুকামে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার মানে পেরে ওঠে না, বার বার ফেল করে; বাপ-মাও আর টাকা দিতে চায় না। শেষে কম্পিউটারের প্রিন্টার থেকে ভালো মানের কাগজে সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নিয়ে দেশে ফেরে। অধিকাংশেরই একই দশা। যেখানে তার ফেল করার কথা, সার্টিফিকেট ছাপিয়েছে 'প্রথম শ্রেণি'। স্বপ্নেই যদি খাবো, তো আলুভর্তা-ডালভাত কেন! খাবো পোলাও বিরিয়ানি, খাবো রাবড়ি-পায়েস-কোর্মা কিংবা রাজভোগ। কেউবা 'প্রথম শ্রেণিতে প্রথম বা দ্বিতীয়'। দেখা গেল 'নামে তালপুকুর ঘাটে ঘটি ডোবে না'। থোড়া থোড়া হিন্দি বলতে পারে, বিদ্যার বেলায় ঠন-ঠনা-ঠন। সেখানকার প্রশাসনও বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠলো।

ভালো ছাত্রছাত্রী যে সেখানে যায়নি, কিংবা পরিশ্রম করে বৈধ সার্টিফিকেট পায়নি– তা নয়। সংখ্যা কম। তারাও একচোখা প্রশাসকের বিরাগভাজন হলো।

এ সময়ে তৎকালীন সরকার এ-দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলো। বাজারও ভালো পাওয়া গেল। অগতির গতি হলো। বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হলো, চাকরির সুযোগ বাড়লো; কিন্তু গোল বাধলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্ধারণে ও নিয়ন্ত্রণে। দুটোই অনিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ঘরে পোষা আপন 'খালু বেজার' হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার এ অধোগতি। আবার দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার বেহাল দশা; উচ্চশিক্ষা হঠাৎ করে ভালো আসবে কোন নিয়মে? খেলা শুরু হয়ে গেল, শিক্ষা নিয়ে খেলা। উচ্চ-ক্লাসের সার্টিফিকেটের অভাব নেই। 'ধন-ধান্য পুষ্প ভরা' হয়ে গেল। 'ভালুকের হাতে খোন্তা' চলে এলো।

যদিও বিশ্বের সব নামি-দামি-মানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এদেশে হাতের আঙ্গুল গুনে দু-এক গণ্ডার বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবেন না, যেখানে শিক্ষার মধ্যম মান বজায় রাখছে। অন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বিত্তবান-স্বার্থত্যাগী মানুষের চেষ্টায় শিক্ষাসেবা ও জনকল্যাণকর কাজ হিসেবে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক ধামাধরাদের মনোরঞ্জনে, বা টাকা কামানোর সমকালীন উপাদেয়-ব্যবসা হিসাবে। মানসম্মত সার্ভিস দেবো না, অথচ টাকাটা ধরবো– এই প্রত্যয়ে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নেয়ার মতো বেসিক যোগ্যতাই নেই, অথচ উচ্চ-শিক্ষার সার্টিফিকেট চাই-ই এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন-মানসিকতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী নামধারী 'আলালের ঘরের দুলাল-দুলালী'র বিচরণক্ষেত্র অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। জন্মিয়েছে কুঁজো হয়ে, কুঞ্চিত মনমানসিকতাতে– চাই চিত হয়ে শুতে। এতে শিক্ষার মান মাঠে মারা পড়ে যাচ্ছে। ভালো ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়ছে। ক্লাসে গিয়েও শিক্ষকরা বিপদে পড়ছেন। কিছু ভালো– অধিকাংশ অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করাতে গিয়ে শিক্ষকরাও বিপাকে পড়ছেন। ছাত্রছাত্রী বেশি ফেল করলে কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষকদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে। অমনোযোগী শিক্ষার্থীর দায়-দায়িত্ব

শিক্ষকদের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছি। মানসম্মত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। ফলে, 'মুনা যায় উজান, তো ধুনা যায় ভাটি' টানাপোড়েন চলছে। সত্য বলতে কি, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রশাসনের নীরব সম্মতিতেই– সেই কলেজের মতো হাতে গুনে কয়েকটা প্রশ্নোত্তরের হ্যান্ডনোট-গাইডভিত্তিক শিক্ষাতে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে গবেষণাসমৃদ্ধ, ব্যাপক তত্ত্ব ও বাস্তব ট্রেইনিং প্রক্রিয়া তা ভুলে গেছে। এতে কিছু-কিছু ডিগ্রির সার্টিফিকেট সবার হাতে-হাতে হয়ে গেছে। ফলে শুধু ডিগ্রির নাম শুনলেই সচেতনমহল আর সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামটাও শুনতে চাচ্ছেন। কিন্তু এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী যেহেতু শিক্ষা-সচেতন নয়; তারা 'কানা ছেলেকে পদ্মলোচন' বলে বিভ্রম বা ধন্ধে পড়েছে। ছেলেমেয়ের বিয়ের আয়োজনে পাত্র-পাত্রীর দাম বাড়ছে, সাথী জোগাড় সহজ হচ্ছে। অনেক ধনীর শ্বেত-হস্তির অগতির গতি হচ্ছে। প্রক্রিয়াটা নেহায়েত খারাপ বলা যায় না। নয়তো অন্য দেশে সার্টিফিকেট কিনতে যেতে হতো। এতে দেশীয় মুদ্রা অন্তত সাশ্রয় হচ্ছে। আমি কিন্তু এতে খুশি এই কারণে যে, কানা-ছেলের দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও লোচনটা কিংবা অক্ষিপটল তো পদ্মের মতো হতেই পারে– সেটাই বা কম কীসের! জাতির যা হয় ভবিষ্যতে হবে, এখন তো আপাতত ক্ষতের উপর মলমের প্রলেপ দিয়ে চামড়া-সদৃশ পাতলা বহিরাবরণের নিচোলবাস পরানো গেছে। এতেই শান্তি, ওম (সংস্কৃতঃ অ+উ+ম, অ= বিষ্ণু, উ= শিব, ম= ব্রহ্মা; তিন সাংকেতিক অক্ষরের সমাহার) শান্তি। 'জগতের সকল প্রাণি সুখী হোক!'

সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকতা পেশারও আওতা বেড়েছে। এ নিয়ে আমারও অনেক কথা আছে। ভুঁইফোড় বিশ্ববিদ্যালয়ও যেমন গজিয়েছে, সে সাথে ভুঁইফোড় শিক্ষক নামধারী ব্যবসায়ীও গজিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, কিছু শিক্ষক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অথবা আদম ব্যাপারির ব্যবসাতে কাজ করার জন্য উপযুক্ত, চলে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবস্থা যা হবার তাই হচ্ছে। এদের মধ্যে শিক্ষকতা পেশার ব্রত নেই, দেশীয় মূল্যবোধ নেই, পেশাগত সততা নেই। ভালো

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে, ভালো ভালো কথা গুছিয়ে বলতে শিখেছে। এরা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, শিক্ষক হতে হলে শুধু ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাঠ শেখালেই হয় না; তাঁদের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা চাই। লেখাপড়া জানার পাশাপাশি সুস্থ ও স্বচ্ছ অনুসরণীয়-অনুকরণীয় মন-মানসিকতা থাকা চাই। শিক্ষকতা পেশার মানসিকতা থাকা চাই। তাঁদের চলন-বলন, চিন্তা-চেতনা শিক্ষাচারের বাইরে। ব্যবসায়ী ও দায়সারাগোছের চিন্তাধারা। ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজের জন্য অফিস ছাড়তে পারলেই যেন বেঁচে যান! রুজি-রোজগারটা বৈধ হলো কি না সে আত্মজিজ্ঞাসাও নেই। আবার কিছু কিছু শিক্ষক সত্যি সত্যিই ব্যবসা খুলে বসে আছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুল-টাইমার হিসাবে নাম লিখিয়ে রাখলেও ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ছাত্রছাত্রীদের জন্য মন খুলে সময় দেন না। 'মন হইয়াছে উড়া পাখি গৃহেতে আর রবো না রবো না' অবস্থা সব সময় মনে মনে। এভাবে শিক্ষাদান চলে না। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যভাবে বললে, জাত শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এ জন্য শিক্ষাঙ্গন আর শিক্ষাঙ্গন থাকছে না। ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেধার বিকাশ ঘটছে না। এ-মনোভাবাপন্ন শিক্ষকেরা ২৫/৩০ বছর শিক্ষাঙ্গনে চাকরি করলে শিক্ষাঙ্গনের বারোটা বেজে যাবে; ছাত্রছাত্রীদের কী হবে তা সহজেই বোধগম্য। অর্থাৎ সব পেশাকেই আমরা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এভাবে শিক্ষাব্যবসা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাকে বলবো? গমও উদা, যাঁতাও ঢিলা।

'অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার' বিষয়ে দেখেছি, এক ধরনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন 'সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার'-এর। তাঁরা প্রতিষ্ঠানের কাজের ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে চিন্তার প্রতি স্বেচ্ছা কমিটেড। তাঁরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ হিসেবে গণ্য করেন। দায়িত্ববোধে সচেতন এবং কর্মঠ। বিপরীত পক্ষে, আরেক ধরনের কর্ম-আচরণ আছে 'উইথড্রয়াল বিহেভিয়ার'। এরা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেকে উইথড্র করে রাখেন। ব্যক্তিগত

কাজ ও ধ্যান-ধারণা নিয়েই সময় পার করেন। সুযোগ পেলেই বুলি ছাড়েন, 'গুল্লি মারেন অফিসের এসব কাজ।' অফিসের কাজকে তাঁরা কাজ মনে করেন না। এঁদের কর্মে অমনোযোগিতা, দেরি করা, অনুপস্থিতি ও ফাঁকি ইত্যাদি নিয়মিত ঘটনা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে উভয় মনোভাবেরই শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। এদের ধরন-ধারণটা পুস্তকস্থ তত্ত্বকথা থেকে আরেকটু ভিন্ন। বিহেভিয়ারের সাথে পারিপার্শ্বিকতা যোগ হয়েছে। 'বিহেভিয়ারিজম' তত্ত্ব থেকে আলাদা, বলা যায় 'বাঙালি বিহেভিয়ারিজম'। এদেশে বেশ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। তাঁরা বড় কর্তার সামনে এক ধরনের বিহেভিয়ার দেখান, অগোচরে ভিন্ন। কর্তার সামনে পুরো সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার দেখাতে অভ্যস্ত,– কর্তাপূজা করেন, তোষামোদ করেন, পরনিন্দা করেন, সব কাজ তাঁরা করেন– তা বলেন, ফাঁক-ফোকর খোঁজেন, কর্তার কান ভারী করেন, আর্থিক ও পদের ফায়দা লোটেন ইত্যাদি। সুযোগমতো মহাকর্তার সাথে দহরম-মহরম আছে বলে দাবি করেন। প্রতিটা বড় বড় গ্রুপ কিংবা যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানেই এদের সরব উপস্থিতি সবার নজর কাড়ে। এ-দেশে কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ করাও ঝকমারি।

কিছু বলারও নেই– বলতে গেলেই হেই-হেই করে তেড়ে আসেন এবং তার কূলের রাজনীতির পরিচয় দিয়ে গালি দিতে থাকেন। সেজন্য নীরব দর্শক হওয়াই ভালো। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ তো করতেই হয়; তাই সরব হতে গিয়ে যত অভাজন বনে যাওয়া। মূলত এ সমাজে প্রতিটা ক্ষেত্রেই ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড হওয়াতে মানুষের মধ্যে, পেশার মধ্যে, ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে এত সংঘাত, এত বিদ্বেষ, এত পেরেশানি। এসব মিলেই এই নরকবাস। কথায় কথায় শুধু কবিতা মনে হয়। সবাই আমরা ছোটবেলায় পড়েছি:

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।'

আমরা নরকানলে রাতদিন দগ্ধ হচ্ছি। এ নিয়েই হাসছি, কাঁদছি ও কর্ম করে খাচ্ছি। একটা বাসের পিছনে লেখা পড়েছিলাম, 'পরিবহণ লাইনে শান্তি নাইরে বাজান!' একটু আগেই টিভির খবরে অসংখ্য মানুষের আহাজারি চোখে দেখে এলাম। আমারও এ-সব আহাজারি প্রতিনিয়ত দেখে দেখে বলতে ইচ্ছে করে, 'এ ভূখণ্ডে শান্তি নাইরে বাজান!' প্রতিটি পদে পদে দেখছি, ভুগছি। বলতে গেলেই যত জ্বালা। যে মানুষ নিয়ে দেশ ও সমাজ, সেই মানুষেরই যদি মনুষ্যত্ব না থাকে, বিবেকবোধ না থাকে, বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন হয়, চালবাজ হয়, কপট হয়; সে-দেশ ও সমাজ নরকের তুলনায় উৎকৃষ্ট স্থান হয় কীভাবে? শ্রদ্ধেয় কবি এসব সত্য কথা লিখে মারা গেলেন কেন? বাস্তবে ভুগতে হতো; তখনই এ মাতৃভূমিতে 'নরক' শব্দের মর্মোদ্ধার তিলে তিলে করতে পারতেন। জানি না, কবি এ বিষয় নিয়ে আরও কবিতা লিখে নিরুদ্দেশ হতেন কি-না!

সাত

শিক্ষকতা ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে অন্য অধ্যায়ে কিছু কথা লিখেছি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি আমার মোটামুটি জানা। মান বিচারে অন্যান্য দেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির তুলনায় তা কোনো অংশে কম নয়। তবে শেখার গভীরতা এবং শেখানো নিয়ে প্রশ্ন। এদেশের স্কুল ও কলেজ-শিক্ষার সিলেবাসও আমি পড়েছি। ভালোই বলা যায়। তবে শিক্ষা-দীক্ষার বুনিয়াদ যেহেতু আধাখেঁচড়া বা অপুষ্ট, ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া আত্মস্থ করতে অমনোযোগী, অনেকে চেষ্টা করেও পারে না। ভালো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তারা ভালো কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ে। বাকিদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা খারাপ। এদের সংখ্যাই বেশি। এদেরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন বিভাগে কিছু কোর্স, বিভাগের মূল কোর্সে যাবার আগেই শেখা বাধ্যতামূলক করা দরকার। আবার এসব কোর্সে এইচএসসি পর্যায়ে ভালো ফলাফল করে থাকলে কোর্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। পরবর্তী শিক্ষায় ভালো করতে হলে, এমনকি লেখাপড়া বুঝতে হলে এসব কোর্স শেখার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অঙ্ক এদের মধ্যে একটা। বর্তমানে ব্যবসাবিজ্ঞানের অনেক কোর্সই অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এমনকি আন্ডারগ্রাজুয়েট সমাপ্ত করতে হলে কমপক্ষে চল্লিশটা কোর্সের মধ্যে বারো-তেরোটা কোর্স অঙ্ক পড়তেই হয়। বিষয়ভেদে অঙ্ক-কোর্সের সংখ্যা বিশ-বাইশটাও হবে। অথচ ব্যবসাবিজ্ঞানে আসা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অঙ্কে কাঁচা এবং অংকভীতি আছে। এরা অঙ্কের সাধারণ ভিতও মজবুত নয় বলে শুধু মুখস্থের উপর ভর করে সামনে এগোতে চায়। ফলে ফলাফল কখনো ভালো করতে পারে না। কেউবা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ে যেতে অঙ্কের বুনিয়াদ মজবুত হওয়া জরুরি। যদি কারো অঙ্কের ভিত দুর্বল হয়, মূল বিষয়ে যাবার আগে ভালোভাবে অঙ্ক শিখে নিতে হবে। নইলে ফলাফলের উপর প্রভাব পড়তে

বাধ্য। এর পরেই আসে ভাষাজ্ঞান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে না যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তার থেকে খোদ বাঙালি তার নিজ হাতে ও কথায় বাংলাভাষাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এখনও করে চলেছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কমপক্ষে বারোটা বছর বাংলাভাষায় লেখাপড়া করলেও বাংলাভাষা জ্ঞান অতি সামান্য। এক পৃষ্ঠা লিখতে বলতে কমপক্ষে এক-ডজন ভুল করে। বাংলায় কথা বলার ভাষা তো বাদই দিলাম। বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে-সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ কথা বলতে আসেন, তাঁদের উচ্চারণ শুনলে বমি-বমি ভাব চলে আসে। খুব কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং ভদ্রলোক তাঁর বিকৃত আঞ্চলিক ভাষার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। এটা জাতির জন্য যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা বর্ণনাতীত। অক্ষরগুলোর উচ্চারণেও বেসামাল অবস্থা। ‘র’ এবং ‘ড়’-এর উচ্চারণ এক করে ফেলেছি। দুটোকেই ‘র’ উচ্চারণ করছি। কোনোটাকে ‘ব’-এ শূন্য দিয়ে, আবার কোনোটাকে ‘ড’-এ শূন্য ‘র’ দিয়ে জীবন পার করে দিচ্ছি। অনেক জায়গায় গিয়ে ছোট ‘গ’, বড় ‘গ’ (মূলত ‘ঘ’), ছোট ‘দ’, বড় ‘দ’; ছোট ‘ব’, বড় ‘ব’-ও শুনেছি। যা হোক, জীবন পার হলেই হলো। তবে একজন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে মাতৃভাষা ভালোভাবে বলতে পারে না, লিখতে পারে না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জোরেশোরে পালন করতে মহাব্যস্ততা দেখি। এগুলো আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বাংলাভাষাটা অন্তত ‘চলনসই’ শেখার উপর জোর দিচ্ছি।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ভাষার অবস্থান অনস্বীকার্য। উচ্চশিক্ষায় লেখা, পড়া, শোনা, বোঝা সবকিছুই ইংরেজিতে করা হয়। সেজন্য যে ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে বেশি পারদর্শী, সে নিজেকে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারে বলে পরীক্ষায় ফলাফলও ভালো করে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার সমস্ত বই ইংরেজিতে পড়তে হয়। সেজন্য ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হয়। ইংরেজি ছাড়া ব্যবসাবিজ্ঞান পড়া তো অসম্ভব। ব্যবসায়ের ভাষাটাই ইংরেজি। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর-পর ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য

একটা পরীক্ষা নেওয়া দরকার। যারা এ পরীক্ষায় নিজেদের উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারবে, তাদের বাধ্যতামূলক ইংরেজি শিক্ষা কোর্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। প্রাইমারি স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এরা ইংরেজি শিখেছে। এরপরও ইংরেজির অবস্থা দেখলে খারাপ লাগে। আমি স্কুলের সিলেবাস পুরোটাই দেখেছি। ইংরেজি শেখার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তা-ও শিখছে না কেন? আমি নিশ্চিত যে, ইংরেজির শিক্ষক ও শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে গলদ আছে। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই ইংরেজির উপর কম গুরুত্ব দেয়। শিক্ষকরাও সেটাতে সায় দেন। অথচ বাস্তবতা বুঝতে চান না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়েই কমপক্ষে দুটো কোর্স 'ইনটেনসিভ ইংলিশ' নামে দেওয়া প্রয়োজন। পাস করার জন্য নয়; বরং শেখার জন্য। ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চশিক্ষা নিতে আসে, তারা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন শ্রেণি এবং বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে। জীবনের উদ্দেশ্য কী, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য কী– জিজ্ঞেস করলে বলে তারা জানে না। জীবনের জন্য, জীবন গড়ার জন্য করণীয় সম্বন্ধেও কিছুই বোঝে না। বাস্তব জ্ঞানের খুবই অভাব, আবেগতাড়িত হয়ে চলে। অথচ এ সময়ের একটা ছোট ভুলও ভবিষ্যতের অনেক বড় সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। অনেকে আছে ফেসবুক ভালো চালাতে পারে, থুথু ফেলতে জানে না; ড্রাগ এবিউজ বোঝে না; কথা বলার লৌকিকতা বোঝে না; ওয়াশরুম ব্যবহার করতে জানে না, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বোঝে না; পরিবার ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব কতটুকু তা বোঝে না, সময়জ্ঞানের অভাব; সততা কাকে বলে মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু গুণগুলো জীবনে প্রতিফলিত করতে জানে না।

আমি আগে হয়তো কোথাও লিখেছি, শিক্ষা প্রত্যেকের নিজের জন্য, শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য, পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনের জন্য, পরিশীলিত বিবেকের জন্য, সচেতনতার জন্য, মানুষের মতো মানুষ হবার জন্য। এই মুহূর্তে ভাবছি, আজ

রাতে খাবার টেবিলে বসে ছেলেমেয়েদেরকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেবো। প্রথমত, ওদের এ-সময়ে কী কী করণীয়, করণীয় নয়, তার একটা তালিকা প্রত্যেকে নিজের মতো করে তৈরি করবে– আমি তা দেখতে চাই, নিজের তৈরিকৃত তালিকা কে কতটুকু অনুসরণ করছে বা করবে সেটা আমি নিজে দেখবো। তালিকা আমার কাছে জমা থাকবে। ইন্টারনেট ঘেটে কোন কোন খাবার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, আবার কোনটা ভালো নয়– তাও আমাকে লিখে জানাবে। তারপর, কীভাবে এগুলো মেনে চলতে পারবে– তা প্রত্যেকে লিখবে। অমি তো প্রতিদিন তাদের তৈরিকৃত খাবার দেখবো, ফলে কতটুকু তারা মেনে চলছে তাও দেখতে পারবো এবং বলতে পারবো। বড় মেয়েকে একটা সারকথা তৈরি করে আমাদের সবার সামনে উপস্থাপনের জন্য বলবো। তাদের অনেক কাজ, অনেক কথা, অনেক খাবার আমার পছন্দ নয়। এজন্য এটা আমি আজই করবো। আমার অবর্তমানে তারা যেন সুন্দরভাবে টিকে থাকতে পারে সেজন্যই আমার এ প্রচেষ্টা– জানি না, কতটুকু সফলকাম হবো।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই যদি প্রতি সেমিস্টারে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে তার জীবনের করণীয়, পছন্দনীয়, করণীয়-না, এসব বিষয়ের একটা তালিকা নিজের মতো করে লিখিয়ে নেওয়া হয় এবং যে যে অভ্যাসের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, জীবন থেকে পিছিয়ে গেছে, তা নিজে পেশ করে; আবার সংশোধনের উপায়গুলোও তার দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়, তবে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। সংশোধন হবার সুযোগও তার থাকে। কেউ তো তার উপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না– সেজন্য প্রয়োজনমতো তার অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক সহযোগিতা করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা নিজের তৈরি নিয়মকানুন মানলো কি মানলো না, তার অভিভাবকমহলকেও এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে বলা যায়। আমার বিশ্বাস, এভাবে তাদের জীবনের ভালো ভালো দিকগুলো সামনে নিয়ে আসা যায়, অন্যকে এসব বিষয়ে উৎসাহিত করা যায় এবং সর্বোপরি তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা যায়। ঐ বয়সের ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতাহীন

কাদার পুতুল হিসেবে গণ্য করাই ভালো। কাদা দিয়ে আমরা যা গড়বো, সে-রূপই ওরা ভবিষ্যতে ধারণ করবে; যদিও ওরা বাস্তবে খারাপ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার শিকার। ওদের সামনে বর্তমান সমাজের ভালো-খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা যায়; খারাপ কাজের পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করা যায়; অভিভাবককে বলে ফলো-আপ করানো যায়, এমনই অনেক ভালো কিছুই করা সম্ভব– প্রয়োজন সদিচ্ছার। এদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও কাজগুলো করা জরুরি।

উপরে বলা অনেক টপিক মিলিয়ে এবং আরো নতুন কিছু টপিকের সম্মিলনে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা নতুন কোর্স চালু করেছে– প্রাকটিক্যাল ট্রেইনিংয়ের মতো করে। নাম দিয়েছে, 'লাইফ স্কিলস্ ফর সাকসেস।' প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য এ কোর্সটা শুরুতেই বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। আমি প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-রকম কোর্স এবং এছাড়া আরো দু-তিনটা জীবনমুখী কোর্স প্রতিটা বিভাগের জন্য চালু করার প্রস্তাব দিতে পারি। এই মুহূর্তে একটার নাম মনে আসছে, সেটার নাম এমনটা হতে পারে, 'এমপ্লইবিলিটি ফর ম্যানেজারিয়াল অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউর্যাল সাকসেস'। এমন-সব দু-তিনটা কোর্সের নাম ও পাঠ্যসূচি সবার জন্য সাধারণ শিক্ষার নামে দেওয়া যেতে পারে, যার মাধ্যমে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা জীবনের বাস্তবতায় পৌঁছাতে পারবে। আরেকটা বিষয় লেখাপড়ার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি। বিষয়টা হলো 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোল্যাবরেটিভ লার্নিং'য়ের ব্যবস্থা। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় ক্লাসরুমের বাইরেও বাস্তবে গিয়ে হাতেকলমে শিখবে, ওয়ার্কশপ করবে, রিপোর্ট লিখবে ইত্যাদি। ইচ্ছে করলেই এটা করা সম্ভব। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক প্রফেশনালসকে ক্লাসে এনে ক্লাসরুম সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রেজেন্টেশন করালে ছাত্রছাত্রীরা অনেকভাবে উপকৃত হয়। বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।

মানুষ যন্ত্র নয়– তার বোধশক্তি আছে, সামাজিকতা আছে, সুখ-দুঃখ আছে, অনুভূতি আছে। তাকে শিক্ষা দিলে শিক্ষা নেয়। শতভাগ ক্ষেত্রে কৃতকার্য না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা আসে। আমরা দেশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা নষ্ট করেই-না মানুষকে অমানুষ ও নষ্ট চরিত্রে পরিণত করছি। তাকে উপরোক্ত কিছু কোর্স করালে এবং সুশিক্ষা দিলে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হতে পারে। সমাজ উন্নয়নে ভালোভাবে অবদান রাখতে পারে। জীবনকে চিনতে পারে। তবে এসব বিষয়ে মুখস্থ না-করিয়ে রিগারাস ট্রেইনিং আকারে করলে তা মজ্জাগত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়। অনেক ডকুমেন্টারি ভিডিও আছে, মোটিভেশন করা এবং মানুষের মধ্যে পজিটিভ 'পরিবতর্ন' আনার জন্য যথেষ্ট। বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ভিডিওর মাধ্যমে শেখালে অনেক নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীকেও গড়ে তোলা যায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও খবু আনন্দের সাথে কোর্সগুলো করে। দেশ নষ্ট হয়ে গেছে বলে বসে থাকার সময় নেই। তাবৎ শিক্ষক-সমাজ তো আর নষ্ট হয়ে যায়নি! কাউকে ভালোভাবে গড়ে তোলার মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে, এটা পেতে হবে। ভবিষ্যৎ শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে, জাতিকে গড়তে শিক্ষকদেরকে ছাত্রছাত্রীদের গড়ার মাধ্যমে এবং কলমের ব্যবহার করে এগিয়ে আসা উচিত। কোনো পদ্ধতি ও ব্যবস্থার দোষ ও ভুলত্রুটি নিশ্চয়ই ধরবো; নইলে সংশোধনের সুযোগ আর থাকে না। তবে তা কোনো লাভজনক পদে যাওয়া বা দলবাজি করা, কিংবা কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে করাটাই উত্তম।

কম্পিউটারের মূল বিষয় ছাড়াও ব্যবসা-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রায়োগিক দিক লক্ষ রেখে প্রতিটা বিষয়ের জন্য কমপক্ষে তিন-চারটি কম্পিউটার এপ্লিকেশন কোর্স বাধ্যতামূলক করা যায়। কম্পিউটারবিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার তৈরিতে দক্ষ হবে; কিন্তু অন্যান্য ডিসিপ্লিনেও কম্পিউটারের সম্যক ব্যবহার ছাড়া পুরো ব্যবহারজগৎ অচল। এজন্য কম্পিউটারের ব্যবহারিক দিক প্রতিটা কর্মক্ষেত্রের জন্য জরুরি। এ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা বাজারের ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। আমাদের

দেশে সব-ক্ষেত্রেই কাজির হিসাব খাতায় থাকে, গোয়ালে থাকে না। এজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেবাসে আছে, অথচ বাস্তবে নামকা ওয়াস্তে শিখিয়ে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিলে ঐ ছাত্রছাত্রীকে আজীবন লেখাপড়া নিয়ে ভুগতে হয়। এ কারণে অন্তত উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকমহলকে সাথে নিয়ে প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপ প্রয়োগ করে হলেও শেখানোর আমি পক্ষপাতী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া শেখার জন্য চাপ নেওয়ার বয়স ছাত্রছাত্রীদের হয়েছে। এতে দ্বিধান্বিত হবার কিছু নেই। না-শেখার যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে চালু হয়েছে, সেখান থেকে শিক্ষকসমাজ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকমহলকে অব্যশই বেরিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পজিটিভ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এর সাথে বড় হবার সদিচ্ছা এবং লেখাপড়ার জন্য সময় দিলে ভবিষ্যতে বড় মাপের একজন মানুষ সে হবেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রছাত্রীরা অন্তত বেকারত্বের হাত থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে। বিদেশে গেলেও উটের রাখাল না-হয়ে নিদেনপক্ষে একটা 'হোয়াইট কলার' চাকরি পাবে। উন্নত জীবনযাপন সম্ভব হবে।

এই বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিতে আমার এক ছাত্রের সিভি পাঠিয়ে এক কোম্পানিতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ছাত্রের মানও ভালো না, আবার টেকনিক্যালিও সাউন্ড নয়। ছাত্রটা দরিদ্র ঘরের ছেলে, চাকরি একটা দরকার। কোম্পানির বড়কর্তা বললেন, 'স্যার, ওর জন্য চাকরির তদবির করবেন না। প্রয়োজনে একবারে কিছু থোক টাকা সাহায্য করতে পারি। কিছু ক্ষতি হলেও আমার ক্ষতিটা একবারই হবে। সেটা না-হয় আপনার জন্য করলাম। কিন্তু ওকে নিয়োগ দিলে আমার ব্যবসার অনেক ক্ষতি হবে। ও আমার ব্যবসাতে কোনো ভ্যালু অ্যাড করতে পারবে না।' কথাটা আমার বোধগম্য হলো। এটা কঠিন হলেও জীবনের বাস্তবতা। এ বোধটুকু সবার থাকা দরকার।

সময়ের সাথে সাথে সিলেবাসের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। তবে শিক্ষাপদ্ধতিতে বেশি পরিবর্তন সময়ের দাবি। চক-ডাস্টার, মুখস্থবিদ্যা, আর

অভারহেড প্রজেক্টর ছেড়ে পার্টিসিপেটিভ লার্নিং, বাস্তবমুখী শিক্ষা, 'আউটকাম বেইজড এজুকেইশন', 'কেইস স্টাডি বেইজড লার্নিং' 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোল্যাবরেটিভ লার্নিং'য়ের দিকে যেতে হবে। 'ইন্টিগ্রিটি' ক্লাসে বসিয়ে সাঁতার শেখানোর মতো না করিয়ে, জীবনের বাস্তবতা দিয়ে শেখাতে হবে। এছাড়া শিক্ষার মান বাড়ানো খুবই জরুরি। ছাত্রছাত্রীদেরকে বুঝতে হবে, যে লেখাপড়া একজন ড্রাইভারের তুলনায় বেশি বেতন নিশ্চিত করতে পারে না, তা না শেখাই ভালো। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরে মানসম্মত শিক্ষার জন্য আগ্রহী করে তুলতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের 'নেহি খায়েঙ্গা', 'নেহি খায়েঙ্গা' ভাবকে ক্রমশ দূর করতে হবে, শিক্ষার পিপাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। এর জন্য দেশে শিক্ষার সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে। ফেসবুকমুখিতা থেকে শিক্ষামুখী সংস্কৃতি গড়ে না তুলতে পারলে, পরিণতি যার-পর-নাই ভয়াবহ রূপ নেবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সময় অনেক আগেই চলে গেছে। শিক্ষাঙ্গনে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। এখুনি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বুঝতে হবে।

বিশ্বে অনেক দেশ আছে যারা শিল্পোন্নত নামে খ্যাত। এশিয়াতেও অনেক দেশ আছে এমন। চীন এ বিষয়ে সবাইকে তাক-লাগিয়ে দিয়েছে। ভারত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা থাকলে সফলতা একদিন আসে। বাংলাদেশও একদিন শিল্পোন্নত দেশ হতে পারে। এ-দেশ এখন থেকেই দক্ষ শিল্পোদোক্তা বা শিল্প/বাণিজ্য সংগঠক তৈরি শুরু করে দিতে পারে। ছাত্রজীবন থেকেই শিল্পোদোক্তা হবার মেন্টাল সেট-আপ থাকা দরকার। এজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত কোর্স, কখনো-বা স্পেশালাইজেশন গ্রুপ খোলা প্রয়োজন। ব্যবসায় বিভাগের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী এ-বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চা, হাতে কলমে শেখা, শিল্প-ব্যবস্থাপনা শেখা, নিয়ম-কানুন শেখা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিখতে পারে। গাইতে গাইতে গায়েন হয়ে যেতে পারে। অনেক শিল্পপতির ছেলে-মেয়ে এখানে ভর্তি হতে পারে। শিল্পোদোক্তাদের ব্যবহারিক ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

অনেক নতুন কিছু ভাবা যায়। প্রয়োজন ল্যাংমারামারি ও মিথ্যাচর্চার পরিবেশ বাদ দিয়ে সুস্থ চিন্তা করা। দলবাজি, ফেরেববাজি, ধাপ্পাবাজি, জহিরবাজি না করে সৃষ্টিপাগল লোকগুলোকে চিহ্নিত করা এবং কাজ করতে দেওয়া।

মানুষ সামাজিক জীব। প্রতিটা বিষয়েরই একটা সামাজিক প্রভাব থাকে। সুশিক্ষা আসে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, সামাজিক সংগঠন থেকে, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে। আমাদের যুবসমাজ সে-শিক্ষা থেকে পুরোটাই বঞ্চিত। আমার বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজনকে দেখেছি, তারা মেধা ও পারিবারিক পরিবেশ অনুযায়ী জীবনে বড় হবার কথা; কিন্তু টিভির ক্রিকেট খেলা দেখার নেশা দিনের-পর-দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেটাতে গিয়ে, কার্সর দিয়ে কম্পিউটারে বল মারতে গিয়ে, রাতের-পর-রাত ফেসবুকে ফেস দেখতে গিয়ে– জীবনের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গেছে। এ-কারণে কেউ কেরানি হতে পেরেছে; কেউবা তাও পারেনি। উঠন্ত মুলো পত্তনেই পোকায় খেয়েছে। অবশেষে মা-বাপের গলগ্রহ হয়েছে। গুরুজনদের অভিশাপের পাত্র হয়ে এখন অভিশপ্ত জীবনযাপন করছে। এভাবে কোনো জীবন চলতে পারে না। আমার প্রশ্ন, এর জন্য দায়ী কে?

এতক্ষণ ছাত্রছাত্রী, তাদের মনোভাব, শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কে কথা বলছিলাম। এর মধ্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদা না খাস্তা কোচিং সেন্টারের মতো। দু-চারটে একটু ভালো করলেও তা অতি নগণ্য। এদেশে কেউ ওষুধের ব্যবসা করেন, কেউ হাসপাতালের ব্যবসা করেন। কোলকাতায় গিয়ে ট্রেন থেকে নামতেই বাংলাদেশী রোগীদের ডাক্তার পাইয়ে দেওয়ার জন্য দালালদের টানাটানির ব্যবসা, এক দালাল আরেক দালালের কাছে রোগী বিক্রি করে দেবার ব্যবসা দেখেছি। আবার এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও কেউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা করছেন; কেউবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেনা-বেচার স্লো-মুভিং দালালি করছেন। কেউবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মিট পাইয়ে দেওয়ার

জন্য কোটি কোটি টাকার পদাধিকার দালালি ব্যবসা ধরেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষমতাধর রাজনীতির ব্যবসায়ী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মিট পাস করিয়ে রেখে ধনী খদ্দের খুঁজে অধিক লাভে বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আবার কোনো অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী জোগাড় করে দেওয়ার দালালি এজেন্ট-ব্যবসায় মত্ত। পুরো দেশটাই ধান্দাবাজি ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। তেলবাজি ব্যবসার তেলেসমাতি। শিক্ষা নিয়ে দালালি ও রাজনীতির ব্যবসাও বর্তমানে একটা পেশা– এটা আমাদের জীবনাচার ও কর্মের আওতার মধ্যেই পড়বে।

এদেশের সরকার ও মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দলবাজি ও তেলবাজি না করতে চায়; মানসম্মত শিক্ষা চায়– তবে দু-চারটে কথা বলার অবকাশ আছে।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপের। তার মধ্যে গণ্ডাখানেক ভালো চলছে। অনেকগুলোই নাই-ঝোল-নাই-চচ্চড়ি কিসিমের; কোনোটা-বা চলছেই না; কোনোটা আবার কালো তালিকাভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার কারণে শিক্ষার এ অধোগতি। একে রোধ করতে হলে সবকিছুর আগে দরকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা। প্রথমেই যা দরকার তা হলো একটা ‘তথ্য ও গবেষণা সেল’। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার নিয়ে এ-সেল গড়তে হবে। এরপর দরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যথাযথ সংশোধনী। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ এবং ‘সিন্ডিকেট’ গঠিত হবে মুখ-চেনা কিছু দলীয় লোকজন দিয়ে নয়– দেশের শিক্ষাবিদদের দিয়ে। ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ ও ‘সিন্ডিকেট’-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে আইনে উল্লেখ থাকবে। কোনোটারই সদস্যসংখ্যা একুশ জনের কম হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরে থেকে সমানসংখ্যক সদস্য নিতে হবে। বাইরের সদস্যদের সিটিং এলাউন্স বাবদ একটা নির্দিষ্ট আনুতোষিক দিতে হবে। ‘একাডেমিক

কাউন্সিল’ এবং ‘সিন্ডিকেট’-এ পাসকৃত প্রস্তাবগুলোকে ট্রাস্ট্রি-বোর্ডে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ট্রাস্ট্রি-বোর্ডের ক্ষমতাকে কমিয়ে ‘সিন্ডিকেট’-এর ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে। আইনের মাধ্যমে ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ ও ‘সিন্ডিকেট’-এর দায়বদ্ধতা আরোপ করতে হবে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী মানের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, তা তাদের এসএসসি ও এইচএসসির রেজাল্ট বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসে। এছাড়া আরো কিছু বাস্তবভিত্তিক মাপকাঠি নির্ধারণ করে প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাই করা যায়। ইউজিসি এ বিষয়ে গঠনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিকভাবে চলছে না, জোর করে চালাতে হচ্ছে, মান কমিয়েও ছাত্রভর্তি হচ্ছে না, ছাত্রসংখ্যাও কম, সার্টিফিকেট বিক্রি করছে– সেগুলো আইন করে ইউজিসির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। কমপক্ষে পনেরো-বিশটা ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সিএসআর বাবদ বণ্টিত অর্থ এখানে খাটাতে বলতে পারে। প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের এবং সরকার মনোনীত প্রতিনিধির সমন্বয়ে ‘বোর্ড অব ট্রাস্টিজ’ গঠন করতে পারে। নিয়োগ নীতিমালা মেনে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ ও ‘সিন্ডিকেট’ গঠন করে দিতে পারে। একটা সেট নীতিমালা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এভাবেও না চললে অবসায়ন ঘোষণা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভালোভাবে চালানোর জন্য অসংখ্য বিকল্প আছে। ভালো একটাকে বেছে নিলেই হয়। সমস্যা আছে, তার সমাধান আছে। দরকার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম-নীতি, মান নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতি তদারকি না বাড়িয়ে, ব্যবসাভিত্তিক, সার্টিফিকেট বিক্রিপ্রত্যাশী শিক্ষা-ব্যবসা করতে ইচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালা তৈরি করা দরকার। ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিনের পর দিন খোলাবাজারে সার্টিফিকেট বিক্রি করতে দিতে পারে না। দেশের উচ্চ-শিক্ষাকে

পণ্য বানিয়ে টাকার অঙ্কে রুজি-রোজগারের পার্মিটও দিতে পারে না। এখানেই আপত্তি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্যের কারণে ইউজিসি মার্জার পদ্ধতি ব্যবহার করেও সংখ্যা কমাতে পারে এবং মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অনেক পথই খোলা আছে। সবকিছুই সদিচ্ছার উপর পুরোপুরি নির্ভর করে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রকে বিরাজনীতিকীকরণ যত তাড়াতাড়ি করা যায় এ জাতির জন্য মঙ্গলও তত তাড়াতাড়ি আসবে বলে বিশ্বাস।

আট

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে এই ঊনপঞ্চাশ বছরের হাজার হাজার ঘটনার উদ্ধৃতি না-দিয়ে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া শিক্ষাঙ্গনের মাত্র তিনটা হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক ঘটনার আংশিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আছে। এতে কারো বিরক্তির অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু না বললে আমার এ জীবনাচার ও কর্ম লেখা অসমাপ্ত রয়ে যাবে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ও বর্তমান অবস্থার বিষয়গুলো প্রায় সবার জানা। আমিও প্রত্যেকটা দৈনিকে ছাপা ঘটনাগুলো অতি আগ্রহ নিয়ে চোখ-জোড়া মোটা-মোটা করে দেখেছি ও ভেবেছি। আজ তার বহিঃপ্রকাশ এই কলমের রেখার আঁচড়ে।

নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ড– সমকালীন সমাজ ব্যবচ্ছেদের একটা উপাদান। একটা না-ফোঁটা নিষ্পাপ ফুলকুঁড়ি। সমকালীন অপ্রতিরোধ্য পাপিষ্ঠদের প্রচণ্ড ছোবলে অকালেই কথিত এই উন্নয়নের নরকাগ্নি ছেড়ে চলে গেল। পিছে ফেলে রেখে গেল উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে ট্রেইনিংপ্রাপ্ত সোনার ছেলেদের, ঘৃণ্য সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালকদের জঘন্য মানসিকতার অভিজ্ঞতা; সে-সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার কলঙ্ক। ঘটনার পরম্পরা বর্ণনায় এমন কোনো সীমারতুল্য পাষাণ-হৃদয় কেউ নেই যার চোখে পানি আসে না।

ঘটনার পর থেকেই বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ কেটে একটা ফোল্ডার করে আমার অফিসের কম্পিউটারে রেখেছিলাম। এই লক-ডাউন সময়ে সে-সব তথ্য হাতের কাছে নেই। সে-জন্য ‘উইকিপিডিয়া’-র সহযোগিতা নিতে হচ্ছে। কারণ, অনেক কথাই ভুলে গেছি। বলা যায়, আরো শত শত ঘটনা ঐ ঘটনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এমনই হৃদয়ে দাগ-কাটা শত-সহস্র ঘটনা প্রতিনিয়ত কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

নুসরাত হত্যার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সচেতনমহল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখান। মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহানকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করলে নুসরাত তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় অধ্যক্ষ গ্রেফতার হয় এবং অধ্যক্ষের বিভিন্ন অকাম-কুকামের

সহযোগীদের নিয়ে নুসরাতকে হত্যার ছক সাজায়। নুসরাত বুঝতে পারেনি, যে থানায় সে অভিযোগ করেছে, সেখানেও আছে ঐ অধ্যক্ষের অকাম-কুকামের সহযোগী এবং দালাল চক্র– যা এ-দেশের প্রতিটা থানাতে বিদ্যমান। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া একজন স্বীকার করে যে, এর আগে নুসরাতকে দেওয়া তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, সে-ও এই হত্যাকাজে অংশ নেয়। বর্ণনায় বেরিয়ে আসে, হত্যার দিন সকালে মাদ্রাসায় আসে শাহাদাৎ হোসেন শামীম, নূর উদ্দিন, হাফেজ আব্দুল কাদের। ছাদের বাথরুমের পাশে শাহাদাৎ হোসেন কেরোসিন তেল ও গ্লাস নিয়ে রেখে দেয় এবং সাইক্লোন সেন্টারের তৃতীয় তলায় কামরুন্নাহার মনি তিনটা বোরকা ও চার জোড়া হাত মোজা রাখে। সাড়ে নয়টার দিকে শাহাদাৎ হোসেন শামীম, জাবেদ ও জোবায়ের বোরকা ও হাত মোজা পরে সেখানে অবস্থান নেয়। ঐ দিন আলীম পরীক্ষা দিতে নুসরাত জাহান সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র কামিল মাদ্রাসায় যায়। মাদ্রাসার এক ছাত্রী সহপাঠী নিশাতকে ছাদের উপর কেউ মারধর করছে, এমন সংবাদ দিলে নুসরাত জাহান ঐ ভবনের তিনতলায় চলে যায়। নুসরাত জাহান সেখানে হাত-মোজা পা-মোজাসহ বোরকা পরিহিত চার-পাঁচজনকে দেখতে পায়। তারা তাকে অধ্যক্ষ সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেয়। রাজি না হওয়ায় তারা তার মুখ চেপে ধরে ও ওড়না দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে। কেরোসিন গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর শম্পা, মনি ও জাবেদ পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষায় বসে। বাকিরা চলে যায়। ১০ এপ্রিল ২০১৯, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুসরাতের মৃত্যু হয়।

এরপর একটা পক্ষ ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ-কাজে কোনো এক পত্রিকার সংশ্লিষ্টতাও পাওয়া যায়। অনেক স্লোগান ও পাল্টা স্লোগান হয়েছে। পরিকল্পিত খুনকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার কাজে ঐ এলাকার প্রভাবশালীরাই জড়িত ছিল। প্রভাবশালীরা যা করে, প্রশাসনও তাই করে, কিংবা পরিস্থিতি কোথায় যায় নীরব দর্শকের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যদি দেখে বড়কর্তারাও প্রভাবশালীদের সুরে কথা বলছে, তখন ধামাচাপা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে, অন্যথায় লোক-দেখানো কিছু করে পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে

হয়। এ-ক্ষেত্রেও যা প্রতিনিয়ত হয় তাই হলো। মহাক্ষমতাধর কেউ একজন বলে উঠলেন যে, 'কোনো অন্যায়কে বরদাস্ত করা হবে না।' এ কথা শুনেই প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পড়-মর-ধর করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা বড় কথা নয়। সিগন্যালটা একটা বড় বিষয়। সিনেমার কাহিনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ধরাধরি হয়, ঢাক-ঢাক-গুড়গুড় হয়, রোমাঞ্চ হয়, কেউ বাঁচে, কেউ ধোয়া তুলসী পাতা সাজে, কেউবা গ্রেপ্তার হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গতানুগতিক ধারার একচুলও নড়-চড় হয়নি। ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলে বোঝা যাবে– একজন দক্ষ, এমন শত কাজে অভ্যস্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনাকারী সুন্দরভাবে কাজটা সমাধা করেছে। আত্মহত্যার প্রচারণায় সতীর্থ সবাই 'ঐ-যে চাচা বল্লে' মার্কা আনুগত্য দেখিয়ে এগিয়ে এসেছে। চারিদিক থেকে প্রভাবশালীমহল সহযোগিতা করেছে। এমন কি মাদ্রাসার গভর্নিং বডির ভাইস-প্রেসিডেন্ট রুহুল আমিন ও কমিটি মেম্বার কাউন্সিলর মাকসুদ আলম, যারা অধ্যক্ষের সাথে মিলে-মিশে মাদ্রাসার অর্জিত আয় ভাগ-বাটোয়ারা করে প্রতিনিয়ত খায়– তারাও এহেন গর্হিত কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচারে ১৬জন আসামির মধ্যে সবাইকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে।

আমি এখানে একজন নুসরাত জাহান রাফি, একজন অধ্যক্ষ ও নারীপিপাসু-সিরাজউদ্দৌলা, কোনো গঞ্জ, থানা ও জেলা পর্যায়ের মহান রাজনীতির সভাপতি রুহুল আমিন, পৌরসভার কাউন্সিলর মাকসুদ আলম, দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন পুলিশ অফিসার এবং একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ভালো-খারাপ দিকের বর্ণনা দিতে বসিনি। 'রাজনৈতিক দল'ও আর বলিনে। একটা রাজনৈতিক জোটের ক্ষমতা বদল হয়ে আরেকটা জোট ক্ষমতায় এসেছে। ঘটনাবলি তো একই আছে, ধরন একটু বদলে থাকলেও থাকতে পারে, মাত্রাটা একটু বেড়েছে বলা যায়। আমি সব জোটকেই একসাথে দেখতে চাই, কর্মকাণ্ডকে পরীক্ষা করতে চাই। ঘটনার বহিঃপ্রকাশ যেভাবেই হোক, ঘটনার প্রেক্ষাপট, সিরাজউদ্দৌলা গং ও রুহুল আমিন গং তো প্রতিটা গঞ্জে, থানায় ও জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একই কাজ করে যাচ্ছে। এটা তো বর্তমান বিদ্যমান সমাজের জীবনাচার ও কর্মের নিত্যদিনের আয়না। এটা থেকে তো নুসরাত গং-এর পরিত্রাণের কোনো রাস্তা নেই। আমি নির্দিষ্ট

কোনো দলের দিকে আঙুল তুলতে চাইনে। আমি জানি, এ দেশে সব শেয়ালের এক রা– এটা মানি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। মূলত জনসম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে।

কয়েক মাস ধরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনের অবস্থান, কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, উত্থান-পতন পত্রিকার মাধ্যমে যা পড়েছি, পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখতে হলে হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলোবে না। আমার প্রশ্ন: এ দেশের দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ সিরাজউদৌলা ও তার সহকর্মী এবং গভর্নিং কমিটির দুজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি শিক্ষাঙ্গনে কী এবং কেমন শিক্ষার কাজে ব্যস্ত? এ দেশের দলবাজ– লেলিয়ে দেওয়া তথাকথিত ছাত্রছাত্রীসমাজ জীবনকে কীভাবে গড়তে চায়? থানা ও জেলা পর্যায়ের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা কীসব ভালো ও মহান কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন– একবার ভেবে দেখবেন কী? একেই কি বলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন? না কি তার উল্টো? উন্নয়নের ধ্বজাধারী বিভিন্ন জোটভুক্ত মহান নেতারা– তদীয় পুত্র, তস্য পুত্র-কন্যা, তদীয় তস্য পুত্র-কন্যারা সমাজের কী এমন উন্নয়ন দরকার, যে-কাজে তারা তাদের মেধা ও শ্রম নিরলসভাবে দিয়ে যাচ্ছে? এসব চরিত্রের এসব লোকের একই কর্মকাণ্ড তো প্রতিটা মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, থানায়, জেলাই দেখে চলেছি। এদের একই রূপ। একই কাজে এরা ব্যস্ত, মহাব্যস্ত। সব পর্যায়েই প্রতিটা গ্রুপের আশ্রয় ও প্রশ্রয়কেন্দ্র থানা এবং এদের তুলনায় আরেকটু উপর পদের রাজনৈতিক নেতা। থানাকে ঘিরেই সমস্ত অপরাধ আবর্তিত হচ্ছে।

একটা উপজেলা পর্যায়ের ঘটনা বলি। এক বাসার মুরগি পাশের বাসায় গিয়ে পায়খানা করেছে। এ নিয়ে ঝগড়া। চুল-দাড়িওয়ালা, গলায় চেইন পরা, হাতে মোবাইল, বিবর্ণ চেহারার 'অতি মহান' নেতারা এলেন; কে কী বলেছে তা একটু শুনলেন। গলিপথ থেকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা একজন পকেটে পুরলেন, চলে গেলেন। যাবার সময় শাসিয়ে গেলেন, 'এ মহল্লায় থাকতে হলে কথাবার্তা উভয়পক্ষই সামলে বলবেন। নইলে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।' ব্যস, বিচার শেষ। আরেকটা উদাহরণ দিই।

অন্য আরেক জেলা শহরের ঘটনা। এক মেয়েকে মোবাইল ফোনে ফুঁসলিয়ে অন্য পাড়ার এক ছেলে তার বাড়িতে নিয়ে উঠিয়েছে। মেয়েটার বয়স ষোল বছরের

বেশি হবে না। আবেগতাড়িত বয়স। পাড়ার মানুষ বলাবলি করছে, অমুকের মেয়ে বেরিয়ে গিয়ে অমুকের ছেলের বাড়িতে উঠেছে ইত্যাদি। মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষের বাড়িতে গেছে। ঐ পাড়ার জটাধারী উন্নয়নের সৈনিকেরা কীভাবে যেন খবর পেয়ে যায়। সে-মতো তারাও হাজির। দু-পক্ষকেই আলাদা-আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। সব মীমাংসা শেষ। এক্ষুনি কাজি ডেকে বিয়ে পড়াতে হবে– নইলে সমাজের মান আর থাকে না। শোনা গেল, ছেলে-মেয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে এসেছে। মেয়ের বয়স আঠারো হয়নি তাতে কী? এফিডেভিট করানো হয়েছে। উকিলকে কিছু টাকা দিতে হয় মাত্র। সব ছাক্কা কাজ। মেয়েপক্ষ আমাকে বললেন, ঐ মাস্তানদের– থুড়ি-থুক্কু, ঐ উন্নয়নের সৈনিকদের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। শুনলাম, ছেলেপক্ষের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার নিয়েছে। রুজি-রোজগারের সব পথ খোলা। একটু চরিয়ে খেতে পারলেই হয়। আইনের কোনো বালাই নেই; বাধা দেওয়ার কেউ নেই; টুঁ-শব্দটাও কারো করার নেই; লাঠিয়াল বাহিনী দেশীয় অস্ত্র হাতে একবার ফোনের অপেক্ষায়! মেয়ে-জামাইকে মেয়ের বাড়িতে উঠাতে কত হাজার টাকা ঐ মহল্লার 'মহান নেতা'দেরকে দিতে হয়েছিল সে তথ্য নিতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। এই তো 'মহান' নেতাদের থানা, গঞ্জ, জেলা পর্যায়ের কর্মকাণ্ড। প্রতিটি মহল্লায় মহল্লায় বিচারক জন্মিয়েছে। টাকা আদায়ের বিচারক। ঠ্যাঙানো-দুরমুশ বাহিনী তৈরি হয়েছে। তারা 'অতি মহান' নেতাদের ইশারার অপেক্ষায়। মুরগিতেও পায়খানা করার জো নেই, গ্রামে গঞ্জে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, মারামারি থেকেও টাকা আদায় করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? তাদের পক্ষ কে নেবে? তাদের ঠাঁই কোথায়? নুসরাত জাহানের পক্ষ কেউ-কেউ নেয়; কিন্তু মরার পর। এই যে সমাজ-বিধ্বংসী দুর্বৃত্তায়ন, সমাজের একজন শাশ্বত শিক্ষকের এটা নৈতিক দায়িত্ব– এগুলোকে চিহ্নিত করা ও বলা।

দেশব্যপী একই চিত্র। ত্রাণের টাকা বিতরণে হাজার হাজার নামে একই মোবাইল নম্বর। সব কিছু মুখ দিয়ে ঢাকা যায় না, যেহেতু মুখের আয়তন কম। দেশের আয়তন তার থেকে অনেক বড়। এ দেশের যে কোনো আট-নয় বছরের ল্যাংটা ছেলেও আজকাল এসব বোঝে। আমি এ-বিষয় সম্বন্ধে তাদেরও ইন্টারভিউ

নিয়েছি। এটা আমার না-বুঝ মাস্টারি মনের অনুসন্ধিৎসা। আমার জিজ্ঞাসা, যে বিষয়গুলো আট-নয় বছরের ল্যাংটা ছেলে বোঝে, সেগুলো কি 'চির-মহান নেতারা' বোঝে না? কেন এমনটি হয়? না-কি 'চির-মহান নেতারা' প্রতিটা পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, থানা-জেলায় তাদের চ্যালাদের 'গোকুলের ষাঁড়'-এর মতো স্বেচ্ছাবিহারী, দায়িত্বহীন করে 'ধর্মের ষাঁড়' নামে বেওয়ারিশ ছেড়ে দিয়েছে? এদের গোকুলের ষাঁড়ের মতো উদাত্ত নিনাদে হুঙ্কা মেরে বেড়ানো এ দেশের বিবেকবান, আত্মসচেতন, সত্যনিষ্ঠ মানুষ কখনোই ভালো চোখে দেখে না। দেখা উচিতও নয়। আমি জানি, হিন্দু ধর্মে গো-মাতার গোবর ও গো-চোনা মহাপবিত্র ও মহামূল্যবান হলেও 'ষাঁড়ের নাদ' কিন্তু কোনো ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হয় না।

অনেকে প্রশ্ন করবে জানি, নুসরাত জাহান কি এদেশে আর ফিরে আসবে? কিন্তু সে এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে চিনে গেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বরূপ চিনে গেছে, চিনে গেছে এলাকার মহান নেতা ও ছাত্রনেতাদের। তার এ অসহনীয় অভিজ্ঞতার কাছে আমাদের মানুষ হিসাবে জবাব কী? তার নিশ্চয়ই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সন্দেহ ছিল, সে কি সমাজবদ্ধ কোনো জনপদে বসবাস করতো, না কোনো জঙ্গলে বসবাস করতো? তার বাপ-মা এখন বিচার নিয়ে কী করবে? এ বিচারে কী লাভ তাদের? এ দেশের এই মানুষরূপী তথাকথিত 'মহান নেতারা' কি পারবে তার জীবনটাকে ফিরিয়ে দিতে? পারবে কি এ-গ্লানি মুছতে? শেষ পর্যন্ত সব আসামিরই কি ফাঁসি হবে? কেন, আইনের ফাঁক-ফোকর? কর্তাভজা আছে না? যে প্রভুরা সারা-দেশের প্রতিটা আনাচে-কানাচে ইতরপ্রাণি লেলিয়ে দিয়ে রেখেছে, জনগণের সম্পদ ও ইজ্জত দিয়ে তাদেরকে পুষছে, সেই প্রভুদের ব্যবসার কী হবে? তারা কি ব্যবসা ছাড়বে? ঐ দোষী প্রাণিগুলোর পাপ কানায়-কানায় ষোল-আনা পূর্ণ হয়েছে বলেই প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসাবে তারা ধরা পড়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণে এ বাহিনী, সে বাহিনী এতদিন কোথায় ছিল? পত্রিকায় এসেছে, সিরাজউদৌলা দীর্ঘ দিনে অবৈধভাবে টাকার পাহাড় বানিয়েছে, তার সহযোগীরাও বানিয়েছে। সে টাকা এখন মামলায় খরচ করবে। এ-নিয়ে এতদিন কথা উঠেনি কেন? এতদিন বিচার হয়নি কেন? এতদিন ধোয়া-তুলসীর পাতা ছিল, হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল, এটাও তো মেনে নেয়া যায় না। এতদিন কি আইন-শৃঙ্খলা এ

দেশে ছিল না? আগের কর্মের বিচার আগে হলে তো এই নিরীহ মেয়েটাকে তার ইজ্জত ও জীবনের বিনিময়ে তাদেরকে চিনতে হতো না।

এ ঘটনার পর ফিডব্যাক হিসেবে– যারা বন্যপ্রাণি পোষে, তাদের পোষার পেশা বা সখ বা বিলাস বদল হয়েছে কি-না? এ-দেশে এক ধরনের খুনকে অন্য নামে চালিয়ে দেয়ার রেওয়াজ অনেক বছরের। পত্রিকা ঘাটলেই খুন, গুম, ক্রসফায়ার, অবৈধভাবে ও অলৌকিকভাবে অন্য দেশে অনুপ্রবেশের খবর চোখে পড়ে। নুসরাত জাহানকে পাকা হাতে আগুনে পুড়িয়ে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং সদলবলে পাল্টাপাল্টি স্লোগান দেওয়া, সতীর্থদের জড়ো করে শক্তিশালী বলয় তৈরি করা– সবই তো শিষ্যদের শেখা ট্রেইনিংয়ের রিহার্সল। গুরুদের ভিন্ন নামে বধ করার বাসনা তৃপ্ত হয়েছে কি-না?

নুসরাত জাহান কোনো একক নাম নয়, এদেশের লক্ষ-লক্ষ সাধারণ ছাত্রছাত্রীর প্রতিকৃতি। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা খুললেই নুসরাতদের ঘটনা চোখে পড়ছে। 'আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই, আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে, আর যেন কোনো বাপ-মার বুক এভাবে খালি না হয়'– এমন মুখস্থ হয়ে যাওয়া কথা শুনতে আর ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, 'যে-ই হোক, অন্যায়কারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না'– এমন সব আপ্তবাক্য। ঠগ বাছতে গেলে যে গা উজাড় হবে। সুতরাং এসব মুখস্থ বাক্য না বলাই ভালো। এই নুসরাতরা যদি ওদের বিকৃত প্রস্তাবে, অনৈতিক কাজে সম্মত হয়ে তাদের ঘৃণ্য পিপাসার তিয়াস মেটাতে পারে, সেবাদাসী হিসাবে চলতে রাজি হয়, সেখান থেকে ফায়দা লোটার মতলব করে নেত্রী হতে চেষ্টা করে, হয়তো তখন এই নুসরাতদের আবার যুগশ্রেষ্ঠ কৃতী মহিলা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। পাপিয়াগং পাপরাজ্য চালিয়ে, ক্ষমতাবানদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়ে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়ে; তাতে পাপিয়াগংয়ের রাজনৈতিক উন্নতি হয়। কিন্তু নুসরাতরা জীবন দেয়, তবু ইজ্জত দেয় না, হায়েনা-সদৃশ সিরাজউদ্দৌলা গং-এর সাথে আপস করে না বিধায় এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়। এটাই এদেশের মৌলিক দর্শন। এ দেশে এই ধর্মের ষাঁড়দের সাথে আপসকারী না হলেই যত বাধা, অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন।

আরেকটা কথা, একটা জনগোষ্ঠীর মানসিকতাকে খারাপ পথে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ; এটা করে অন্যের সুবিধাও লোটা যায়। এদেরকে আবার ভালো পথে ফেরত নেওয়া যে কতো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ, তা কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী নিশ্চয়ই ভালো করেই জানেন। আমার মতো একজন ডেবিট-ক্রেডিট বোঝা লোক, শুধু সমাজ ও মনোজাগতিক ডেবিট-ক্রেডিট এবং কেরামন-কাতেবিনের ডেবিট-ক্রেডিট ভাবে ও জানে।

শিক্ষাঙ্গনে আরেকটা আলোচিত হত্যাকাণ্ড– বরগুনার রিফাত হত্যা। কলেজের ফটকের সামনে স্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য দিনের আলোয় একদল সন্ত্রাসী রিফাত শরীফ নামে এক কলেজপড়ুয়া যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বীরদর্পে চলে যায়। আশপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে থাকে– এগিয়ে আসে না। সূর্যসন্তানদের একজন প্রধান সেনাপতির নাম 'নয়ন', স্বঘোষিত নাম 'নয়ন বন্ড'। এটাও একটা বাহিনী। প্রতিটা এলাকায়, মহল্লায়, শহরের অলিতে-গলিতে এমন বাহিনী বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামে গড়ে উঠেছে। আমার এলাকাতেও এমন এক বাহিনীর অস্তিত্ব আছে, তাদের দাপটে বাঘে-মহিষে একঘাটে পানি খায়, নাম 'ব্লাক হোম'। থানা ও জেলা পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতারা এদের পৃষ্ঠপোষক। এটা-ওটা 'সুখাদ্য' খাওয়া বাবদ টাকা-পয়সা নেতাদের কাছ থেকেই আসে। আর নিজ নিজ অবস্থানে থেকে যা করে-কম্মে খেতে পারে সেটা সম্পূর্ণই তার। 'বল বীর– বল উন্নত মম শির! .... মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর। ..... আমি মানি নাকো কোনো আইন, আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম, ভাসমান মাইন!' এরাও তাই।

উঠতি বয়স থেকে ২৫/৩০ বছর বয়সী রাজনৈতিক তরিকায় এসব বাহিনীর আধিপত্য। সাধারণ মানুষের আতঙ্ক, মানুষ ভয়ে থরহরিকম্পমান, গা ঘেষতে চায় না। পথে চলা দেখলে পথ ছেড়ে পাশে দাঁড়ায়। ভাবে, কে যেন কখন 'গরম নজরে তাকায়'। আজব এক উৎপাত। কখনো গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে। নিঃশ্বাস ফেলতে কেন যেন ভয়! স্বাধীন দেশে পরাধীনতার ভয়। সতীর্থের একটা ফোন কলেই পঞ্চাশ জন রামদা, কুড়াল নিয়ে হাজির। প্রায় প্রত্যেকেই মটরসাইকেল

সাওয়ারি। এরা উপরতলার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। পুলিশ সদস্যরাও তাদের দেখলে ভয়ে ভয়ে থাকে। মাফ চেয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে, বড় ভাই ডেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঝামেলায় জড়ালে চাকরি রাখা দায়।

চোখের সামনেই এরা বড় হচ্ছে, বিপথে যাচ্ছে, নেশা ধরছে, গুরুর ছবক নিচ্ছে, তরিকা ধরছে, অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। কারো কিছু বলার নেই, বলার সাহসও নেই। এসব বাহিনীকে কারা টাকা-পয়সা দিয়ে পোষে, প্রয়োজনে লেলিয়ে দেয়– তা আমরা সবাই জানি। এরকম এক বাহিনীর হাতে রিফাতকে দিনের আলোয় জীবন দিতে হয়েছে। রিফাত কেন তাদের বিরাগভাজন হলো, বিষয়টা রিফাত আগেই ভাবতে পারতো। রিফাত হত্যায় অনেকের মধ্যে সরাসরি জড়িত 'নয়ন বন্ড' ও তার ভাই 'রিশান'। পত্রিকায় প্রকাশ, দু-ভাইকেই বাসায় পোষে তাদের খালু জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও রাজনৈতিক দলের সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসেন এবং স্ত্রী খুকী। তাদের নামে এর আগেও মামলা হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু ঐ যে অজানা (ওপেন সিক্রেট) সুতোর টানে পুতুল নড়ে, খেলা দেখায়, বারবার জেল থেকে বেরিয়ে আসে। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। পরে 'রিফাত বন্ড' তার মাকেও কাঁদিয়েছে ক্রস ফায়ারে পড়ে। বেটা 'রিফাত বন্ড' হাতের 'বন্ড' (বাঁধন) খুলতে পারেনি, তাই গুলিও ঠেকাতে পারেনি, গায়ে গুলি লেগেছে। নিজে পালাতে পারেনি– সাথীরা পালিয়েছে। খালা-খালু এবার আর রক্ষা করতে পারেনি। দুঃখিত, তাদের রাজনীতি করাই বৃথা। রাজনীতির ব্যবসা করে অথচ এতদিন পরও স্বজনপ্রীতির দুর্নাম নিতে ব্যর্থ হয়েছে, এটা কি হয়?

হাইকোর্ট এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে,'নয়ন বন্ড তো একদিনে তৈরি হয়নি।' হাইকোর্টে তো বিজ্ঞ বিচারকরা বসেন। এ দেশের সাধারণ লোকেরাও তো দেখে আসছে– নয়ন বন্ডরা একদিনে তৈরি হয় না। এদের পিছনে অনেকের অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হয়; ট্রেইনিং দিতে হয়, হাত পাকাতে হয়। জেল থেকে বারবার ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর নয়ন বন্ডরা 'বন্ড' উপাধিতে ভূষিত হয়। তাদের দিয়ে এলাকায় তেলেসমাতি কারবার চলে। সমাজে রাতকে দিন, দিনকে রাত করতে পারে। তারপর একদিন 'বন্ড' এ-জগৎ ছেড়ে

চলে যায়– পালক পিতারা বহাল-তবিয়তে থাকে, অন্য বন্ডের বন্ধন খোঁজে। পুলিশ বাহিনীও এদেরকে চেনে; কিন্তু চাকরি বাঁচানোর তাগিদে গা বাঁচিয়ে চলে, শুধু আখের গোছাতে থাকে। এটা আজব দেশের নছব (পুরুষানুক্রম) তরিকা। দল বদলায় তো খাসলত বদলায় না। এটাই এ ব-দ্বীপের মানুষের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

এদেশের হাজার হাজার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ইদানীংকালের আরেকটা হত্যাকাণ্ড হচ্ছে 'আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড'। শিক্ষাঙ্গনের ললাটে কলঙ্কের তিলক বুয়েটের অবরার হত্যা। 'উইকিপিডিয়া'র বর্ণনা থেকে ঘটনার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি:

'আবরার ফাহাদ ছিল বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আবরার ফাহাদকে ভোঁতা জিনিসের মাধ্যমে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সন্দেহ করে যে, আবরারকে তার সাম্প্রতিক একটি ফেসবুক পোস্টের কারণে আক্রমণ করা হয়েছিল, যা ভারতের সাথে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু চুক্তির সমালোচনা বলে মনে হয়েছিল। আবরার ১০ দিন আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। পরীক্ষা কাছাকাছি চলে আসায়, লেখাপড়া করতে সে হলে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বুয়েট শাখার ছাত্রলীগের সমাজসেবাবিষয়ক উপ-সম্পাদক ইফতির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ৪ অক্টোবর বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদি হাসান একটি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আবরারকে মারার নির্দেশনা দেয়। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক অমিত সাহা তাকে বাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষা করতে বলে। ৬ অক্টোবর রাতে আবরারকে তার দুটো মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপসহ ২০১১ নম্বর কক্ষে নিয়ে আসা হয়। মুজতবা রশিদ এবং তাবাখখারুল ইসলাম মোবাইল ফোন দুটো চেক করে। মুনতাসির আল জেমি ল্যাপটপটা চেক করে। এ সময়ে মেহেদি হাসান আবরারকে চড় মারতে থাকে। সামসুল আরেফিন স্ট্যাম্প এনে দিলে তা দিয়ে ইফতি চার-পাঁচটি আঘাত করলে স্ট্যাম্পটি ভেঙে যায়। এরপর গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক অনিক সরকার আবরারের হাঁটু, পা,

পায়ের তালু ও বাহুতে স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে থাকে। অনিক সরকার গায়ের শক্তি প্রয়োগ করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্ট্যাম্প দিয়ে আবরারকে আঘাত করে। রাত ১২টার দিকে সবাই কক্ষটি থেকে বের হয়ে যায়।'

'আবরার কয়েকবার বমি করে। অমিত সাহা সবকিছু জানার চেষ্টা করে, তাকে মেরে আরও তথ্য বের করার কথা বলে। পরে ১৭ ব্যাচের ছেলেরা তাকে নিচতলায় নামিয়ে রাখে। সোমবার ভোর তিনটায় পুলিশ আবরারের লাশ উদ্ধার করে। মেডিক্যাল অফিসার আবরারকে মৃত ঘোষণা করেন। আবরার যখন মুমূর্ষ অবস্থায়, তখন তাকে প্রথমে 'শিবিরকর্মী' হিসেবে এসব ছাত্রলীগের নেতারা পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায়। ভয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, কেউ কাউকে খবর দিতে পারছিল না।'

'হত্যার পর মেহেদি হাসান ও অনিক সরকারসহ খুনিরা লাশ গুম ও আবরারকে মাদক দিয়ে 'গণপিটুনির নাটক' বলে ফাঁসানোর চেষ্টা করতে থাকে। (অর্থাৎ, গুরুদের সর্বজ্ঞাত টেকনিক ফলো করতে চায়)। ফেসবুক স্ট্যাটাসে, আবরার ভারতকে মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া, ফেনী নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ থেকে এলপিজি আমদানি করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল।' (তথ্যসূত্র: দ্য ডেইলি স্টার, ৮ অক্টোবর; ঢাকা ট্রিবিউন, ৭ অক্টোবর; প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর; উইকিপিডিয়া bn.m.wikipedia.org)। পাকিস্তানের দালাল এদেশে আছে জানি। ভারতের নিরঙ্কুশ দালালও কি এদেশে সক্রিয়?

ঘটনার প্রতিবাদে এদেশের জ্ঞানবিধ্বস্ত পণ্ডিত বাদে, সারা দেশের সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী সমাজ, ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে দেশ উত্তাল হয়ে উঠছিল। সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীও অংশ নিয়েছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন। এদেশে যা চলছে, সুস্থ-চিন্তার লোক প্রতিবাদ না করে পারেন না। পারা উচিতও নয়। প্রতিবাদ না করলেই বুঝতে হবে, 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়।' কোনো সভ্য সমাজে এ ধরনের কোনো ঘটনা কল্পনাও করা যায় কি? স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই এ-ধরনের ঘটনা কোনো-না-কোনোভাবে ঘটে আসছে। কখনো বেশি, কখনো কম।

এ দেশের এই তথাকথিত ছাত্ররাজনীতি নিয়ে অনেক কথা লেখালেখি হয়েছে। সুবিধাবাদী-সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ছাড়া এই খুন, অস্ত্রবাজির ছাত্ররাজনীতি কোনো সুস্থ-কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক কিংবা অভিভাবক চায় না। ছাত্র-রাজনীতির কথা উঠলেই সুবিধাভোগী একটা পক্ষ স্বাধীনতাকালীন কিংবা স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্র-রাজনীতির কথা তুলে ধরেন। তারা সে দোহাই পাড়েন। চর্বিতচর্বন করেন। তারা ছাত্ররাজনীতি বজায় রাখেন। 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।' যদি বলি, সময়টা কি এক? নেতৃত্বটা কি এক? 'দাদার আমলে খেয়েছি দই, সে-কথা আজও কই।' প্রয়োজন আছে কী? এদেশের রাজনীতিবিদরা তাদের প্রয়োজনে সুবিধা নেয়ার জন্য, আপৎকালীন টিকে থাকার জন্য টাকা, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে প্রতিহিংসা ও বিভাজনের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে, সন্ত্রাসী গড়ে তুলছে, শিক্ষাশক্তিকে শেষ করে দিচ্ছে, শিক্ষাঙ্গন চর দখলের মতো দখলে নিচ্ছে, দুর্নীতিবাজির ছবক দিচ্ছে এবং পুরো সামাজিক পরিবেশকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এতেও শেষ নেই, আবার স্বপক্ষে গলাবাজিও করছে। দেশব্যাপী এ-ধরনের একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত সন্ত্রাসীগোষ্ঠী বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ধ্বংস ও জীবননাশ করার অধিকার কোথা থেকে পেয়েছে? এ অধিকার এদের কে দিয়েছে?

দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত আবরার ফাহাদের কী দোষ ছিল? সে যে এদেশের একজন সচেতন দেশপ্রেমী এবং ইতিহাস-জানা তরুণ, লেজুড়বৃত্তি করে না– তা তার লেখায় বোঝা যায়। সেটাই এদেশের দালালগোষ্ঠী এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গাত্রদাহের অন্যতম কারণ। একটা পক্ষ এদেশের অধিকাংশ তরুণ ও যুবসমাজকে গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল, অশ্লীল ছবি ও ফেসবুকের নেশায় মশগুল করে এবং আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিধ্বংসী রাজনীতির আফিম খাইয়ে জীবন ও দেশের কল্যাণের পথে নির্জীব, নির্জ্ঞান ও অন্ধ করে রেখেছে। এ যাত্রার শেষ কোথায় তা পরিণামদর্শী অনেকের মতো আমিও কিছু অনুমান করতে পারি। তবু অপেক্ষা; সমাধিস্থপ্রায় জীবন নিয়ে অপেক্ষা।

পত্রিকার মাধ্যমে শুনেছি, সরকারি প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে না কি এ ধরনের টর্চার সেল আছে। সেখানে যে কত সজীব প্রাণ অলক্ষ্যে ঝরে যাচ্ছে, কত কান্না ইট-পাথরের কঠিন দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে চিরতরে থেমে যাচ্ছে, কত বাপ-মার বুক খালি হচ্ছে, গুম হচ্ছে– তার খতিয়ান কে রাখছে? কে-ই-বা তার প্রতিবাদ করছে! রাজনৈতিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'টর্চার সেল'-এর কাহিনি তো অনেক পুরানো গীত। যখনই একটা অনপনেয়-অনামুখ ঘটনা জনসমক্ষে বের হয়ে আসে, তখনই অনেক অনেক আরো অন্য জনপথের ছাইচাপা নিস্পিষ্ট হাহাকার ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে। অতি অল্পদিনেই আবার সে ধ্বনি কোথায় যেন মিলিয়ে যায়; কিন্তু অত্যাচারিতের অস্ফুট আর্তনাদ-নিষ্পেষণ অব্যাহত থাকে। এ আবার কোন দুরারোগ্য, দুর্নমিত, দুরপনেয় ব্যাধি! এ আবার কোন অসুরকুলের সুর-তোলা অপদেবতার মন্ত্রশিষ্য! স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ছুঁতে চলেছি; অথচ স্বাধীনতার লক্ষ্য বলে ঘোষিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ও সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর আদর্শ চলতে পথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে!

আবরারকে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীর গন্ধ গায়ে মাখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা তো আমাদের পুরোনো ব্যাধি। অসংখ্য ফেসবুক ব্যবহারকারী এর ব্যাপক সমালোচনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক লিখেছিলেন, 'যেন শিবির হলেই কাউকে অকারণে মারা-ধরা করা যায়।' এটা এদেশের সবকিছুতে একটা আলগা রং মাখানোর অপচেষ্টা, অত্যন্ত ঘৃণ্য একটা প্রচলিত ব্যামো। হুজুগে বাঙালির উপযোগী একটা প্রচেষ্টা। একভাবে মেরে অন্যভাবে চালিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই শুরু। বতর্মানে এটা মহিরুহ আকার ধারণ করেছে মাত্র। বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদমাধ্যম কিংবা সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অতি সুকৌশলে এ কাজগুলো করা হয়। আর হুজুগে বাঙালি সে-কথা পুরোপুরি বিনাবাক্যে গ্রহণ করে, 'তাই না-কি! তাই না-কি! আগে জানতাম না তো!' –বলতে থাকে। এগুলো হালকা বুদ্ধি ও হুজুগে মাতার পরিচায়ক। এ বোধশূন্য-বোধিভ্রুম পদ্ধতিতে এদেশে অধিকাংশ সময় ধন্বন্তরি কাজ হয়; কিন্তু আবরারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এ অপচেষ্টা মানুষের মুখস্থ হয়ে গেছে, তাই সাধারণ মানুষ এ অপচেষ্টা রুখে দিয়েছে।

আবরারকে ‘মাদক দিয়ে গণপিটুনির নাটক সাজিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়’। এর মধ্যে আমি কোনো নতুনত্ব দেখিনে। ক্রসফায়ারে পড়ে মরা লাশের উপর ও চারপাশে মাদক ছিটিয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা; কিংবা যে কোনো সাধারণ মানুষকে কেসে জড়াতে পকেটে বা বাড়িতে মাদকদ্রব্য রেখে কোমরে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর নিত্যনৈমিত্তিক নাটক এদেশে প্রতিনিয়ত মঞ্চস্থ হচ্ছে। এদেশে ‘মহান রাজনীতিবিদ’দের পোষ্যপুত্রদের সে-বিষয়ে পারঙ্গমতা বা দক্ষতা বা সিদ্ধহস্ত হওয়ার বিষয়টা আমার গায়ে লাগে না। বলা যায় যে, পোষ্যপুত্ররা ট্রেইনিংটা ভালোভাবেই নিতে পেরেছে। এদেশে এরা সোনার সংসার পেতে ‘রাজ-রাজত্ব কায়েম’ করতে পেরেছে। এজন্য তাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করার ব্যবস্থা, সার্টিফিকেট বিতরণ, সাথে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করার আয়োজন থাকলে সোনায় সোহাগা। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তো কত লক্ষ হাজার কোটি টাকাই না বিপথে যাচ্ছে, এ খরচটুকু আর তেমনই বা-কী! কেবল আবরারের জন্য কোষাগার থেকে আর খরচ হবে না– এতেই রক্ষে। যাদের চেটেপুটে খাবার বংশজ অধিকার, তা অটুট থাক। যতদূর মনে পড়ে, আমি বিশ্বদ্যিালয়ে পড়েছি প্রতি মাসে আঠারো টাকার কম বেতন দিয়ে। বাকি খরচ এদেশের জনগণের ঘাড়ে চেপেছে। বতর্মানেও রাষ্ট্র অতি কম টাকায় ছাত্রছাত্রীদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। মতলববাজ রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের টাকায় বেশ কিছু ছাত্র নামধারী জীবজন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষছে তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এ হত্যাকাণ্ডের রায় কী হবে দেখার বিষয়। কোনো কিছুকে বিশ্বাস করতে খবু কষ্ট হয়। বুয়েটের শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিচার ছাড়াও আরেকটা দাবি ছিল– বুয়েট থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার। আমি বলতে পারি, এদেশের প্রতিটা শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র-রাজনীতির বীজ উপড়ে না ফেললে শিক্ষার পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবে না। রাজনীতিবিদদের কাছে শিক্ষাঙ্গনগুলো দাবার গুটির চাল হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, রাজনীতির মই বেয়ে ক্ষমতা ও অথের্র পাহাড় গড়লেও, প্রতিটা অভিভাবকের কাছে তাদের সন্তানরা একেক টুকরো স্বপ্ন। এ স্বপ্ন যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষার অকালমৃত্যু হয়।

মূল সমস্যা কোথায় আমরা সবাই তা জানি। রাজনীতিতে পচন ধরে দেশব্যাপী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাজনীতিকদের মগজে বিকলতা দেখা দিয়েছে। ফলে, পুরো দেশ নরকাগ্নিতে পুড়ছে। সমাজের চরিত্র বদল হয়ে গেছে। সততা, মনুষ্যত্ব মানুষের মন থেকে উঠে যাচ্ছে। পুরো বিশ্বের রাজনীতি থেকে নরপিশাচের অশুভ-অমঙ্গল ধ্বনি কানে ভেসে আসছে। রাষ্ট্র পরিচালনার সিস্টেম বদলের সময় এসে গেছে। প্রচলিত সিস্টেম অকার্যকর বলে বার বার প্রমাণিত হচ্ছে। বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার টরে-টক্কা থেকে ডিজিটাল পদ্ধতির অকল্পনীয় পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্টবিজ্ঞান তত্ত্বের কী পরিবর্তন করতে পেরেছি? স্পষ্টত কোনো পরিবর্তন নেই। পুরাতন গণ্ডিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে, নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে।

আজ এই দুঃসময়ে আবরার হত্যার বিষয়টা নেটে খুঁজতে গিয়ে ‘প্রথম আলো’-র সেই জীবন্ত ছবি ভেসে এলো সামনে। তথাকথিত ছাত্রনেতাদের চাপাতির উপর্যুপরি কোপে প্রাণ হারানো পুরোনো ঢাকার দর্জি বিশ্বজিৎ দাসের ছবি। চারদিক থেকে হায়েনাদের চাপাতির আক্রমণের ছবি; রক্তে ভেজা জামার ছবি। ঘটনাটা আমাকে খুবই ব্যথিত করেছিল। কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি, ঠিকমতো খেতেও পারিনি। এ নিয়ে একটা কিছু লিখে দায় শোধ করতে চেয়েছিলাম। দিনগুলো পার হয়ে গেছে, লিখিনি। আজ নেটে আবরারের জন্য পত্রিকার পাতা উল্টাতে গিয়ে আবার সেই ছবি, চারপাশে হায়েনাদের রক্তলোলুপ জিঘাংসা আমার সামনে চলে এসে আমাকে আবার হতভম্ব করে দিল। এ-ছবি আমার জীবদ্দশায় ভোলার নয়। হাইকোর্ট বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় ছয়জন নেতাকর্মীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেওয়ায়, রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বজিৎ দাসের ভাই উত্তম দাস বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ‘পাঁচ বছর পরে আজকে আরেকটা দুঃসংবাদ এটা। আজকের দিনটাতে যে এরকম কিছু শুনতে হবে আমরা আশাই করিনি। এটাই ঠিক যে, সরকার যা চাইবে তা-ই হবে। সরকার যদি চাইতো যে অন্তত বিশ্বজিতের ঘটনাটার সুষ্ঠু বিচার হোক– তাহলে হতো। কোথায় আটজনের মৃত্যুদণ্ড; সেখানে আসলো দুই জনে। কী বলবো, বলার ভাষা নেই।’

আমার বলার আছে। 'প্রথম আলো'-তে প্রকাশিত কিরিচ, চাপাতি দিয়ে কোপানো অবস্থায় হায়েনাদের ও বিশ্বজিৎ দাসের সেই জীবন-অমর ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে এদেশের রাজপথে অন্তত পঞ্চাশ বছরের জন্য টাঙিয়ে রাখা হোক। সে-সাথে আবরার হত্যা, রিফাত হত্যা, নুসরাত হত্যার ছবি। তাদের হত্যাকারীর ছবিসহ, টাঙিয়ে রাখা হোক। রাজধানীর সংসদভবনের পাশে একটা গ্যালারি করে এসব হত্যাকাণ্ডের ছবি, ঘাতকদের ছবিসহ টাঙিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে; পত্রিকার রেফারেন্সগুলোও যেন সেখানে থাকে। আমাদের রক্তস্নাত স্বাধীনতার রক্তগঙ্গার বিনিময়ে আমরা যে কী প্রতিহিংসাপরায়ণ, রক্তপিপাসু রক্তবীজের ঝাড় অর্জন করেছি, নতুন প্রজন্ম তা দেখে শিক্ষা নিক।

নয়

পুরো দু-মাস হয়ে গেল করোনা ভাইরাস নিয়ে কোনো বয়ান করিনি। অথচ করোনা নিয়েই আছি; অনেক পানিই নদী দিয়ে গড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রমজানের এক ঈদ গিয়ে আরেক ঈদ আসছে। গার্মেন্টস খোলা-বন্ধের অনেক লুকোচুরির খেলা হলো। ঈদ কেনাকাটার জন্য সুপার মার্কেটগুলো খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। কেনাকাটায় বিশেষ করে মহিলাদের ঢল নামলো। তারা ভাবলো, এই ঈদ-ই হয়তো-বা জীবনের শেষ ঈদ। কেনাকাটা ছাড়া কি জীবন চলে! সরকারের এই সিদ্ধান্তহীনতা এবং দোদুল্যমানতা– অনেক ক্ষেত্রে ধীরতা খুব ক্ষতি করছে। এই সময়ে যা দরকার ছিল– যত বেশি বেশি পারা যায় করোনা পরীক্ষা করানো। তা হয়নি, ধীরে ধীরে বাড়ছে। এতে করোনা রোগী চিহ্নিত হলো না। হয়তো পরীক্ষার আওতা আরো বাড়বে, তাতে তেমন একটা লাভ হবে না। সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। আরো আগে থেকে করোনা পরীক্ষার বেশি বেশি ব্যবস্থা রাখতে হতো। হয়তো সেখানেও মোনোপলি ব্যবসার কথা ভেবেছে। এ অবস্থা বর্তমানে প্রকট। সামনের দিনগুলোতে সমস্যা প্রকটতর হবে। হাসপাতালগুলোর জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচিত হবে। মৃত্যুপথযাত্রী আপনজনকে কোথাও ভর্তি করানো যাবে না। 'আইসিইউ খালি নাই, কেবিন খালি নাই' শুনতে হবে। কোনো সহযোগিতাও পাওয়া যাবে না। অসহায়ের মতো বসে বসে দেখা ছাড়া উপায় না থাকা যে কত বড় বেদনাদায়ক ও ধিক্কারজনক অবস্থা, ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বোঝানো যায় না। রাজধানীর অবস্থা অতি খারাপ হলে, জেলা শহর ও গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থা কী হবে, সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যাবুদ্ধির অবস্থা একটু বলি। অল্প কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বপ্রস্তুতি থাকার কারণে অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস চালিয়ে যেতে থাকলো। অমনোযোগী, ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেটের দোহাই, কখনো করোনার দোহাই দিয়ে ক্লাস না করার ও দীর্ঘ ছুটি ভোগ করার মওকা খুঁজতে লাগলো। ভালো ছাত্রছাত্রীরা ফাঁকিবাজ-ভোকাল ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখির চাপে চুপসে গেল। তবু

তারা অনলাইন ক্লাস, হোম-টাস্ক চালিয়ে যেতে থাকলো। কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন অজুহাতে নামমাত্র মূল্যায়নে নম্বর অর্জনের সুযোগ খুঁজতে লাগলো। যা হোক, ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অল্প হওয়াতে সময় নিয়ে ঢিমে-তেতালাভাবে প্রথমবারের মতো, বলা যায় মোটামুটি ভালোভাবে সেমিস্টার পর্ব সমাধা করা গেল।

হাতে গোনা কিছু ছাত্রছাত্রীর নেটওয়ার্ক সমস্যা বা বিপদে থাকার বিষয় অমূলক নয়, সেটা আমরাও বুঝি। সেটা আমরা প্রশাসনিকভাবে সহানুভূতির সাথে দেখবো। তাদের জন্য সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু ঢালাওভাবে প্রায় সবাই খোঁড়া, কিংবা চোখের অসুখে ভুগছে, বই পড়া নিষেধ, বই ছোঁয়াও নিষেধ– ভাব দেখালে তো বুঝতেই হয় 'বিলকুল ঝুট হ্যায়'। ইন্টারনেটের ব্যান্ড-উইডথ কিনে জীবনের অন্যান্য শখ মেটাতে পারছে, জীবনকে উপভোগের আয়োজন চলছে, অথচ ক্লাস করার কথা উঠলেই নেট নেই। অবস্থাটা কী, রোগটা কোথায়– এটা পাগলেও বোঝে। ভাবখানা এরকম যে, অটো-সার্টিফিকেট পেলে অতি খুশি। 'আমার বাপের টাকায় আমি পড়ছি, তুমি লেখাপড়া করতে বলার কে?' 'পারলে সার্টিফিকেট দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও, নইলে অনেক জায়গা আছে –সেখান থেকে নিয়ে নেব।' এই মনোভাব অনেক ছাত্রছাত্রীর আছে।

অন্যান্য অনেক দেশেরই খোঁজখবর রাখি। প্রায় সন্ধ্যায় কারো-না-কারো সাথে কথা হয়। এদেশের তুলনায় করোনায় বেশি আক্রান্ত, তবু লেখাপড়ার পুরো প্রক্রিয়া চলছে। মানের কোনো ঘাটতি নেই। কোনো অজুহাত নেই। ছাত্রছাত্রীরাও জানে তাদের পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এটা একটা মানসিক অবস্থার ব্যাপার, পরিবেশের ব্যাপার। মূলত ব্যতিক্রম বাদে এদেশের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাবিমুখ, শিক্ষায় অনাগ্রহী। ভালো চকচকে নোট ব্যয় করে হাঁটুছেড়া প্যান্ট কিনে বাসায় ফেরে। আবার ভালো চাকরি পেতে খুব আগ্রহী। ভালো করে পড়তে পারে না, সুষ্ঠুভাবে ভাবতে জানে না, বিশ্লেষণমুখী জ্ঞান নেই, লিখতে পারে না– প্রতিটা পৃষ্ঠাতে উনিশটা বানান ভুল, নৈতিকতার পাতায় ঢন-ঢনা-ঢন, সুশিক্ষার পাতা ফাঁকা। নিয়োগকর্তা তাকে কাজে নিয়ে কী করাবে! ললাটে হতভাগার চিহ্ন আঁকা।

একটা গল্প বলি: গত দু-মাস আগের কথা। আমি ভয়ে ভয়ে অফিসে গেছি। এক সহকর্মীকেও অফিসে আসতে বলেছি। এদেশের ছাত্রছাত্রীদের দৈন্যদশা নিয়ে কথা হচ্ছে। তিনি তার এক বন্ধুর কথা বললেন। বন্ধুর একখানা সুযোগ্য ভাগ্নেরত্ন আছে। পড়াশোনায় অমনোযোগী। পড়তে একেবারেই ভালো লাগে না। কিন্তু বিয়ের বাজারে দাম পেতে সার্টিফিকেট দরকার। অথচ পড়াতে বিতৃষ্ণ। অন্য একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কোনো ভর্তি পরীক্ষাও দিতে হয়নি। পড়াশোনাও তেমন একটা করা লাগে না। ভর্তি হবার পর ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে বলে। ঘটা করে অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে তার বাপ-মাকে সবার সামনে পা ধুইয়ে দিতে হয়। গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাতে হয়। আদব-কায়দা শেখানো শেষ। সময় শেষে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। সে অবস্থায়ও ভাগ্নে কোনোদিনই পাস করেনি। মনে বড় কষ্ট। বছর পেরিয়ে যায়। ভাগ্নে ক্লাসেও ঠিকমতো আসে না, পাসও আর হয় না। বড় আক্ষেপ তার মনে। এবার ভাইরাসের জোয়ারে প্রকৃত শিক্ষা খেয়ে ফেলেছে। শুধু নামমাত্র অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলেই পাস। অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে দুটো কোর্সেই সে এ-প্লাস পেয়েছে। মামার বাসায় দামী মিষ্টি নিয়ে ভাগ্নে হাজির। মামা-মামি দু-জনেই সন্তুষ্ট, ভাগ্নেও তাই। সংবাদটা নিঃসন্দেহে ভালো। দু-জনে অনেকক্ষণ হাসলাম। যোগ্য ভাগ্নে বটে, যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ধন্য এ-দেশ এই গৌরবান্বিত ছাত্রকে বুকে ধরে।

আমার মনে হয়, ঈদের আগে মার্কেট খুলে দেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে। অসচেতন বাঙালি মহিলাদের ঢল গ্রামে-গঞ্জে নামলো, শহরেও বাদ যায়নি। এতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। গার্মেন্টস খোলা-বন্ধের সাপে-নেউলে খেলা তো বেশ কিছুদিন আগের কথা। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অনেক মহিলা কর্মী ঢাকা থেকে ভাইরাস বয়ে গ্রামে নিয়ে গেছে। এছাড়া, ঈদের আগে মানুষ গ্রামের বাড়ি যাওয়া, আবার ফিরে আসা অনর্থক। তবু বাঙালির শখ-ঐতিহ্য প্রশমিত করার নয়। পুরো সমাজজুড়ে অসচেতনতা, দায়িত্বহীনতা, উন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতা বিরাজমান। আইনশৃঙ্খলা বিভাগ নিয়ন্ত্রণে ফেল মেরেছে। আর তাদেরই-বা করার কী আছে! তাদেরও তো জীবন, জীবনের ভয়! মানুষ দায়িত্বশীল না হলে, কাণ্ডজ্ঞান না

থাকলে– কী করে হয়? নদীর পানিকেই অনেক সময় বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, মানুষের মনকে তো নয়-ই। দায়িত্বহীনতার একটা ঘটনা বলি: বেশ ক-জনের কাছে শুনলাম, তাদের আত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ জানে, তাদের করোনা ভাইরাসের উপসর্গ আছে। তা সত্ত্বেও কাউকে না জানিয়ে অফিসে যাচ্ছে, অন্যান্য কাজ করে বেড়াচ্ছে, লোকলজ্জার ভয়ে বলছে না। অথচ অন্যরা তাদের থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। ইচ্ছে করেই রোগ ছড়াচ্ছে। এই সব মানিক-রতনের সংখ্যা আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য বাড়াচ্ছি। আমার মনে হয় না যে, এদেশ থেকে তাড়াতাড়ি এ মহামারী যাবে। এদেশের মানুষের চরিত্রের বদল অপরিহার্য। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে দেবো, দায়িত্ববোধকে ধ্বংস করে দেবো, আবার দেশ গড়তে চাইব– কীভাবে সম্ভব?

এজন্যই তো প্রতিটা কথার শেষে বলি, দেশ গড়ার ইচ্ছে হলে অবকাঠামো তৈরির সাথে সাথে মানুষ গড়ি। মানুষ না গড়তে পারলে আসলে অবকাঠামোও ভালো করে গড়া যায় না। নীচতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত বালিশ উঠাতেই কয়েক হাজার সরকারি টাকা ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু আমরা, মহারথীরা তো কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। এর পিছনেও কোনো-না-কোনো মতলব আছে। সবই চামচা-চামুণ্ডাদের শিখণ্ডী।

ছোটবেলায় দেখেছি, গ্রামের পাঁচ-সাতজন রাখাল মিলে বাড়ি বাড়ি চাল ও ডিম উঠিয়ে সন্ধ্যায় মাঠে গিয়ে বনভোজন করতো। চাল, ডিম উঠানোর আগে গান গাইতো। গানের শেষের কলিটা থাকতো এরকম: 'গান গাবো আর কত গাবো, গাচ্ছি বাড়ি বাড়ি, এক-আধ পোয়া চাল পেলে চলে যেতাম বাড়ি।' আমারও এদেশের অপ্রশিক্ষিত, দায়িত্বহীন-বিবেকহীন মানুষ এবং তাদের মহারথীদের স্বভাব-চরিত্র, চিন্তাধারা ও বেজুত কার্যকলাপ নিয়ে এত লিখতে ও বলতে বিরক্ত লাগে। জীবনেও ছি ছি ধরে গেছে। এদেশের রীতি-নীতি, চাল-চলন, চলা-বলা একটু জুতসই হলে কলম ঠোকার এ বদভ্যাসটা ছেড়ে দিতাম। শেষ বয়সে এসে আর শত্রু বাড়াতে চাইনে। কার বদদোয়াতে পরকালে না-জানি পুলসিরাতের মাঝামাঝি আটকে থাকি– এটা একটা সন্দেহ। এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার

ত্রাণসামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরণ চলছে, যথাযথভাবে বণ্টিত হলে গরিব মানুষের তো আর অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু তা-কি হচ্ছে? দুর্মুখদের অনেক কথা বলার সুযোগ হচ্ছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের দুর্নীতির কথা পুরোনো গীত। করোনা ভাইরাস টেস্টের নামে হাসপাতাল সিলেকশন, হাসপাতালে 'বালতি টেস্ট' (বালতির মধ্যে নমুনা ফেলে দিয়ে মনগড়া একটা রিপোর্ট দেওয়া), হাজার হাজার কোটি টাকার ভুয়া ব্যবসা– এর সাথে বড় বড় কর্তাবাবুরা জড়িত না থাকলে, রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে, এমনিতে হয় না। পত্রিকায় দেখলাম, 'ভার্চুয়াল আপ্যায়নে লাখ লাখ টাকার বিল...। করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ভার্চুয়াল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্মশালা ও কারিগরি কমিটির সভা করেও আপ্যায়ন বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ৫৭ লাখ টাকা। এসব আয়োজনে অংশ নেওয়া ১২০ জনের জন্য ব্যাগ, ফোল্ডার, কলম ও প্যাড বাবদ ব্যয় এক কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা এবং প্রতিবেদন সরবরাহের নামে আরও দশ লাখ আশি হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। .... সব মিলে এসব ভার্চুয়াল আয়োজনের জন্য খাবারের বিল তোলা হয়েছে মোট সাতান্ন লাখ ষাট হাজার টাকা।' (বিডিনিউজ২৪.কম)।

এবার সামনের কোরবানিতে 'ভার্চুয়াল কোরবানি' দেওয় যায় কি-না সেটা নিয়েও আমি ভাবছি। ছবিতে 'ছবি-গরু' কিনতে ও জবাই দিতে কসাইরা কত লাখ দাবি করবে সেটাও মাথায় আছে। ভার্চুয়ালি খাবার আয়োজন হলে, সরকারি কোষাগার থেকে বিল দেওয়ার ব্যবস্থা হলে, গরুর 'ছবি কোরবানিই'-বা হবে না কেন? ভার্চুয়াল মাংস খাব। ছোটবেলায় কবি গোলাম মোস্তফার 'বনভোজন' কবিতা পড়েছিলাম। তার একটা কলি ছিল এ-রকম: 'বিনা আগুন দিয়েই তাদের হচ্ছে যদিও রাঁধা, তবু সবার দুই চোখেতে ধোঁয়া লেগেই কাঁদা। .... ধুলোবালির কোর্মা-পোলাও আর সে কাদার পিঠে, মিছিমিছি খেয়ে সবাই বলে– বেজায় মিঠে।' এখানে ভার্চুয়াল ব্যাগ, ফোল্ডার, কলম ও প্যাড এবং আপ্যায়ন যত মিছিমিছি হোক না কেন, সরকারি টাকার বান্ডিলটা মিঠে তো লাগারই কথা। এই কপাল-পোড়া জীবনে এদেশে এই পোড়া চোখে আরো কত কী-ই যে দেখতে হবে! ভাবতে গেলেই গা শিউরে ওঠে। এদেশের প্রতিটা পদে পদে কসাই ছড়িয়ে

পড়েছে। আজ দুপুরে টিভিতে দেখলাম, এতটা বছর পর স্বাস্থ্য বিভাগের আরেকটা সুখবর, এত দিন মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের যে খবর বেরোতো– তা না-কি গুজব নয়, সত্য। ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসও না-কি সত্য। আসল লোক ধরা পড়েছে। সারা দেশেই না-কি এদের লোক আছে। বড়কর্তারা তো এতদিন অভিযোগগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন বলার কিছু আছে কি-না? যেসব ছাত্রছাত্রীর জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের জন্য করণীয় কিছু আছে কি-না? মুখে দুর্নীতি দমনের নামে খই ফোটাচ্ছি, আবার দুর্নীতিতে পুরো দেশ ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। আমি নিতান্ত বেহায়া না হলে এত কথা লিখতাম না। 'তবুও দিয়েছো যে-ব্যথা গাঁথতে এ-মালা, সেও তো তোমাদেরই দান; নিয়েছি অঞ্জলি ভরে।'

একটু আগেই আমার এক সহকর্মীর সাথে ফোনে কথা হলো। উনি অনেক বছর মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করেছেন। অনেক এনজিও তার পরিচিত। এদেশের মানুষের দায়িত্বহীনতা ও লুটপাটের কথা হচ্ছিল। এদেশে এনজিওর সংখ্যা কাকের সংখ্যার সাথে তুলনীয়। শুনলাম, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক। কেউ ঋণ দিতে নদীর ধার এলাকায় ভুয়া নামে বাড়ি তৈরির ঋণ মঞ্জুর করে। পরে নদীতে বাড়ি ভেঙে গেছে বলে চালিয়ে দেয়। নদীভাঙ্গন, নদীরক্ষা, নদীশাসন, নদী-খনন, নদী-চুরি ইত্যাদি নানান কিসিমের নানা মিথ্যা(?) রটনা তো এদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে। আজব আজব উদ্ভট উদ্ভাবনী চিন্তার এ জাতি ধারক ও বাহক। সব জায়গাতেই আমাদের সোনার মানুষের বদখাসলতের কথা। আমিও ফোনে প্রত্যুত্তরে বিদ্যুৎ বিভাগের সিস্টেম লস কমানোর আজব-ভুয়া এক তরিকার সন্ধান দিলাম। লুটেপুটে খেয়ে, দাম বাড়িয়ে সিস্টেম লসের ঘাড়ে চাপিয়ে বহাল তবিয়তে বসে বসে মুচকি হাসা। আমার সহকর্মীও তরিকা শুনে মুচকি হাসলেন। কোলকাতার এক কবি লিখেছিলেন, 'রাতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কোলকাতায় আছি।' এত দেখে আমি আর কি-ই-বা লিখবো! ইচ্ছে করছে বলি: মিথ্যা অরাজকতা ভণ্ডামি ইতরামি-ফিকির– যত ফন্দি! হাঁড়ির তলা চেটে-পুটে খেয়ে বড় কষ্টে এখন– লকডাউনে ঘরে বন্দি।

গত পরশু এক সহকর্মী অনলাইন মিটিংয়ে রসিকতা করে বললেন, আজীবন ঘর-সংসারে বড্ড অশান্তি নিয়ে বেঁচে আছি। 'বাইরে করোনা, ঘরে বউ, যাব কোথায়?' প্রত্যুত্তরে এক দ্বিতীয় বউয়ের স্বামী সুরসিক সহকর্মী বললেন, বউটা ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলো– আমি পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ার পেতে বই পড়ছি। বউ এসে অনেকক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ফিরে যেতে যেতে বললো, 'এ আপদ যে কবে দূর হবে।' বুঝলাম না, এ আপদ– আমি, না করোনা।

কথাগুলো শুনে আমিও হাসলাম– সে হাসি মলিন হাসি। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। মাত্র কয়েকটা দিন হলো, আমার একজন শ্রদ্ধেয় সহকর্মী হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল। এ হার্ট অ্যাটাক করোনাতঙ্কের অ্যাটাক কিনা শুনতে পারিনি। সময় দেয়নি। তাঁর মুখখানা ছিল একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। সুশ্রী চেহারা। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। আমার সাথে তাঁর বেশ সখ্য ছিল। নীতিবান চৌকস একজন শীর্ষপর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ট্রেজারার পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার চিরশান্ত মুখখানাও আমার শেষবার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি ছিলেন অফিসে আমার অবসর সময়ের বিবিধ আলোচনার সাথি। তাঁর মৃত্যু আমাকে সাথীহারা করেছে। তিনি জনাব হাবিব আবু ইব্রাহিম। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা।

আমি ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের একটা এলাকায় দু-যুগ ধরে বসবাস করি। বসবাসের জন্য একটা সমিতিও আছে। সমিতির অনেকের সাথে আমার সখ্য। প্রতিনিয়ত চলাফেরা-উঠাবসার মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। করোনা এ সম্পর্কেও হানা দিয়েছে। বেশ ক-জন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। মুখখানাও দেখতে পারিনি। হাসপাতাল থেকে সরাসরি গ্রামের বাড়ির কবরস্থানে নিয়ে গেছে। হাতে গুণে চার-পাঁচজন লোক সাথে। নীরব-নিভৃতে অগোচরে– বলা যায় পালিয়ে অগস্ত্যযাত্রা। এ যাত্রা চারদিকে কী যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে– সেটা মনই ভালো বোঝে। তবে এভাবে যাত্রারও একটা ভালো দিক আছে। তাঁদের সে সদা হাস্যোজ্জ্বল কর্মময় মুখ যখনই মনে হয়, চোখে ভাসে। মৃত-মলিন নির্জীব মুখ কখনোই মনের চোখে আসে না। এতে হাসিমাখা মুখস্মৃতি বয়ে বেড়াতে পারি। এ ভার কষ্টদায়ক বটে, তবে অনেকটা সহজ।

যাবার সময় তাঁরা একটা অব্যক্ত কথা বলে গেছেন। 'তোমরা এ সময়ে যত অসুস্থই হও– এমনকি করোনায় আক্রান্ত হলেও নির্দিষ্ট-করা সরকারি হাসপাতালে এসো না। এগুলো হাসপাতাল নয়, করোনা রোগী ডাম্পিং স্পট। অনেককে এখানে পাঠানো হচ্ছে সিম্পটম দেখে; হয়তো তারা প্রকৃত করোনা রোগী না। সেখানে গিয়ে করোনা রোগীদের সাথে চলতে গিয়ে, একই বাথরুমসহ অন্যান্য কিছু ব্যবহার করতে গিয়ে আরো বেশি আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার এখানে রোগী চিকিৎসার সরঞ্জামও অপ্রতুল, এমনকি অক্সিজেনেরও অভাব– ডাক্তাররাও অসহায়, রোগীরা অবহেলার পাত্র, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।' অনেক রোগী ভর্তি হবার পর পালিয়ে যাচ্ছে। এরও নিশ্চয়ই কারণ আছে। করোনা থেকে বাঁচার চেষ্টা; আবার জীবন বাঁচাতে অবহেলা, অযত্ন, চিকিৎসাহীনতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভতূ বলে পেলাম কাছে' পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটা মুহূর্ত ও পদক্ষেপ আমাকে মৃত্যুর দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মহল্লার কোনো কোনো বাড়িতে করোনা অনেক মধ্যবয়সীদের জীবনও কেড়ে নিয়েছে। আমার চুল-দাড়ি পেকেছে, কোমর কিছুটা নুয়ে গেছে, শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কমজোরি হয়ে গেছে। আর কতদিন! খুব ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে দিনাতিপাত করছি। একটাই ভয়, 'পাখি কখন জানি উড়ে যায়– ঐ বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন জানি উড়ে যায়।'

ক'দিন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যু। মৃত্যু চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। কেউবা হার্ট অ্যাটাকে, কেউবা ক্যান্সারে, কেউবা কিডনি রোগে, আবার কেউবা করোনা ভাইরাসে। সবই আমাদের আবাদি ফসল। আমার চেয়ে চার বছরের বড়, আমার থার্ড কাজিন রেজাউল ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ একটু আগেই পেলাম। সকালেও কথা হলো। দেড় ঘণ্টা পরেই হার্ট অ্যাটাক। প্রথম অ্যাটাকেই শেষ। আরেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে অচেতন অবস্থায় আছেন। অনেক চেষ্টার পর আইসিইউ ম্যানেজ করা গেছে। আমার বাড়িসুদ্ধ কান্নাকাটি। একসাথে কিডনি ও হার্ট ফেইলিউর। করোনা রোগী ছাড়াও অন্যান্য রোগীদের অবস্থাও শোচনীয়।

বাড়ির পাশের এক ক্যান্সার রোগী দুই মাস ধরে ঘুরছেন অপারেশনটাই করাতে পারছেন না। জীবন যায় যায় অবস্থা। আমার এক ভাগ্নে তো করোনায় একটু শান্তিতে অক্সিজেন টেনেও মরতে পারলো না। কষ্ট করে মরতে হলো। জেলা শহরে থাকার দায় তাকে জীবন দিয়ে শোধ করতে হলো। এদেশের স্বাস্থ্যসেবা যে কত অপ্রতুল, না ভুগলে উপলব্ধিতে আসে না। প্রশ্ন আসে, দেশব্যাপী এত জীবনঘাতী রোগ-ব্যাধি কেন? পুরো দেশটাই তো একটা মৃত্যুপুরী। খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, কথায় ভেজাল, কর্মে ভেজাল, ধর্মে ভেজাল, হাসিতে ভেজাল, গোল্ডমেডেলে ভেজাল, চেহারায় ভেজাল, পণ্যে ভেজাল, মান্যে ভেজাল, উন্নয়নে ভেজাল, তথ্যে ভেজাল– কোথায় ভেজাল নেই! শত ভেজালের এই দেশ আজ মৃত্যু উপত্যকা। ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বলে বিশ্বাসও করানো যায় না। এর থেকে মুক্তি কতদূর, তা কেউ জানেও না। ‘শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি, গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিন-রাত জাগি’– তাও এর শেষ নেই। বাস্তব অবস্থা দেখতে হলে যে কোনো একটা হাসপাতালে যেতে হবে। হাসপাতাল তো নয়, যেন একেকটা মাছের বাজার! এই অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে গা-সওয়া হয়ে গেছে। এসব দেখে কখনো আনমনে হেসে ফেলি। অকস্মাৎ চারদিকে তাকিয়ে সম্বিত ফিরে পাই, ভাবি– এই, কেউ দেখে ফেললো না-কি? দুশ্চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নিজের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি– আবার অবস্থা মন দিয়ে অনুভব করি। শ্বাস-প্রশ্বাস টানছি, তাই মনের বিশ্বাস– এখনো বেঁচে আছি। এক ঘণ্টা পর কী হবে জানা নেই, বিশ্বাসও নেই। গত পরশু আমার এক সুহৃদ সহকর্মী অনেক আপন ভেবেই উপদেশ দিলেন, হিসাবপত্র, জমাখরচ, সম্পদ-পরিসম্পদ, দায়দেনা-পাওনা যেখানে যা আছে একটা ডায়েরিতে লিখে ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়ে রাখতে। উপদেশটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমি করেছিও তাই। তবে কাজ ছাড়িনি। যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ চিন্তা আছে, কাজ আছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। কাজ থেকে অবসর নেই।

কিন্তু বাধ সেধেছে আমার সেই স্বপ্ন, যা আমি আগের কোনো এক অধ্যায়ে লিখেছি। গ্রামে একটা শিক্ষা-সেবা কমপ্লেক্স তৈরি করবো– সাধারণ মানুষদের

সুশিক্ষা ও সেবা দেওয়ার জন্য। দলমত নির্বিশেষে সবারই অংশগ্রহণ সেখানে থাকবে। কাজ বেশ দূর এগিয়ে গেছে। আমার অবর্তমানে ছেলে-মেয়েকে সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজের হাল ধরতে বলেছি। অপেক্ষায় আছি– এ দফা টিকে গেলেই হয়। কাজগুলো ভালোভাবে সমাধা করার জন্য প্রতিদিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে– দেখি, কতটুকু বেয়ে যেতে পারি! বারবার পল্লীকবির লেখা সেই কবিতার চরণগুলো মাথায় এসে নাড়া দেয়:

‘ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে,
ম’জিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর।’

দশ

এবার দেশাচার, ধর্মাচার, জীবনাচার, কর্মাচার, মাওলানা-সমাচার নিয়ে দু-কথা বলার ইচ্ছে। জানি এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ ধর্ম ও কর্ম জীবনের অঙ্গ। মাওলানারা (আলেম, শাস্ত্রবিশারদ) মুসলমানদের পির (মুসলিম দীক্ষাগুরু, জ্ঞানবৃদ্ধ)। আমি বিষয়টা এভাবেই দেখতে চাই। আমি এখানে পিরপূজা অথবা পিরতত্ত্ব নিয়ে কোনো বিষয়ের অবতারণা করবো না। এদেশে মৌলভি-মাওলানারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মকে জারি রেখেছেন, ছোটবেলা থেকে কোরআন বুকে নিয়ে বড় হয়েছেন, এ কথা সত্যি। ইসলাম জারি রাখাতে আমার অবদান কম– এটা মানতেই হবে। কেউ আমাকে দেখে নাম না-জানা পর্যন্ত আমি কোন ধর্মের লোক তা বোঝা কঠিন। চেহারা দেখে আমাকে মুসলমান ভাবার কোনো কারণ নেই। আবার এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে স্লোগান হাঁকতে গেলে আমি যাইনে, মৌলভি-মাওলানারাই যান। এদিক থেকে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কাজী নজরুল বলেছিলেন, ‘মৌলভি সা’ব দুনিয়া ভুলে জ্বালিয়ে রাখেন দ্বীনের বাতি।’ দ্বীনের বাতি মৌলভিরা জ্বালান এতে কারোই দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু ‘দুনিয়া ভুলে’ শব্দটাতেই আমার আপত্তি। দুনিয়া আছে বলেই না আখেরাত আছে। দুনিয়া সৃষ্টি না হলে আখেরাত থাকে কী করে? কর্ম আছে বলেই কর্মফল আছে। কর্মের অস্তিত্ব না থাকলে ফল লাভ দুঃসাধ্য। এ নিয়েই কথা। অনেক মৌলভি-মাওলানা এদেশে ফিতনা বাঁধাতে ওস্তাদ। ধর্মরক্ষক এখন ধর্মভক্ষকের ভূমিকায় সক্রিয়। ইসলাম ধর্ম একটাই ধর্ম, একটাই পথ, একটাই পাথেয়– কোরআন ও হাদিস। কোরআন ও হাদিস এখনও অক্ষত আছে বলে, ইসলাম তার স্বমহিমায় ভাস্বর ও দেদীপ্যমান– আলোর মশাল। অথচ সারা বিশ্বে আজ মুসলমানরা শতধা-বিভক্ত, শত-মত, শত-পথ। এদেশেও ধর্মকর্ম ও মাওলানাদের নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কমে যাচ্ছে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ ও শান্তি থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের বড্ড অভাব। এ দায় আমাদের মাথায় নিতেই হবে। সর্বোপরি আমাদের অজান্তে

অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে পরকালে নাজাতের পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জিনিসটা এদেশের ইসলামি চিন্তাবিদদের মাথায় আসছে না। আবার কারো কারো মাথায় এলেও কী করণীয় তা স্থির করতে পারছেন না। তাই ইহকালেও চলে-ফিরে শান্তি উঠে গেছে, পরকালেও কী হবে বোঝা যায়। দুটো কারণে এদেশের শান্তি চলে যাচ্ছে। এক. রাজনীতির দলগুলোর কুৎসিত, জঘন্য ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতা। তারা পরকালের কথা মুখে বলে, হজ করে, কোরআন পড়ে; কিন্তু পুরো চিন্তাধারা আবর্তিত হয়, যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়া অথবা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং সতীর্থদের সমস্ত প্রকার অপরাধ-কর্মে মদদ দেওয়া। মুখে যা-ই বলুক, তারা সুপরিকল্পিতভাবে, জ্ঞাতসারেই এটা করে। তাদের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা পরিষ্কার ধরা পড়ে। সে-সাথে এদেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে কুশিক্ষা দিয়ে বিপথে ও কুপথে পরিচালনা করা। দুই. এদেশের মুসলমানদের 'সিরাতাল মুস্তাকিম' থেকে সরে আসা; এবং মৌলভি-মাওলানাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয়, অদূরদর্শী ঠুনকো বিষয় নিয়ে শতধাবিভক্তি। মানুষকে ইসলাম, কর্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে আবেগ-নির্ভর, অসার, তুচ্ছ ভাবধারার দিকে ঠেলে দেওয়া। ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটা জীবনদর্শন ও সৃষ্টিদর্শন– এর বিশালতা অকল্পীয়। একজন জ্ঞানী ও ভাবুক মনের অধিকারী তার চিন্তাধারার মধ্যে এর বিশালতা অনুধাবন করতে পারেন। এজন্য তাঁকে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনোজাগতিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানে ব্রতী হতে হবে, ইমানদার হতে হবে, কোরআন জানতে হবে। ইসলামি সৃষ্টিদর্শন গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভূমণ্ডল, জীবজন্তু, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তুচ্ছ পিঁপড়ে, কীট-পতঙ্গ– এসবের সৃষ্টি উপাদান এবং অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। ঘোষণা এসেছে এভাবে, 'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' যদি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি না করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এর একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী? এ উদ্দেশ্য কে অনুসন্ধান করবে? আরো ঘোষণা করা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলি রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিজিক (বৃষ্টি) বর্ষণ

করেন, অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'

মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। মুমিন কারা? মুসলমানদের মধ্যে মুমিন পাওয়া যায়, না-কি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খুঁজতে হয়? বুদ্ধিমানদের জন্যও নিদর্শনাবলি রয়েছে। মুসলমানরা আদৌ বুদ্ধিমান কী না? বুদ্ধিমান হতে চাইলে নিদর্শনাবলি খুঁজতে হবে, ভাবতে হবে। মানুষের শরীরতন্ত্র নিয়ে কেউ কি ভেবেছেন? 'মানুষের শরীরের একটি কোষের গঠন একটি বড় শিল্পনগরীর মতই রহস্যময়। নানা ধরনের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও স্নায়বিক সিস্টেম মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের যোগাযোগ রক্ষা করছে। মস্তিষ্কে বা মগজে রয়েছে এমন কিছুর কেন্দ্রীয় কমান্ড ব্যবস্থা।' আমরা এসব নিয়ে ভাবি কী-না?

মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই স্থান দখল করে রেখেছিল। মুসলমানেরা রসায়নবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্ত্র-চিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রপথিক হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছেন। হয়তো আমাদের এসব পড়ে দেখা ও জানার সময় নেই, পির-পূজা, কবর-পূজা, পেট-পূজা ও ফন্দি-পূজা নিয়ে মহাব্যস্ত। বর্তমানে আমরা 'আমিন' কে জোরে বললো, কে আস্তে বললো; নামাজে নাভির উপরে, না বুকে হাত বাঁধতে হবে; সম্মিলিত মোনাজাত হবে, কি হবে না; ক-বার একসাথে বললে বিবি তালাক হয়; কোন পিরের মুরিদ বেশি; কবরপূজায় বেশি সওয়াব, না-কি পিরপূজায় বেশি সওয়াব; মাথা বেশি ঝাঁকিয়ে জিকির করতে হয়, না কি ব্যাঙ-ডাকার মতো শব্দ করে জিকির করা ভালো; কার জনসভায় বেশি দর্শক আসে; সুরা ফাতেহার শেষে 'দোয়াল্লিন', নাকি 'জোয়াল্লিন' পড়তে হবে– এমন অতি হালকা বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি, তর্কাতর্কি, বাহাছ, কখনো মারামারি করছি এবং নিজেদের বিভক্তিকে প্রকাশ্যে আনছি, ভাইয়ের সাথে মনের অজান্তেই প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায় নামছি। এগুলো অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও 'অল্প-বিদ্যা ভয়ংকরের' বহিঃপ্রকাশ। এদেশের খুব

কম ইসলামি চিন্তাবিদ আছেন, যাঁরা এ-নিয়ে ভাবছেন এবং প্রয়োজনীয় কাজটা করছেন। কেউ কেউ হয়তো চেষ্টা থাকলেও পরিস্থিতির সার্বিক জটিলতায় ভূমিকা রাখতে পারছেন না। নতুন একটা উদ্ভট কিছু বলতে পারলেই কিংবা কোনো কিছুতে 'বেদাত' শব্দটা যোগ করতে পারলেই সুর করে, চিৎকার করে, নেচে-গেয়ে বাজার মাত করে দিচ্ছেন। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন ডজনে-ডজন ফন্দি-ফিকিরবাজ মুসলিম লেবাসধারী মৌলভিরা। আমরা ঐকমত্য বুঝিনে, ঐকতান মাথায় আসে না। অথচ আমরা বারবার পড়ছি, বুঝছি, 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

এ পড়াকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছিনে বা আমলে আনছিনে। এদের ইসলামি দর্শন, দেশীয় সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান– এমন কি দেশীয় ভাষা সম্পর্কেও তেমন কোনো জ্ঞান নেই, না আছে কোনো বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু হামবড়া ভাব ও অদূরদর্শিতা। একটা নতুন কিছু বলে বাজার মাত করতে পারলেই কেল্লা ফতে, দামি মাওলানা, অথবা জিন্দাপির– আঁখড়া জেতার চেষ্টা। অথচ তাঁর এ-ধরনের অপ্রয়োজনীয় মতামতে মুসলিম উম্মাহর কী পরিমাণ ক্ষতি হলো, সেটা বোঝার বোধটুকুও নেই। কোনো গভীর চিন্তাভাবনা নেই, গবেষণা নেই– গবেষণার নামটাই হয়তো কখনো পড়েনি, কিংবা পড়লেও পদ্ধতি জানা নেই। ফলে যুবসমাজের চাহিদা মোতাবেক তাদের মনের জিজ্ঞাসার উত্তর ও ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। ইসলাম যদিও একটা 'বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ,' প্রগতিশীল ধর্ম ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা; অধিকাংশ মৌলভিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত, অক্ষম– বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। এরা কোরআন ও হাদিস পড়েছে, প্রয়োজনে মুখস্থ করেছে, বারবার চর্চা করছে– বেহেশতে যাবার জন্য। ভুলেও এর গভীরতা নিয়ে গবেষণা করছে না; বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে তলিয়ে দেখছে না; সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ম ও সিস্টেম নিয়ে বেওয়াকেবহাল। তাই শিক্ষাহারা সাধারণ যুবসমাজ ধর্ম-কর্মটাকে পশ্চাদপদ একটা ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে জানে এবং জীবন পরিচালনায় অশ্লীল, জীবনবিধ্বংসী, জীবননাশী, ভোগবাদী পশ্চিমা জীবনব্যবস্থাকেই সানন্দে বেছে নিচ্ছে এবং অভ্যস্ত হচ্ছে। পশ্চিমা জীবনব্যবস্থায় যে হতাশা ও ভোগবাদ ছাড়া মানবতার মুক্তি নেই– তাও হয়তো জানে না, জানার

চেষ্টাও করে না; ভাবেও না। ফলে, ইহকাল ও পরকাল– দু-দিকেই সংকটে পড়ে। কেউ কেউ সারা জীবন অবৈধ রোজগার ও বিপলু বিত্তবৈভব গড়ে তুলে ভোগ শেষে শেষ বয়সে এসে পাপ মোচনের জন্য একমাত্র পথ– হজপর্ব সমাধা করে, কেউবা তবলিগে নাম লেখায়, হাজি-গামছা ও টুপি পরে জনসমক্ষে ঘুরে বেড়ায়। অতীতের যত অপকর্ম ও অবৈধ রোজগার সব ধুয়ে-মুছে পুত পবিত্র করে ফেলে। সে-সাথে লম্বা দাড়ি রেখে কেউ কেউ আউলিয়া-দরবেশ সেজে যায়। অথচ অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ ও অপকর্মের অনুশোচনা মনকে সদা-সর্বদা পুড়িয়ে মারে, অন্তরের কালিমা মোছে না; সমাজ ও নিজের জন্য মনুষ্যত্ব ও মানবিক মুক্তি আনতে পারে না। মহামূল্যবান জীবনটা বরবাদ করে শেষে পরপারে পাড়ি জমায়। এরই নাম কি মুসলমানের জীবনাচার ও কর্ম? এই কি মানবজীবনের উদ্দেশ্য?

এ ব্যাপারে মৌলভি ও মাওলানাদের করণীয় সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ, পশ্চাদপদ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ফলে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন 'মহান রাজনীতিবিদরা' দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে, মানবিক গুণাবলিকে ধ্বংস করে দিয়ে রাজনীতির ব্যবসা ও দখলদারী শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮৬.৬ শতাংশ। শুনতে রূঢ় ও কর্কশ বা বেখাপ্পা লাগলেও এদেশে মুসলমানের আখলাক ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যা ক্রমশই নগণ্য হয়ে আসছে। বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে ধন্দে পড়ে যেতে হয়; নিজেকে মুসলমান ভাবতে দ্বিধান্বিত হই। আমি আমার জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ নমুনা নিয়ে দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি। এদের কথায় ও কাজে মিল নেই। এরা নামে মুসলমান। দিন যত যাচ্ছে, কথা ও কাজে অমিল ততই বাড়ছে। সমাজেও বিষয়টা একটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। মানুষ তার বিবেক ও মনুষ্যত্ব ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে। যদিও এসব কথা লেখা ও বলা নাজায়েজ। প্রকৃত মুসলমান– নামে নয়, কর্মে ও চিন্তা-চেতনায়, বৈশিষ্ট্যে। সেদিক বিবেচনা করলেও সংখ্যা আরও কমবে বৈ বাড়বে না। শত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একজন মুসলমানকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ও চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে চিনে নেওয়া যাবে– এটাই মুসলমান ধর্মের স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুসলমান এদেশে ক-জন? শিখ ধর্মাবলম্বীদেরও দাড়ি ও পাগড়ি আছে। ইহুদিরাও টুপি পরে। ভারতবর্ষের অন্য ধর্মাবলম্বীরাও অনেক

সময় ঝুলঝোপপুর পোশাক পরে। এদেরকে আমরা কেউ-ই মুসলমান বলিনে। মুসলমান পোশাকে নয়– কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা ও চারিত্রিক গুণাবলির ধারক মুসলমান।

এদেশে মুসলমানদের দলীয় স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। এরা কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক জোট বা গোষ্ঠীর করতলগত। নিজস্ব অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই। হয়তো রাজনীতির এক জোটভুক্ত, নয়তো অন্য-জোটভুক্ত। যেদিকে কিছুসংখ্যক বড় নেতার স্বার্থ, তারা সেদিকে। স্বার্থত্যাগ বলতে কিছু নেই। অন্যভাবে, কেউ পির-তত্ত্বে, কেউ না-পিরতত্ত্বে, কেউবা মাজার-পূজক, কেউবা নাচুনে-ভিত্তিক, কেউ গীত-ভিত্তিক, কেউ বাউল-ভিত্তিক, গাঁজা-ভিত্তিক, কেউবা তরিকা-ভিত্তিক, কেউবা মাজহাব-ভিত্তিক, আবার লা-মাজহাব-ভিত্তিক ইত্যাদি শতধা বিভক্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। কেউ কাউকে ভালো চোখে দেখে না, প্রতিহিংসা করে এবং নিয়মিত মারামারিও হয়। চরদখলের মতো এলাকা দখল, মাঠ দখলে ব্যস্ত। একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও বিষোদ্গারে মত্ত। ইসলামকে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ হাতি হিসাবে গণ্য করা হয়– এরা হাতির শরীর কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও বাদ দিয়ে লেজের চুলের রং নিয়ে মারামারিতে ও বাহাছে নিত্য কর্মশীল। ইসলামের নেতারা এগুলো নিয়ে মহাব্যস্ত থাকাতে মূল ইসলাম এদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য থেকে উধাও হতে চলেছে। তা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই, চিন্তাও নেই। অন্তঃকলহ, জিন্দাপির, উলঙ্গপির, মাজারের মাথাঝাঁকানি থাকলেই এরা মহাখুশি। অথচ এই জিন্দা-পির ও পরলোকগত পির, পিরের দৌহিত্রের পিছনে সারা জনম যত সময় ও সম্পদ ব্যয় করছে, তার অনেক কম সময় ও সম্পদ এবং চিন্তাধারা যদি সরাসরি কোরআন ও হাদিস মেনে খোদার উদ্দেশ্যে ব্যয় করতো, খাসলত বদল করতো, জ্ঞানার্জন করতো, অহংবোধ ছাড়তো, চিন্তাধারার পরিধি বাড়াতো– তাহলে নিজেই খাজা-বাবা না হয়ে খাজা-দাদা হতে পারতো। কিন্তু সে-চিন্তা মাথার মধ্যে বেখবর, চিন্তা-চেতনায় ইহকালের অজ্ঞানতার অতল গহ্বরে তলিয়ে আছে। পরকালের অবস্থা বিধাতাই ভালো জানেন।

শুমারি করে দেখুন তো– এদেশের ক-জন মুসলমানের কথা ও কাজে মিল আছে, ভাবনা ও প্রকাশে মিল আছে? অথচ এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা মুসলমানের থাকা জরুরি। কথা ও কাজে মিল না-থাকা কোনো মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। সাধারণ মানুষ কখনোই তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। এদের প্রতি সৃষ্টিকর্তারও রয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধ। চোখের সামনে অসংখ্য লোককে দেখেছি– নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, একবার কিংবা দু-বার হজপর্ব সমাধা করেছে, সুযোগ পেলেই ওমরাহ পালন করছে; অথচ ঘৃণিত ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারেনি; ভিলেজ পলিটিক্স, গ্রুপ পলিটিক্স ছাড়েনি; মানুষকে শোষণ ছাড়েনি; ব্যবসা করছে, কিন্তু মানুষকে ঠকাচ্ছে; চাকরি করছে, কিন্তু কাজে ফাঁকি দিচ্ছে; চুরি-ডাকাতি করছে; অবৈধ ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে; মোনাফেকি করছে। মোনাফিকের তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে– যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে কিংবা প্রতারণামূলক কথা বলে; ওয়াদা করলে বরখেলাপ করে; এবং আমানতের খেয়ানত করে। মৌলভি-মাওলানারাও ইদানীং দেখছি, মুসলমানদের খারাপ খাসলত তুলে ধরেন না; ভালোপথে আসার আহ্বান জানান না; দোজখের ভয়ও দেখান না। বরং ভালো ভালো কিছু কথা বলে, সওয়াবের কিছু ওয়াজ-নাসিহত করে, পজিটিভ বক্তব্য দিয়ে, রুজি-রোজগারের অংশ নিয়ে, পিঠ বাঁচিয়ে সরে পড়েন। সত্যের সাধক মৌলভি-মাওলানারা ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি ও পরকালের ইবাদতে মশগুল। ইহকালের আশা, মুসলমানদেরকে(?) মুসলমান বানানোর চেষ্টা, সৃষ্টি ও বান্দার প্রতি করণীয় থেকে অবস্থা বেগতিক দেখে সরে এসেছেন। অথচ প্রতিটা মুসলমানের জন্য দুটো করণীয় রয়ে গেছে: সৃষ্টির প্রতি করণীয়; এবং স্রষ্টার প্রতি করণীয়। আমরা সৃষ্টির প্রতি প্রতারণাপূর্ণ করণীয় করছি, কিংবা আদৌ দায়িত্ব পালন করছিনে। স্রষ্টার প্রতি করণীয় নিয়ে আনুষ্ঠানিক মহাধুমধাম– অনেকেই লেফাফাদুরস্ত। সৃষ্টির প্রতি করণীয় না থাকলে ইহকালের চিন্তাধারার উৎকর্ষ ও কর্ম থাকে না। কর্ম ও চিন্তার পবিত্রতা না থাকলে পরকাল থাকে কী করে? ইসলাম দেহের পবিত্রতার চেয়ে মনের পবিত্রতাকে বড় করে দেখে। এদেশীয় মুসলমানদের ক-জন চিন্তা-চেতনায় মনের পবিত্রতা আনতে পেরেছে? জরিপ ও পত্র-পত্রিকায় জীবনাচার ও কর্মের ধরন পড়লে মনের পবিত্রতার বাস্তব চিত্র মনে জাগে কি?

ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলি। ব্যবসা-বাণিজ্য করে রোজগার বৈধ। এদেশে সেটা 'বৈধ' রেখেছি কিনা? অতি বড় জাহাজের ব্যবসা থেকে পান-চুন বেচে খায় এমন ব্যবসায়ী পর্যন্ত অধিকাংশই অবৈধ পথে রুজি-রোজগার করছে। পান বিক্রেতা যে পরিমাণ সুপারি-জর্দা দেওয়া দরকার, তার থেকে কম দিয়ে উপার্জন অবৈধ করছে। মাংসবিক্রেতা আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, কখনো মাপে কম দিয়ে, কখনো পাশে রাখা বাতিল মাংস আপনার অগোচরে মিশিয়ে, কখনো-বা প্রতি কেজিতে আড়াইশ গ্রাম হাড় গছিয়ে দিয়ে অবৈধ উপার্জন করছে। গাড়ির যন্ত্রাংশ বেচতে গিয়ে এক-নম্বর যন্ত্রাংশের জন্য টাকা নিয়ে দু-নম্বর অথবা তিন-নম্বর যন্ত্রাংশ চালিয়ে দিচ্ছে। ওষুধেও নকল ওষধু সরবরাহ হচ্ছে। খাবার খাবেন– দাম নেবে বেশি, গছিয়ে দেবে ভেজাল মাল। রং মিশিয়ে কৃত্রিম ছানা দিয়ে দামী মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। ক্রেতাকে ঠকাচ্ছে বুঝলাম কিন্তু ঐ ব্যবসায়ীদের রোজগার কি বৈধ হচ্ছে? তাদের নৈতিকতা কোথায়? মূল্যবোধ কোথায়? তারা কোন ধর্মের লোক? মসুলমান কোথায়? বেগুনের দোকানে গেলেও সুযোগমতো পচা, কখনো পোকা বেগুন আসল দামে গছিয়ে দিচ্ছে। তা আপনি যতই যাচাই করে নেন না কেন। বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীর মানসিক বিকলতার কথাটা একবার ভেবেছেন কী-না? বড় ব্যবসায়ীরা তো দেশটাই কিনে নিয়েছে। বৈধ ব্যবসায়ী কদাচিৎ পাবেন। প্রায় সবই ধাপ্পাবাজ, প্রতারক, ফন্দি-ফিকির করে, রাজনীতির ধুয়ো তুলে অবৈধ টাকার পাহাড় গড়ছে। সারা দেশে একশ-দু-শো পরিবার এভাবে টাকার পাহাড় গড়লে তার ভার হয়তো-বা এদেশ বইতে পারতো। কিন্তু এ-ধরনের ব্যবসা-নামধারী লুটেরা প্রতিষ্ঠান হাজারে-হাজার বা লাখ লাখ। এদের কোনো নৈতিকতা নেই, শিক্ষা নেই, মূল্যবোধও নেই। প্রকৃতভাবে, কোনো ধর্মও নেই। সবাই তো দেখছে, এদেশের যত বিকারগ্রস্ত মালদার দাগী বিড়াল-তপস্বী আছে, তারা কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের আর্শীবাদপুষ্ট। অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতাদের অর্থের উৎস সন্ধানে এদেরকে পোষে, আবার রাজনৈতিক পদও দেয়। কয়টা কথা বলবো। মুড়ির ব্যবসায়ীও মুড়ির সাথে ইউরিয়া সার মিশিয়ে বেচছে, যা আপনার জীবননাশের কারণ।

এখানে ব্যবসাসংক্রান্ত একটা তথ্য দিই। 'ওয়াল্ড বিজনেস এফিসিয়েন্সি ইনডেক্স' অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবসার দক্ষতা যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের

চেয়েও নীচে। এদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী হাউসগুলো সততা ও দক্ষতা দিয়ে ব্যবসা করে বড় হয় না; বড় হয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক সংযোগ দিয়ে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ার কুটচাল ছাড়া এদেশে টাকার পাহাড় বানানো যায় না। এদেশে বিদ্যমান বাস্তব বিভিন্ন ফন্দি ও কুটচালগুলো সময় পেলে একদিন লেখার ইচ্ছে আছে। এগুলো লিখতে ঝুঁকিও আছে।

এদেশে যে কোনো চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের থেকেও মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য দূরে সরে গেছে। অনেকেই অতি অল্প সময় দিয়ে বেশি লাভ করার মতলবে ব্যস্ত। আবার কারো সাথে কোনো ভালো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেই দেখবেন, অন্যের কথা বাদ দিয়ে অনেকেই নিজের ঢোল নিজেই এমনভাবে পেটাবে যে, আপনার কান ঝালাপালা ধরে যাবে। নিজের কাছেই খারাপ লাগবে, অনুতপ্ত হবেন এই ভেবে যে, কেন কথাটা বলতে গেলাম। এটা চলতি ফ্যাশন। শিক্ষকতা পেশাতেও তা চলে এসেছে। জাত শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কর্তার কাছে নিজের গুরুত্ব কীভাবে বাড়াতে হয়, বিভিন্ন চটকদার প্রসঙ্গ তুলে কথার মাধ্যমে তা অনেকেই আত্মস্থ করেছে। কিন্তু নৈতিকতা ও মূল্যবোধের খুবই অভাব। উপার্জন বৈধ হলো, কী হলো না, তা বিবেচনায় আনে না। যা করেছে তা-ই অনেক করেছে– এই ভাবখানাই দেখাতে চায় ও ভাবাতে চায়। কোনো দায়িত্ব-বোধই নেই, অথচ 'সহি-সাচ্চা' মুসলমান, হজও করেছে। আত্মবিশ্লেষণ নেই, বিশ্লেষণ করার জন্য ন্যূনতম বিবেকবোধও নেই। বছরের পর বছর নামাজ পড়ছে, রোজা রাখছে– মুসলমানের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হচ্ছে না। এ-ধরনের দায়িত্বহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নীতিহীন লোভী শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী কী-ই-বা শিক্ষা নেবে!

এদেশীয় মৌলভি-মাওলানাদের অনৈক্যের আরেকটা কারণ আছে। অধিকাংশ মাদ্রাসাপড়ুয়া– বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা মাদ্রাসার নামে, এতিমদের নামে পথে-পথে, বাড়িতে-বাড়িতে, দুয়োরে-দুয়োরে হাত পেতে খয়রাত (ভিক্ষা, দান) নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এতে ছোটবেলা থেকেই এদের আত্মমর্যাদা বলতে কিছুই থাকে না। আত্মসম্মানে বলীয়ান হতে জানে না। তাই এরা বড় হয়ে অন্যের দান নেওয়া এবং অন্যের গলগ্রহ হয়ে বাঁচতে বেশি পছন্দ করে। মনটাও

ছোট হয়ে যায়। এরা কোরআন ও হাদিস মুখস্থ করে। বহিজগগৎ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই রাখে না। বিশ্লেষণ ও গবেষণার ধারেকাছেও যায় না। অঙ্ক করে না– তাই বিশ্লেষণমুখী চিন্তাধারাও থাকে না। মানুষকে আল্লাহর পথে নিতে গেলে যে ভালো বাংলা ভাষা জানা দরকার– সেটাও শেখে না। সমাজকে বোঝে না, মনোবিজ্ঞান পড়ে না। আরবিবিদ্যা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগিরি, মসজিদের খেদমতকার এদের প্রধান পেশা। এদের মধ্য থেকে কোনো বড় পদে গেছে– সংখ্যা খুবই কম। ইসলাম একটা ধর্ম, এটা তো কোনো পেশা না। এরা এটাকে পেশা বানিয়ে ছেড়েছে। অনেক ছোট ছোট পদে কাজ করে এরা জীবনে টিকে আছে। এদের কোনো আত্মবিশ্লেষণও নেই। অন্যান্য বড় বড় পেশা ও পদে যাবার মন-মানসিকতাও নেই। দাখিল মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদেরও দেখেছি। এদের অধিকাংশই ইসলামের ইতিহাস অথবা আরবি বিষয়ে পড়াশোনা করে। বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, ব্যবসায়-শিক্ষার মতো অন্যান্য শত শত বিষয় কাদের জন্য রেখে দেয়?

একটা ঘটনা বলি: এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমাকে ফোন দিলেন। আমার নিকটতম এক আত্মীয়র ছেলের জন্য চাকরি জোগাড় করে দিতে বললেন। ছেলেটার কথা আগেও শুনেছি। খবু মেধাবী এবং ভদ্র। কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে। এখন একটা চাকরি খুঁজছে। একটা মাদ্রাসায় পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করে। পোষাচ্ছে না। বাপ-মা ছেলেকে বিয়ে দিতে চায়। গ্রামের একজন দিনমজুর মাসে বারো হাজার টাকা রোজগার করে। বারবার ভাবছি, কোথায়, কী পদে চাকরির সন্ধান করবো, তার কি কাজ করার যোগ্যতা আছে? কোরআন শরিফ পড়তে পারে, হাদিস জানে এটা তো কোনো পেশাগত যোগ্যতা নয়। প্রত্যেক মুসলমানের এটা জানা দরকার ও অনেকেই জানে। এটা দিয়ে তো কোনো পেশা চলতে পারে না। সবাই যদি কওমি পাস হুজুর হয়ে বসে থাকে তো গাড়ি চালাবে কে? ট্রাক, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাববিদ? আমলা, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, মহাকাশ বিজ্ঞানী, ঠেলাগাড়ির চালক, উকিল, ব্যারিস্টার? আরো অন্যান্য শত শত পেশা?

বিশ্বে শিল্পপণ্যের দ্রুত রকম পরিবর্তন হচ্ছে। কৃষিপণ্যেরও তাই। সাথে এসেছে জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। মরুপথে এখন আর কেউ উটকে একমাত্র বাহন হিসেবে গণ্য করে না: চলে দ্রুততম গাড়ি হাঁকিয়ে, কিংবা প্লেনে। দেশ শাসন করে না খেজুর গাছের তলায় বসে। কৃষিকাজ ছোটবেলায় যেভাবে দেখেছি এখন আর তা নেই। আগের লাঙ্গল-গরু অনেকটাই উঠে গেছে। এসেছে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর। ছোটবেলায় যে ধানের রকম দেখেছি, এখন তাও নেই। নতুন সৃষ্টি ক্রমশই জায়গা করে নিচ্ছে। সবকিছুই হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে। অনেক শিল্পপণ্য জীবন-যাপনকে সহজ করে দিচ্ছে, কোনোটা জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্য আনছে। এসব বিষয়ে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো:

একজন ব্যক্তি কওমি মাদ্রাসায় বেশ কয়েক বছর পড়ে কোরআন ও হাদিস ভালোমতো শিখেছেন– নাম সেলিম। সবাই মাদ্রাসার সেবা করতে চায় বিধায় কাজ নেই। বাধ্য হয়ে একটা বড় কোম্পানির নিম্নপদে চাকরি নিয়েছেন। বড় বড় অফিসাররা কাজ করেন; উনি পিছনে হাত বেধে দাঁড়িয়ে থাকেন– কখনো নাস্তা প্রস্তুত করে দেন, চা বানিয়ে খাওয়ান ইত্যাদি। মাসে বেতন সর্বসাকুল্যে আট হাজার টাকা। কিছু ওভারটাইম পান। অতি কষ্টে জীবনযাপন করেন। এই কষ্ট তাঁর জীবনসাথী হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। বড় মেয়েটার একদিন পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়ায় কাজ হলো না। অনন্যোপায় হয়ে পাশের একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। মেয়েটার কষ্ট দেখে বাপের চোখে পানি চলে আসছে। ডাক্তার সাধারণ কিছু পরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন, এপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, এখনি অল্পকিছু যন্ত্রপাতি এবং অনেক ওষুধ কিনতে হবে, রোগীকে তাড়াতাড়ি অপারেশন করাতে হবে। ডাক্তারদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র হাতে সেলিম মিয়া ছুটলেন ওষুধের দোকানের দিকে। কয়েক হাজার টাকা পকেট থেকে বের হয়ে গেল। সেলিম মিয়া ব্যবস্থাপত্রটাও পড়তে পারেন না। পড়তে পারলে হয়তো বুঝতেন, মেয়েকে অপারেশনের জন্য যে ছুরিটা তিনি বেশ টাকা ব্যয় করে কিনলেন, তার গায়ে লেখা আছে 'মেইড ইন সুইজ্যারল্যান্ড'। দোকানি যা দিলেন, নিয়ে চলে এলেন। অপারেশন হলো। তিন দিনে মেয়েটা অনেক সুস্থ বোধ করতে লাগলো। বাপ-মার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

খোদাকে ধন্যবাদ দিলেন। নফল নামাজও পড়লেন। দু-হাত তুলে খোদার কাছে মোনাজাত করলেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।' (সুরা বাকারা: ২০১)। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, দুনিয়ার কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? তার পদ্ধতিই-বা কী? আখেরাতের কল্যাণের আগেই-বা দুনিয়ার কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

এ বিষয়ে আমার আরো কয়েকটা কথা আছে। আমার যতটুকু জানা, চিকিৎসা নেওয়া ও ওষুধ খাওয়া সুন্নত। রুজি-রোজগার ও বৈধ কোনো কাজের জন্য পেশা বেছে নেওয়াও সুন্নত। সেলিম মিয়াকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি বিধর্মীদের তৈরি ছুরি দিয়ে মেয়ের অপারেশন করালেন কেন? এর মাসআলা কী? সেলিম মিয়া তো পিঠে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে জানেন। কেউ ডাক্তার না হলে মেয়ের এ চিকিৎসা কে করাবেন? খোদাতায়ালা তো সেলিম মিয়াকেও মেধা ও প্রতিভা দিয়েছিলেন, তিনি ডাক্তার হবার চেষ্টা করেননি কেন? চেষ্টা করা কি না-জায়েজ ছিল? সেলিম মিয়া কি চেষ্টা করলে এ-দেশে ছুরি তৈরির একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারতেন না? কিংবা তিনি টেকনিক্যাল কাজ শিখে ঐ ইন্ডাস্ট্রিতে বড় পদে কাজ করতেন। ছুরি তৈরি করে মানুষের উপকার করতেন, আবার বেতনও অনেক বেশি পেতেন। সবাই যদি কওমি মাদ্রাসায় পড়ে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেমিস্ট হবেন কে? ওষধু কোম্পানি চালাবেন কে? ওষধু প্যাকেটে ভরা ছিল, যা প্রেস থেকে ছাপানো হয়। প্রেসের মেশিন আবিষ্কার করবেন কে? প্রেস চালাবেন কে? সেলিম মিয়া কোরআন-হাদিস পড়া ছাড়াও সাধারণ শিক্ষা শিখে প্রেসের বড় ম্যানেজার হবার চেষ্টা করেননি কেন? কোরআন-হাদিসে এসব কাজ করা নিষেধ আছে কি-না? যে নার্স তাঁর মেয়েকে সেবা-যত্নে সুস্থ করে তুললো, সেলিম মিয়া তাঁর মেয়েকে নার্সিং পেশাতে দিতে চান কি না? ডাক্তারি পেশা চালাতে গেলে অনেক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখতে হয়, দামি বই পড়তে হয়। কওমি মাদ্রাসায় পড়ে কেউ কোনো মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ইচ্ছা করেন কি না? মেডিক্যালের বই লেখেন কি না? না-করে থাকলে দুনিয়া চলবে কীভাবে! সেলিম মিয়া যে ফোনটা ব্যবহার করে বারবার যোগাযোগ করছেন, এটা তৈরি করবে কে?

ফোন কোম্পানির উচ্চপদস্থ মার্কেটিং ম্যানেজার হবেন কে? মেয়েটাকে একটা উন্নত বেডে শুইয়ে রেখে অপারেশন করা হয়েছিল। বেড ইন্ডাস্ট্রির মালিক হবেন কে? রুমটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কি এসি মেশিন আবিষ্কার করতে পারবেন? রোগীর খাবার পরিমিত হবার জন্য একজন ডায়েটিশিয়ান থাকা দরকার। সেলিম মিয়া পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তসবির মাধ্যমে এবাদত করতে থাকলে ডায়েটিশিয়ান হয়ে কাজের মাধ্যমে এবাদত করবেন কে? মেয়েটার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করানো হলো। মাইক্রো-বায়োলজিস্ট হবেন কে? বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন কে? ট্যাক্সিতে করে মেয়েটাকে বাসা থেকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ট্যাক্সির আবিষ্কারক হবেন কে? বড় বড় হাসপাতাল গড়বেন কে? গবেষণাগারে গবেষণা করবেন কে?

সেলিম মিয়া আট হাজার টাকা মাসিক বেতন পান; পেশাগত দক্ষতা দেখিয়ে আশি হাজার টাকা, আট লক্ষ টাকা বেতন নিতে পারছেন না কেন? খোদাতায়ালা তো তারও মেধা ও প্রতিভা দিয়েছিল। তিনি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টি ও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেননি কেন? আপনার মোনাজাতের 'আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো' কথার কর্মসূচি কোথায়? মোনাজাতের প্রয়োগ কোথায়?

শুধু কোরআন ও হাদিসটা পড়লেন; দুনিয়ায় চলতে গেলে মানুষ ও তার সৃষ্টির জন্য যা যা দরকার, শিখলেন না কেন? এসব নিয়ে ভাবলেন না কেন? একজন অমুসলমান কিংবা নামে মুসলমান আপনাকে নিয়ে ভাবছেন এবং মানুষের সেবায় কাজও করছেন। তাই তারা আপনাকে সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে, আপনি দুনিয়ার স্বাধীনতা হারিয়েছেন। অন্যের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। আপনি কখনো নিম্নপর্যায়ের কর্মচারী, কখনো মাদ্রাসার ঝাড়ুদার, কখনো-বা মিলাদ পড়ে, দোয়া খায়ের করে, ধর্মসভা করে জীবন-জীবিকা অর্জন করছেন। কখনো-বা তসবিহ তেলাওয়াত করে জান্নাতুল ফেরদাউসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর কয়টা হুর পাবেন তসবিহ দিয়ে সেটা গুনছেন। সৃষ্টির সেরার মাধ্যমে স্রষ্টার ইবাদত করায়

ইসলামে কোথাও বাধা আছে কি না? খোদার দেওয়া মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে পৃথিবীকে জয় করা যায় কি না? সেটাও আপনার ইবাদত। ভালো কাজের দৃষ্টান্ত রেখে সৃষ্ট-জীবের আস্থা অর্জন করুন। খোদার সন্তুষ্টির নিয়তে সৃষ্টির সেবা করুন। ইহকালের কর্মের মাধ্যমে পরকালের মুক্তির জন্য চেষ্টা করুন। সবাই কওমি মাদ্রাসায় পড়ে শুধু তসবিহ তেলাওয়াত করা আর হাত পিঠে বেঁধে ঘুরে বেড়ালে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাওহিদ-রিসালাত-আখিরাতকে ঠিক রেখে যে কোনো পেশাকে বেছে নিতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'হালাল কামাই করার চেষ্টা করা সব ফরজের পর ফরজ।' মানুষের হালাল কামাই ফরজ করার জন্য যেসব বিদ্যা শিখতে হয় তা সরাসরি ফরজ না হলেও পরোক্ষভাবে ফরজ। 'এসব বিদ্যা শেখা বেহুদা কাজ নয়।' মানুষের ও সৃষ্টির সেবা দেওয়ার জন্য যত রকমের পেশা দরকার সেসবের বিদ্যা পরোক্ষভাবে তাদের ওপর ফরজ, যারা ঐসব পেশা গ্রহণ করেন। মনে রাখা দরকার, সৃষ্টির সেবাই স্রষ্টার সেবা।

মানুষের কল্যাণে খোদাতায়ালা সমগ্র প্রকৃতি ও সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করবে, বৈধ পন্থায় সৃষ্টির রস অস্বাদন করবে, প্রকৃতিকে ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে এবং সুখী-সমৃদ্ধ জীবনে আল্লাহর নিয়ম-কানুন পালন করবে– এটাই ইসলাম ধর্মের মূলকথা। যত তাড়াতাড়ি কর্মচ্যুত ও সমাজচ্যুত মুসলমানদের এ বোধোদয় ফিরে আসে, ততই মুসলমানরা এ বিশ্বের মূল চালিকাশক্তি এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সাফল্য ফিরে পাবে।

কোরআন-হাদিসের শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন পেশায় সুশিক্ষিত হয়ে কোনো কাজে গেলে পেশার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ মানুষ ও দেশ ভালো সেবা পাবে। দেশে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।

আমার জীবদ্দশায় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য ইসলামি বিদ্যায় পারদর্শী স্কলার দেখেছি। প্রত্যেকেই তার নিজ পেশায় আছেন। ভালো লেখাপড়া জানেন। উচ্চ-শিক্ষিত, জ্ঞানী। ধর্মটাকে তারা পেশা হিসাবে নেননি। মুসলমান– তাই ধার্মিক। ইসলামি বই পড়েন, কোরআন ঘাটেন জ্ঞানান্বেষণের জন্য। ভাষা জানেন, সমাজবিজ্ঞান জানেন– মানুষকে বোঝাতে পারেন, অহংকার নেই, তুলনামলূক

বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে, দূরদর্শিতা আছে, সহনশীলতা আছে। সততা আছে– নেই কথায় কথায় বাহাস করার মনোভাব, তুচ্ছ বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার ইচ্ছা, আছে মুসলমান ভাই ভাই– এই সহমর্মিতা। নেই কোনো দলবাজি, নেই কোনো মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির মানসিকতা। এরাই এদেশের ইসলামের সম্পদ।

মুসলমানরা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে যেসব নিয়ে বাহাস করে, মারামারি করে, একজন অন্যজনের কাজকে বেদাত বলে ঘোষণা দেয়, বিষবাণে বিদ্ধ করে– এর কোনোটাই 'ফরজ' বিষয় নয়, এগুলো বাদ গেলেও মূল ইসলামের বড় কোনো ক্ষতি হয় না। এর মূল কারণ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর, সুশিক্ষার অভাব, গোঁড়ামি, পরমত সহিষ্ণুতার অভাব।

আমি মাদ্রাসা বলতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বুঝতে চাইনে; বরং শুধু 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' বুঝতে চাই। এদেশের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ লেভেলের সমস্ত শিক্ষাকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করে পড়াতে হবে, অথবা কওমি মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসাকে স্কুল ও কলেজে রূপান্তরিত করে পড়াতে হবে। পাশাপাশি দুটো একসাথে চলতে পারে না। মাদ্রাসায় কোরআন, হাদিস পড়ানো হচ্ছে, স্কুলেও অন্যান্য বিষয়ের সাথে কোরআন, হাদিস পড়ানো যেতে পারে। অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রী তার ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারবে। ইসলামে পুরোহিত প্রথা থেকে সরে আসা বাঞ্ছনীয়। ইসলামি পুরোহিতরা আধুনিক শিক্ষা থেকে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মাদ্রাসাভিত্তিক কওমি শিক্ষার নামে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এতে এ উপমহাদেশে মুসলমানরা আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষায় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কওমি মাদ্রাসা-পড়ুয়া অগনিত ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি, তাদের প্রতিভা ও মেধা আছে; অথচ মেধার বিকাশ নেই। অধিকাংশই বেকার অথবা ছদ্ম-বেকার জীবনযাপন করে জীবন পার করছে। এ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ এদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষাসহ অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চলতে পারে। তারপর নবম ও দশম শ্রেণিতে যেমন শাখাভিত্তিক পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে– সেভাবে বিজ্ঞান শাখা, মানবিক শাখা, ব্যবসায় শাখা এবং ইসলাম-শিক্ষা শাখা থাকতে পারে।

প্রত্যেকেরই সাধারণ শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ থাকা দরকার। ইসলাম শিক্ষা সম্বন্ধে সব ছাত্রছাত্রীর একটা ভালো ধারণা এবং শিক্ষা থাকার কারণে, দেশে ধর্মান্ধতামুক্ত সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়বে। আবার পুরোহিত প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার কারণে বেকারত্ব কমবে। প্রত্যেকেরই টেকনিক্যাল শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচন করে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে। এভাবে আমরা সুশিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারি। এটা সত্য যে, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত লোক তৈরি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেখানে কোনো ধর্ম নেই সেখানে কোনো নৈতিকতা নেই; যেখানে নৈতিকতা নেই সেখানে কোনো শিক্ষা নেই– এটা মানতেই হবে। শিক্ষিত লোক যদি কোরআন ও হাদিস বুঝে পড়েন, তা নিয়ে ভাবেন, কথা বলেন ও লেখেন; ইসলাম তার পূর্ণ মর্যাদায় এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি স্কুলের শিক্ষাতেই কোরআন ও হাদিসের পাশাপাশি বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শেখানোর পক্ষপাতী। এছাড়া ছোটবেলা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত করানোর ঘোর বিরোধী। এর সুদূর প্রসারী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরও আধুনিক টেকনোলজি সমৃদ্ধ টেকনিক্যাল জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলা দরকার। তারা যেন শুধু নামাজ পড়ানো, আজান দেওয়া, মিলাদ পড়া ইত্যাদি ধর্মীয় পেশায় না-থেকে জীবনমুখী পেশায় কাজ করতে পারে। উচ্চ-পেশায় চাকরিতে যেতে পারে; ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর পরিসরে চিন্তা করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সহাবস্থান করতে পারে। সে-ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার। মূলত তারা যেন ধর্মকে পেশা হিসেবে না নেয় এবং ধর্মকে কবরপূজা, পিরপূজার দিকে ঠেলে না দেয়– সে চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে জাতির মঙ্গল ও ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে।

ধর্ম এদেশে অধিক পরিমাণে লৌকিকতাসর্বস্ব হয়ে গেছে। বর্তমানে মসজিদ সেকিউলারপন্থী (নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ) লোকদের দখলে চলে যাচ্ছে। সেখানেও কোনো কোনো নাস্তিকের জন্য জোর করে যৌথ মোনাজাত আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মটাও রাজনীতির দখলে চলে

যাচ্ছে। রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে না টেনে ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখাই সমীচীন হবে। যারা রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ঠুকছে, তাদের কাছে ধর্ম-অধর্ম ভাবনা বিবেচনায় নেই। রাজনীতির মঞ্চ এবং কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের মঞ্চ এক নয়। অধিকাংশ রাজনীতিবিদের কাছে ধর্মটা একটা লোক দেখানো কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। তারা ভোট, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি নিয়েই মহাব্যস্ত। এজন্য ধার্মিক লোকের সংখ্যা রাজনীতিতে অনেক কম। বর্তমানে কুল ও শ্যাম একসাথে রাখা মহাদায় হয়ে গেছে। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের উপর সমর্থন থাকলে তাতে দোষের কিছু নেই; তবে মাথায় রাজনীতির ফেটা বেঁধে আগে আগে যাওয়া তাদেরই সাজে, যারা এখান থেকে রুজি-রোজগার করে ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। তবে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, লৌকিকতাসবর্স্ব-ধর্ম থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে প্রায়োগিক ধর্মীয় শিক্ষা আনার কোনো বিকল্প নেই। এতে শিক্ষায় আদর্শ ও নৈতিকতা ফিরে আসবে।

মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়তে হলে শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে আনতেই হবে। শিক্ষায় ধর্ম না থাকলে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব থাকে না। নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বহীন শিক্ষা মানুষকে বুদ্ধিমান পশুতে পরিণত করে। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাতে মানবিকতা ও নৈতিকতা এনেছে। তা সে যে ধর্মশিক্ষাই হোক। এই ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে পুরো শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করে বামপন্থি বিশ্ব-রাষ্ট্রনায়করা বিশ্ব-রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এটা তাঁরা না বুঝলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হিসাব কষে বুঝেছেন। বাম রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেক কিছুই ভালো ছিল, যা ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদ তো আর নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব উপহার দিতে পারে না; তাই বাম রাজনীতি বিলীন হতে চলেছে। মোদ্দা কথা হলো, শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধর্মেরই হোক প্রায়োগিক দিকের চর্চা থাকতে হবে। নইলে সে শিক্ষা হবে কুশিক্ষার নামান্তর। আর ইসলাম যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মানবিকতা এবং পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে যত শ্রেষ্ঠ গুণ দরকার সবকিছুই ধর্মের গণ্ডিতে এনেছে; সুতরাং ইসলাম ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা চলতেই পারে না; তা যে নামেই শিক্ষাব্যবস্থায় থাক না কেন। ঐশী বাণীর প্রথম কথাই ছিল, 'পড়ো তোমার

প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' সেজন্য স্রষ্টাকে অস্বীকার করে কোনো লেখাপড়া বা শিক্ষা নেই। আরো বলেছেন, 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। শিক্ষা দিয়ছেন মানুষকে যা সে জানতো না।' এরপর বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না যে, 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়।' সেজন্য নৈতিকতা, মানবতা ও শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য।

আগেই বলেছি যে, এদেশের সমকালীন সমাজব্যবস্থায় ধর্মপালন অধিক পরিমাণে লৌকিকতাসর্বস্ব হয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ধার্মিক লোকদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি আসতে হবে। নিজের বিবেক-শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যের সন্ধান করতে হবে। হাতির লেজের চুলকে নিয়ে মারামারি না-করে হাতির অস্তিত্বকে নিয়ে ভাবতে হবে। গবেষণা করতে হবে। হাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আত্ম-অহমিকা, সবজান্তা ভাব পরিহার করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করতে হবে। সারা বিশ্বের ভালো ভালো পদে আসীন থাকবে মুসলমান– মেধার বলে, যোগ্যতার বলে, চিন্তাধারার উৎকর্ষের বলে, শিক্ষার বলে, মুসলমানি বৈশিষ্ট্যের বলে। তারা বিবি তালাকের বয়ান দেবে না, 'আমিন' কে জোরে বললো, কে আস্তে বললো, এ নিয়ে ভাববে না, হাতাহাতি করবে না। বিশ্বপরাশক্তির প্ররোচনায় পিঠে বোমা বেঁধে ভাই হত্যার চেষ্টা করবে না। তারা আদর্শে ও জ্ঞান-গরিমায় হবে সাচ্চা মুসলমান, যাদের আল্লাহর প্রতি থাকবে পূর্ণ ঈমান এবং চারিত্রিক মাধুর্যে হবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

কোনো কোনো ধর্মে মন্ত্র পড়তে হয়। যদিও মন্ত্রের অর্থ কালেভদ্রে কেউ জানে– বাকি সবাই অন্ধবিশ্বাসের উপর চলে। মূল ধর্মগ্রন্থ পড়তেও জানে না, পড়েও না। কোনো একটা বিশেষ পক্ষের আধিপত্য সেখানে, ধর্মটা তাদেরই দখলে। উপ-ধর্মগ্রন্থের কথিত কাহিনীর উপর পুরোপুরি নির্ভর করে ধর্মপালন, বিশ্বাস ও ধর্মাচার। আমাদের বাঙালি সমাজের আরবি না-জানা, অর্থ না-বোঝা, বাংলা অর্থ দেওয়া আছে সেটাও না-দেখা অসংখ্য ধার্মিক লোকের অবস্থাও মোটামুটি তাই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মসজিদে খুতবা শুনছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছে, আরবিতে কী বলছে নিজেই জানে

না, বোঝেও না। কথাগুলো নিজে মন থেকে না বুঝলে নামাজে মন বসে কীভাবে? শুধু ভক্তি দিয়ে তো আর মন বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না!

আবার একটা গল্প বলি: আমার পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতা হচ্ছে। আমি বললাম, ভাই সত্যি করে বলুন তো– এখন যে নামাজ পড়ে এলেন, নামাজের মধ্যে কী ভাবছিলেন? সে-ভদ্রলোক জানালা-দরজার গ্রিল তৈরির ব্যবসা করেন। বললেন, আর সে-কথা বলেন না! আজ এক খরিদ্দারের সাথে তুমুল কথা কাটাকাটি। মন থেকে ভুলতে পারছিনে। নামাজের মধ্যেও সে-কথাই ভাবছিলাম। সব সময় নামাজে দাঁড়ালেই বিভিন্ন বিষয় মনে আসে। কাউকে বলাও যায় না, অথচ ভাবি। মন তো স্থির থাকে না, দুনিয়ার ঝামেলা নিয়েই ভাবনা আসে– দুনিয়াদারি করি।

আমি লোকটাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। সোজাসাপটা স্বীকারোক্তির জন্য তার কথার প্রতি বিশ্বাস এলো। ভালো লাগলো, নামাজের মধ্যে ভাবলেও তার পেশা নিয়ে ভাবছে, হালাল রুজি নিয়ে ভাবছে। আরো মনে হলো– কেউ কেউ তো নামাজের মধ্যে রিলিফ চুরি, গরিবের টাকা মেরে খাওয়া অথবা রাজনৈতিক মারামারির ফন্দি-ফিকির নিয়ে ভাবছে, অন্যকে ল্যাং মারার কৌশল নিয়ে ভাবছে, কিংবা হাসপাতালে এক টাকার যন্ত্রপাতির সরবরাহ করে বিশ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেখাতে গেলে কাকে কতো টাকা দিতে হবে– তার ফন্দি-ফিকির নামাজে দাঁড়িয়েই করছে। মনের কথা তো কেউ-ই প্রকাশ করে না। তাদের নামাজের মূল হকিকত (বাস্তব সত্য) ও ফজিলত (মর্যাদা, মাহাত্ম্য) কী? সৃষ্টির প্রতি করণীয় ও স্রষ্টার প্রতি করণীয়– না বুঝে যুগের পর যুগ জায়নামাজে কপাল ঘষে কপাল কেলিয়ে ফেলার (খোসা ছাড়ানো, ছাল তোলা) মাহাত্ম্য কী? ইসলামের ধ্বজাধারী এসব বর্ণচোরা কপট ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ধর্মের কলঙ্ক। এদেরকে দিয়ে ইসলাম প্রতি-পদক্ষেপে অবমূল্যায়িত হচ্ছে। ইসলামকে এদের দায়ভার বহন করতে হচ্ছে।

এই যে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো গোপনে মুসলমানদের দিয়ে দল তৈরি করছে, তাদেরকে অস্ত্র-অর্থ-রসদ সরবরাহ করে অন্য মুসলমানদের হত্যা করছে–

তারপর কোনো একটা কারণ দেখিয়ে তাদেরকে আবার বিচারের কাঠগড়ায় আনার নামে মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। মোটের উপর কোটি কোটি মুসলমান মারা পড়ছে, ধ্বংস হচ্ছে, বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এই মুসলমানরাই তো অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। এরা নামাজ পড়ছে, অন্য মুসলমানকে ধ্বংসের জন্য দোয়া পড়ছে। এরা মুসলমান সমাজকে কলঙ্কিত করছে। সমাজে এই যে কপট (মুনাফেক)– সাধু (মোমিন, দীনদার, মুত্তাকি) একসাথে গুলিয়ে যাওয়াতে জগাখিচুড়ি পাকিয়েছে। 'কে সাধু, কে শয়তান– কিছুই বোঝা যায় না, দেখেশুনে তাই করো না যাচাই, মুখ দেখে ভুল করো না মুখটা তো নয় মনের আয়না' ইত্যাদি সতর্কবাণী– কখনো কবিতায়, কখনো গানে, কখনো-বা ধর্মগ্রন্থে এসেছে।

এক্ষেত্রে আমি বিষয়টাকে ভিন্নভাবে ভেবেছি। প্রক্রিয়াটা খুবই সহজ-সরল। নামাজে দাঁড়িয়ে নিয়তের পর এবং তাকবিরে তাহারিমা ও হাত বাঁধার পর আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশ ছাড়া নামাজের বাইরের সব ধরনের চিন্তা-কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথে যেন মনের গভীরে মাতৃভাষায় জেগে ওঠে 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।' অতঃপর ভাবতে হবে আমি খোদার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যা করছি খোদা দেখছেন, আমি যা বলছি খোদার উদ্দেশ্যে বলছি। 'সানা' পড়ার সময় মনে মনে বাংলা অর্থটা ভাবতে হবে। একটা 'সানা'-র অর্থ এ-রকম– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে, আর তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই।' এভাবে আরবির সাথে সাথে বাংলাটা বুঝে নিয়ে যদি মনের মধ্যে ভাবা যায়, তাহলে মনটা আল্লাহর দিকে রুজু (ফেরা, প্রত্যাবর্তন) হতে বাধ্য। সেভাবে, 'বিসমিল্লাহ' বলে সুরা ফাতেহা বুঝে অর্থসহ প্রতি রাকাতে একবার পড়লে মনের কালিমা কোথায় যে ধুয়ে-মুছে চলে যায় তার কোনো ইয়ত্তা (সীমা) থাকে না। কেননা আরবির মতো জটিল ভাষায় সুরা ও দোয়া মুখস্থ করতে পারলে, মাতৃভাষায় সেগুলোর মোটামুটি ভাবার্থ অনেক সহজ ও অভ্যাসের ব্যাপার। 'আল্লাহু আকবার' বললে যদি অর্থ বুঝি 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ', তবে 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযিম' বললেই 'আমার প্রভু পবিত্র ও মহামহিম' ভাবাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুরা ফাতেহা তো মূলত একটা প্রার্থনা। এর হুবহু অর্থ মনে না থাকলেও

ছোটবেলায় পড়া কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'প্রার্থনা' কবিতাটা মুখস্থ করে নিলেই চলে। অনেক সময় ভোরে কিংবা সন্ধ্যার পর নামাজ শেষে সুর করে কবিতাটা পড়তেও ভালো লাগে। মনটা খোদার উদ্দেশ্যে নত হয়ে যায়। এটাকে জীবনের উদ্দেশ্য বললেও ভুল হয় না। এটাকে একটা সুপ্ত মনের প্রার্থনাও বলা যায়। এছাড়াও রুকুর তাসবিহ, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে, সেজদায় গিয়ে, সেজদা শেষে আত্তাহিয়্যাতু এবং দোয়ার প্রতিটা ক্ষেত্রে বাংলা অর্থ বুঝে নামাজ পড়লে নামাজে মন চলে আসে। আল্লাহর কাছে আমি কী বললাম– তা বুঝতে পারি। সমস্ত কিছুর মধ্যেই আল্লাহর মহত্ত্ব, গুণগান, প্রশংসা, সংকল্প ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। একজন ব্যক্তি ধীরে-সুস্থে কয়েক দিন অভ্যাস করলেই বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। দরকার সুশিক্ষা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সাধারণ মানুষকে গড়ে তোলা। তাদেরকে বোঝানো, আর ধর্ম নিয়ে কুটিল রাজনীতি ও তেলবাজি বন্ধ করা। এভাবে নামাজের মাধ্যমে বুঝেসুঝে বারবার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দিতে থাকলে এবং সে-মতো বাস্তবে কাজ না করলে, মনের মধ্যে অনুশোচনা আসবেই। কোনো ব্যক্তির ন্যূনতম বিবেক ও মানবতা বোধ যদি থাকে, অন্তত ছয় মাসের মধ্যে সে সমস্ত অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে সরে আসবে। নইলে বিবেকের তাগিদে বা বিবেকের দংশনে নামাজ ছাড়তে বাধ্য হবে। বিবেকের দংশন অত্যন্ত মারাত্মক। আবার বারবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করে বিবেকের যুঝাযুঝিতে একজন 'সিরাতাল মুসতাকিম' খুঁজতেও পারে এবং দিনে দিনে একজন সাচ্চা মোত্তাকি (পাপ থেকে বেঁচে থাকে যে) হতে পারে। কারণ বিবেকের দংশন বড় দংশন। এ দংশন ছাইচাপা আগুনের মতো নীরবে আত্মোপলব্ধিকে কুরে কুরে খায়। যে সত্যের সন্ধান করে– একদিন মুক্তি পায়। অনেক ডাকাতেরও বিবেকের দংশন জাগিয়ে তুলতে পারলে, সে সাধু-দরবেশে পরিণত হয়। এজন্য এদেশের মৌলভি-মাওলানাদের সাধারণ মানুষকে ভালো পথে নেয়ার জন্য উদ্দেশ্যমূলক ট্রেইনিং নিতে হবে। মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। মৌলভি-মাওলানাদের বাংলা ভাষা, সৃষ্টিদর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে লেখাপড়া করতে হবে, জ্ঞানার্জন করতে হবে– দক্ষ হতে হবে। লোভকে সংবরণ করতে

হবে, অন্য মৌলভির গিবত গাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং মানুষকে কাছে ডেকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। চিন্তার নির্মলতা আনতে হবে।

বিষয়টা জটিল মনে হলেও অতি সহজ। সরকার ইচ্ছে করলেই কওমি মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসায় স্কুলের পাঠ্যক্রম চালু করে দিতে পারে। মাদ্রাসার শিক্ষকেরা শুধু কোরআন-হাদিস পড়ার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেন। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান, অঙ্ক, ব্যবসায়-শিক্ষা পড়ার জন্য নিরুৎসাহিত করেন। তাঁদেরকে জীবন ও কর্মের বাস্তবতা বুঝতে হবে। আবার স্কুলগুলোতেও মাদ্রাসার সিলেকটেড পাঠ্যক্রম চালু করে দিতে পারে। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে একীভূত করা সম্ভব। একাজের পথে বাধা দিলে একমাত্র কওমি হুজুররাই দিতে পারেন। প্রতিটা দেশে প্রতি ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রু মুসলমানরাই। এঁদের চিন্তা-চেতনায় সংকীর্ণতা– দূরদর্শিতার বড় অভাব। এই অদূরদর্শিতার কারণেই এদেশ থেকে মুসলমানিত্ব ক্রমশ বিলীন হতে চলেছে।

আমি মনে করি এদেশের অল্প-বয়সী ছেলে-মেয়েরা কাদার পুতুল। যে কোনো গঠনে এদেরকে তৈরি করা যায়। এরা বর্তমানে পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার। এদেরকে যদি বিদ্যমান কুৎসিত, কদর্য, ঘৃণ্য রাজনীতির আবহ থেকে মুক্ত করা যেত, বাপ-মাকে যদি সচেতন করা যেত এবং শিক্ষকরা যদি তার স্বকীয় আদর্শ মতো, শুধু শিক্ষক হিসেবে কাজ না করে ‘মেন্টর’ হিসেবে কাজ করতো, তাহলে এদেশের মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা এবং সোনার মানুষে পরিণত করা কোনো কঠিন কাজ হতো না। আমার হিসেবে অসম্ভব বলতে কোনো কাজ নেই। দরকার যথাযথ জায়গায় যথাযথ লোক বসানো এবং পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

এগারো

এদেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধস নেমেছে। অর্থব্যবস্থা, প্রশাসন ও নিয়ম-নীতিতেও তথৈবচ। মোটামুটি পিছনের দু-পা পড়ে যাওয়া চতুষ্পদের মতো সামনের দু-পায়ে ভর করে টেনে-হিঁচড়ে একটু একটু এগোচ্ছে– সময় যেহেতু কারো জন্য অপেক্ষা করে না, তাই। আবার কখনো পড়ে পড়ে ধুঁকছে। পরিস্থিতি সবার জানা। আমরা মুখ খুলছিনে, কেউবা জেগে ঘুমাচ্ছে এবং চাণক্য হাসি অলক্ষ্যে হাসছে। মূলত ধস নেমেছে মগজে-মানসিকতায়।

আমরা শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যের মতো বাজারে বিকাচ্ছি। একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়লে আর বাকি থাকে কী? ক্রমশই অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। শিক্ষাঙ্গনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে বিষদিগ্ধ রাজনীতির ছোঁয়া নেই। পুরো সমাজটাই তো হয়ে গেছে রাজনীতির লুটপাট পেশার অভয়ারণ্য। তারই বাঁধভাঙা ধাক্কা শিক্ষাঙ্গনকেও সইতে হচ্ছে। কারণ শিক্ষাহীনতা জাতি ধ্বংসের ধন্বন্তরী ফাঁদ এবং শিক্ষাঙ্গনও টাকার উৎসস্থল। অধিকাংশ পরীক্ষাতেই প্রশ্ন ফাঁস ও প্রশ্ন জালিয়াতির রমরমা ব্যবসা ও রাজনীতি। শিক্ষার কথা ভাবতে গেলেই বেশ কয়েকটা বিষয় এর মধ্যে চলে আসে। এগুলো রাজনৈতিক পরিবেশ, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকতা পেশা, ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান এবং অভিভাবকমহল। বিষয়গুলোর কিছু অংশ ইতিমধ্যেই আলোচনা করে ফেলেছি। এখানে বিষয়গুলোর একটা অংশ ভাবগম্ভীর শব্দে আলোচনা করা সম্ভব; কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বাস্তব ভিত্তিক পরিবেশ-পরিস্থিতির একটা খণ্ডিত চিত্র অঙ্কন করতে চাই।

আজ সকালেই এক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী ঘটনাটা শোনার সাথে সাথেই আমাকে বলে একটু হালকা হবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'এদেশের এ আবার কেমন সংস্কৃতি রে বাবা! নিজের টিমের অন্য একজন সহকর্মীর উপর আস্থা রাখা যায় না!' দুজনে মিলে একটা গবেষণার প্রজেক্টের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজেক্টের চিফ ইনভেস্টিগেটর; সাথে যাকে নিয়েছিলেন, তিনি সহকারী ইনভেস্টিগেটর। সহকারী ইনভেস্টিগেটর প্রতি মাসে একটা সম্মানী পান। প্রজেক্টের সব দায়দায়িত্ব চিফ ইনভেস্টিগেটরের। আন্তর্জাতিক মানের গ্রেডেড জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ না

করাতে পারলে গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত দিতে হবে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শেষ, টেবুলেশন শেষ। গবেষণাপত্র লেখার প্রক্রিয়াও প্রায় শেষ। সহকারী ইনভেস্টিগেটর এর মধ্যে রাজধানীর অদূরে পূর্বাঞ্চলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরাধরির নিয়োগ পেয়ে সেখানে যোগদান করলেন। কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল চিফ ইনভেস্টিগেটরকে বাদ দিয়ে– সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে সহকারী ইনভেস্টিগেটর নিজ নামে অন্য এক জার্নালে গবেষণাপত্রটি ছাপিয়ে ফেলেছেন। চিফ ইনভেস্টিগেটর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রজেক্টের টাকা তাঁকে এখন ফেরত দিতে হবে– সহকারী ইনভেস্টিগেটরের সম্মানীসহ। নিজের নামের প্রকাশনাও নেই। জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাটিয়ে শেষ বয়সে দেশে এসে বাঙালির অধুনাতন প্যাঁচে পড়ে গেছেন। কালচক্রে বাঙালির স্বভাব-চরিত্রের যে আমূল বদল হয়ে গেছে, তা তিনি লা-ওয়াকেবহাল।

আমার অন্য এক মধ্যবয়সী সহকর্মীরও একই দশা। তার সাথে সহকারী হিসেবে যে কাজ করতো, বিদেশে পিএইচডি করতে চলে গেল। ওখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর সহকারী নিজ নামে ভালো জার্নালে গবেষণাপত্র ছাপিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলো। আমার এ সহকর্মী ঘু-ঘু ধরার ফাঁদে পড়ে গেলেন। এখন 'ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। এই তো সেদিনও পত্রিকায় দেখলাম, এক শিক্ষকের গবেষণাপত্র চুরি করে অন্যজন নিজ নামে পিএইচডি সার্টিফিকেট নিয়েছেন। এই তো আমাদের অনেক শিক্ষকের হালনাগাদ চরিত্র। এদের কাছ থেকে ছাত্রসমাজ কী শিখবে?

আমার জানা এ সমাজের অনেকের পিএইচডি ডিগ্রির সার্টিফিকেট ভুয়া। একটু বেশি ফলাও করে নামের আগে ডিগ্রিটা লিখছে। যাদের লেখাপড়া মাস্টার ডিগ্রির নীচে, তারা নামকে বড় করার জন্য 'আলহাজ' হচ্ছেন এবং নামের আগে লিখে তৃপ্তি পাচ্ছেন। যাঁরা একটু 'হোয়াইট কলার' অবস্থানে আছেন, পিএইচডি শব্দটা শুনলেই জিহ্বায় পানি টপ টপ করে পড়ছে এবং টাকা ব্যয় করে সার্টিফিকেট ছাপিয়ে নামের আগে লিখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন। অথচ কোনো গবেষণা নেই, গবেষণার কোনো পাবলিকেশনসও নেই; সত্যতা চেকিংয়ের কোনো ব্যবস্থাও এদেশে নেই। সরকারি, বেসরকারি, না-কারবারি অসংখ্য ভুয়া সার্টিফিকেটধারী নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনঃপীড়ার কথা বলবো কাকে?

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রং তো লাল, নীল, সাদা, সবুজে ভরে গেছে। এর মধ্যে সবুজে-সবুজে মিল, লালে-লাল মিল করতে গিয়ে 'লালে লাল দুনিয়া' হয়ে গেছে। এখন 'আমা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া' চলছে। কখনো কখনো এমন মানিক জোড়ও হচ্ছে যে, সমগোত্রীয় একে অন্যের ডিগ্রির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আবার রং-বিরুদ্ধ হলে তো গ্রুপ-পলিটিক্স আছে; প্রয়োজনে বুকের পাঁজরে ছুরি বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করছে না। সে অন্য কথা।

বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রংধারী শিক্ষক আপসরফার পিএইচডি সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। লাল রংয়ের এক শিক্ষক আরেক লালরঙা শিক্ষকের অধীনে ডিগ্রি নেওয়ার নাম লেখালেন। দুই-আড়াই বছর পর একটা নামসর্বস্ব রিপোর্ট জমা দিলেন। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একই রংধারী অনৈতিক শিক্ষকের কাছে গবেষণাপত্র সু-যোগাযোগ করে মূল্যায়নের জন্য পাঠালেন। হিসাব-নিকাশ করার জন্য সেলফোন তো আছেই। আগ থেকেই কথা পাকাপাকি। সিন্ডিকেটের মিটিং? সেখানেও সমরঙে ভরা। মাশাআল্লাহ! সার্টিফিকেট হাতে চলে এলো। কলিযুগে একটু বুদ্ধি খাটালে অসাধ্য সাধন করা যায়। সব কিছুতেই দরকার গুরুর আশীর্বাদ ও সন্তুষ্টি। নৈতিকতা নামে একটা কথা আমাদের সমাজব্যবস্থায় এবং সংস্কৃতিতে যা ছিল, সেটা প্রায় অপসৃত। বেরসিক সাংবাদিক কখনো কারো প্রতি রুষ্ট হলে কালেভদ্রে কোনো কোনো কথা একটু-আধটু না-লিখে পারেন না। তখন অল্প-সল্প গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। নইলে সব চুপচাপ, কবরের নীরবতা। মনে মনে কর্ম সারা। 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা।'

আমার এক পরিচিত ব্যক্তি। এক সময় ভালো ছাত্র ছিলেন। বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি করেছিলেন। ব্যাংকে চাকরিতে ঢুকলেন। লেখাপড়ার সাথে সংস্রব বেশ কিছুটা হারিয়ে গেল। বয়স অনেক হয়ে গেছে, মনমতো প্রমোশনটা হচ্ছে না। প্রমোশন পেতে বেশ কিছু টাকা খরচ করে এমবিএ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন। মসজিদ থেকে বেরোতেই একদিন দেখা। জড়িয়ে ধরলেন। ভালো-মন্দ আলাপচারিতা হলো। অনেক কথার শেষে বললেন, 'ভাই, পিএইচডি সার্টিফিকেটটা যে আমার খুব দরকার। কী করি একটা পরামর্শ দিন তো? আমি বললাম, 'কোনো একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ুন, আমি সুপারভাইজার দেখে দেবো। চাইলে বুয়েটেও ভর্তি হতে পারেন।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা দেখি।'

পাঁচ-ছয় মাস কেটে গেছে, ঐ একই মসজিদের ফটকে আবার দেখা। পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে হাতে দিলেন। আমি পকেটে রেখে দিলাম। বললেন, 'পকেটে রাখলেন কেন? আমার সামনে একবার পড়ে দেখলেন না তো!' আমি অগত্যা পকেট থেকে কার্ডটা বের করে চোখের সামনে ধরলাম। দেখি নামের আগে 'ড.' লেখা। উনি এবার হেসে উঠে বললেন, 'আমি তো আপনাকে খুব বিশ্বাস করি, তাই বলছি। এই সার্টিফিকেটটা সংগ্রহ করতে আমার আট লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। নামের আগে 'ড.' শব্দটা লেখা আমার খুব শখ।' আমি মুচকি হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে তুলে চলে এলাম। তিনিও খুশি মনে টুপি মাথায় বাড়ির দিকে চললেন। কী ভাবলাম, তা আমি এখানে আর লিখবো না। শুধু বলবো, নৈতিকতার অবক্ষয় যে-সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢোকে, সেখানে 'শিক্ষা' নামক শব্দটা থাকে কী করে!

আরেকটা ঘটনা বলি: স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম। চারদিকে বিল আর নদী। সে গ্রামের এক দিনমজুর– নাম 'ইলা সর্দার'। খড়ে ছাওয়া এক জীর্ণ কুটিরে পরিবার নিয়ে তাঁর বসবাস। দারিদ্র তাঁর নিত্যসঙ্গী। ঘরটা একপাশে ঝুঁকে পড়েছে। বৃষ্টির সময় ঘরের মধ্যে পানি পড়ে। উঠোনের একপাশে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে একটা মাটির চুলা– এটাই রান্নার জায়গা। সংসারে পর পর সাত মেয়ে। পরিবারের প্রতিটা সদস্যের পরনে ছিন্নবস্ত্র। পেটে ভাত নেই। নিত্য উপোস। অন্যের বাড়িতে চেয়ে-চিন্তে দিন চলে। বউ আবার সন্তানসম্ভবা। খুব আশা, এবার একটা ছেলেসন্তান হবে। ইলা সর্দার অন্যের জমিতে বিলে কাজে গেছে। বিকেল গড়িয়ে গেছে। গ্রাম থেকে একজন ইলার খোঁজে বিলে গেল– একটা সুখবর নিয়ে। 'ইলা ভাই, তোমার একটা মেয়ে হয়েছে।' ইলা সর্দার ধান নিড়াচ্ছিলেন। জমিতে নিড়ানি পুঁতে রেখে জোর পায়ে বাড়িতে এলেন। ইলা সর্দার আজন্ম তোতলা। ইলা সর্দারের উঠোনে পা দেওয়া দেখেই বউ ঘরের মধ্যে সুর করে কান্না শুরু করেছে। ভাবছে, হয়তো এসে মারবে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে বউয়ের উদ্দেশ্যে ইলা সর্দার বললেন, 'এই ইলা, সাতজন মে-মে-মেয়েকে খাওয়াতি পারলি, আ-আ-আট জন মে-মে-মেয়েকেও খা-খা-খাওয়াতি পারবে। কি-কি-কিন্তুক, ঐ মে-মে-মেয়েলোকটার আ-আ-আক্কেলডা কী?' বলে তিনি আবার মাঠে চলে গেলেন।

এদেশের মধ্যম-বয়সের অনেক শিক্ষক নামমাত্র শ্রম দিয়ে যোগসাজশে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। তাঁদের দেখাদেখি সদ্য পাস করা রংমাখা বেশ কিছু অযোগ্য শিক্ষক রাজনৈতিক তদবিরে টাকা খরচ করে শিক্ষাঙ্গনে ঢুকছে এবং অনেকে একই পন্থায় পিএইচডি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। স্কুল-কলেজেও টাকা দিয়ে রং মেখে শিক্ষকতা চলছে। আমার প্রশ্ন এই 'ইলা মার্কা' শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশার অন্যদের এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের 'আ-আ-আক্কেলডা কী'? এই শিক্ষকরা যদি কমপক্ষে ত্রিশ বছরও ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় লিপ্ত থাকে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা বঞ্চিত হবে নিশ্চিত। এরা ছাত্রছাত্রীদের রংবাজী এবং দুর্নীতি ছাড়া আর কী শিক্ষা দেবে! এর বিহিত কী?

আমার হিসাব মতে, ডিগ্রি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি একটা শর্ত জুড়ে দেয় যে, গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার আগে কমপক্ষে দুটো গবেষণা-নিবন্ধ কিউ-১ বা কি-২ পর্যায়ের গবেষণা-জার্নালে গবেষক ও সুপারভাইজারের যৌথ নামে প্রকাশিত হতে হবে, তাহলেই পিএইচডি সার্টিফিকেটে জালিয়াতি বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি জেগে ঘুমায়, তাহলে কিছু বলার থাকে না।

এদেশের সকল দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা না গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা রোধ করা সম্ভব। দরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা। বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরের যে অবস্থার কথা আমরা জানি, তাকে হরিলুটের মেলা বলা যায়। দেশের আর্থিক বাজারের তুলনায় ব্যাংকের সংখ্যা অনেক বেশি। ব্যবসায়িক-রাজনীতিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ব্যাংকের অবস্থা নাজুক হবার পরও রাজনৈতিক আনুকূল্যে ব্যাংকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সরকারি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারেনি, তাই মূলধন ঘাটতি ছিল। অনেক আর্থিক কেলেংকারীর পরও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দুর্নীতি ও লুটপাটের দায় জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, উদ্যোক্তাদের চাপ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এ অবস্থা। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ছাড়া এদেশে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া যায় না। বিভিন্ন নামমাত্র অথবা ভুয়া প্রজেক্ট দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে। যিনি ঋণের অনুমোদন দিচ্ছেন তারই ভুয়া কোম্পানি, তিনিই রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী। পথে যারা বাধা দিতে পারে, প্রত্যেককেই কেনা যায়। বরাদ্দকৃত টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও কাজে লাগালেই হলো অথবা পাচার। যে কোম্পানির নামে নেওয়া হলো, সেটাকে দেউলিয়া দেখিয়ে দেয়া

হলো। টাকাটা সাধারণ মানুষের ব্যাংক আমানত। বলারও কেই নেই, ধরারও কেউ নেই। 'কুতে মরে হাঁস, ডিম খায় দারোগাবাবু।' এগুলোকে চুরি না বলে দিনে-দুপুরে ব্যাংক ডাকাতি বলা যায়। খেলা চলছে হরদম। গত বছর ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি' বলেছে, ২০১৫ সালে বাণিজ্য কারসাজির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। যত বড় প্রজেক্ট, তত বড় দুর্নীতি।

এই যে করোনা নিয়েও যত দুর্নীতি, সবকিছুর মূলেই রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব। একটা পক্ষকে দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়ে যখন সেটাকে ঢেকে রাখা অসাধ্য হয়ে যায়, তখন লোকদেখানো তৎপরতা দেখাতে হয়। করোনা ভাইরাস নিয়ে দুর্নীতির মধ্যে– সরঞ্জাম সাপ্লাই নিয়ে দুর্নীতি, অনুদানের টাকা নিয়ে দুর্নীতি, করোনা পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি, মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে বিদেশে লোক পাঠানো নিয়ে দুর্নীতি। দেশব্যাপী করোনা ছড়িয়ে যাবার এটাও একটা বড় কারণ। মূল কারণ হলো দলবাজি।

এই দেখুন, বালিশ কেলেঙ্কারির ঘটনা এক বছরের বেশি হতে চললো, কিছুদিন পরেই মানুষ ভুলে যাবে। এক্ষেত্রে 'প্রথম আলো'তে ২০ মে ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত নিবন্ধের কিছু অংশ এরকম: 'একটা বালিশের দাম দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা। ৩০টি চাদর আনতে একটা ট্রাক ভাড়া করা হয়েছে ৩০ হাজার টাকায়। আবার কম্বল ও লেপ আনার জন্য আরেকটা ট্রাকের ভাড়া দেখানো হয়েছে আরো ৩০ হাজার টাকা। প্রতিটি চাদর নীচ থেকে খাটে তোলার জন্য খরচ দেখানো হয়েছে ৯৩১ টাকা।'
'চার লেন সড়ক নির্মাণের মধ্যে রংপুর-হাটিকুমরুল মহাসড়কে প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৬৬ লাখ ডলার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৭০ লাখ ডলার, ঢাকা- মাওয়া মহাসড়কে ১ কোটি ১৯ লাখ ডলার, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ২৫ লাখ ডলার ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ২৫ লাখ ডলার খরচ নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে চার লেন সড়ক তৈরিতে ভারতে ১১ লাখ থেকে ১৩ লাখ ডলার এবং চীনে ১৩ লাখ থেকে ১৬ লাখ ডলার খরচ হয়। এই হিসাব অনুযায়ী ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার খরচ ভারতের কিছু সড়কের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি।'

১৫.০১.২০২০ সালে m.somoynews.tv, সেলিনা সুলতানার রির্পোট অনুযায়ী, 'মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শুধু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের হিসাব-নিকাশ দেখলে যে

কারো চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। কখনো দপ্তরগুলোর তদন্তে দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রপাতির মূল মূল্য থেকে শত গুণ বেশি, আবার কখনো কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় সেবা পাচ্ছে না সেবাগ্রাহকরা। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যন্ত্রপাতির মূল্য দেখলেও চক্ষু চড়ক হবে যে কারো। ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের একটি এমআরআই মেশিন ছাড়ায় সাড়ে ৯ কোটি টাকায়। ফরিদপুর মেডিকেলে ১০ হাজার টাকার ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কেনা হয় ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকায়। ১৬৬টি যন্ত্রপাতি কেনা হয় দেড়শ গুণ বেশি দামে।'

তথ্য একটু বেশি লিখতে হলে 'হাজার রাতের কেচ্ছা'-কেও হার মানাবে। আবার সব তথ্য গণমাধ্যমে আসেও না, আমরা অন্ধকারে থাকি। সত্য কথাটা হচ্ছে এদেশের এমন কোনো সেক্টর পাবেন না, যেখানে 'সমুদ্র ডাকাতি' হচ্ছে না। এজন্যই বাজেটের আকার বড় হয়। অথচ সম্পদ বাড়ার ব্যাপারে ঢন-ঢনা-ঢন; ঠন-ঠনা-ঠন। টাকাগুলো চলে যাচ্ছে লুটেরা-দলবাজদের পকেটে। আর আমরা মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য মাস্তান পুষি, অথবা মাঝে-মধ্যে উড়ো ফায়ার করি, 'দোষী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।' ব্যস, কম্ম সারা।

প্রতিবার বাজেট-পরবর্তী বক্তৃতার জন্য কোনো কোনো সংগঠন আমাকে দু-একটা কথা বলতে বলেন। আমি কথার মধ্যে বাজেট দুর্নীতি রোধের জন্য কিছু-কিছু প্রতিষেধক-প্রতিবিধান প্রায়ই উল্লেখ করি। পত্রিকার খবরে সেগুলো আসে না। আসে আমার নাম, কখনো ছবিসহ। এভাবেই বছর চলে।

জাতীয় বাজেট আমাদের জীবনাচারের একটা বড় অংশ। জুলাই মাস শেষের পথে। চারদিকে করোনা মহামারীর সাথে এ বছরের জাতীয় বাজেটের মৃন্দুমন্দ সুর কানে এসে বেজেছে। আমাকেও দু-একটা বাজেট আলোচনায় ডাকা হয়েছে। আমার মতো এত না-লায়েক শিক্ষকের কথাবার্তা ছাত্রছাত্রীরা গুরুত্ব দিলেও সরকার বাহাদুরের কান পর্যন্ত পৌঁছার কথা নয়। যা বলেছি, এ কথার মোটামুটি কিছু এখানে বলতে চাই। যতদিন পর্যন্ত বিষয়টার একটা সুরাহা না হবে, আমার জীবদ্দশাতে একই কথা বলে যাব– তা যত শ্রুতিকটুই হোক না কেন।

এদেশে বাজেট কর্তৃপক্ষ এবং আলোচনাকারীদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার– সে-দিকটা উপেক্ষিত রয়ে যায়। সবাই টাকার

বণ্টন কোন খাতে কত– এটা নিয়েই তর্কাতর্কি করেন। আমি দেখি, এদেশে বাজেট তৈরিতেই গলদ। বাজেট যেমন আয়-ব্যয়ের সংখ্যাত্মক পরিকল্পনা, তেমনি সরকারি আয়-ব্যয়ের একটা নিয়ন্ত্রণ হাতিয়ারও বটে। যাকে আমরা বলি, 'বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।' এদেশের বাজেটে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই পুরোপুরি অনুপস্থিত। এবার বাজেটের মৃদুমন্দ সুর কানে এসে নাড়া দিচ্ছিল– এটা আমি বলেছি। সে সুরের সাথে পুরোনো দিনের একটা গানের সুরও মনে ভেসে আসছিল। 'ঐ দুলছে, দেখ, দোলনচাঁপা দুলছে। সুর তুলছে, অলি গুন গুন সুন তুলছে, ঐ দুলছে, আহা-রে।' বাতাসে দোলনচাঁপা দুললে ভালো লাগে। অলি গুন গুন সুর তুললে আরো ভালো লাগে। কিন্তু বাজেটের কন্ট্রোলিং ডিভাইসগুলো দোলাদুলি করলে এবং অলি কাকের মতো কা-কা-করলে নিশ্চয়ই তা ভালোলাগার কথা নয়। সে-সাথে 'খাদকের দল' বেশি বাজেট বরাদ্দ দেখে গুন গুন সুর তুললেও তা ভাবতে বেসুরো লাগার কথা। কারণ জাতীয় বাজেট সরকারি কোষাগারের একটা কন্ট্রোলিং ডিভাইস। জানি, অনেক লবণের গোডাউনে মালিকের অগোচরে পানি ঢুকে বিপলু পরিমাণ লবণ গলে পেছনের ড্রেন দিয়ে স্রোত বয়ে যায়। মালিক পরে দেখতে পেয়ে মাথায় হাত দেন। কর্মচারি ছাঁটাই করেন। বাজেটের গলতি নিয়ে কয়েকটা উদাহরণ আগে বলে নিয়েছি। এমন দিন নাই যে, এ গলতির খবর পত্রিকায় আসছে না। এ গলতি নিয়ে ভাবনায় মাথায় হাত দেওয়া মালিক এ-দেশে ক-জন আছেন? কীই-বা তাদের ভাবনা?

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, এমনকি পারিবারিক পর্যায়ে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য তিনটা জিনিস আমরা সব সময় লক্ষ রাখি– পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনারও কমপক্ষে দুটো বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়– সুষ্ঠু পরিকল্পনা, এবং বাস্তবমুখিতা। বাজেটের টাকা ব্যয়ের কোনো বাস্তবমুখী ফলপ্রসূতা আছে কী? কয়েক দিন আগেই যুগান্তর পত্রিকায় পড়লাম "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ 'পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প-৩' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে 'একনেক'। ২৮০ জন এমপি প্রত্যেকে বরাদ্দ পাচ্ছেন চার বছরে ২০ কোটি টাকা করে।" এই প্রকল্পের সঠিকতা, বাস্তবমুখিতা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন আছে। বাস্তবে যে পরিমাণ নগদ টাকা প্রকল্প ব্যয় হিসাবে দেখানো হবে (২৮০ জন X ২০ কোটি=৫৬০০ কোটি টাকা), সাধারণ মানুষ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তত টাকার স্থায়ী সম্পদ অর্জন করবে কিনা? টাকাটা ব্যয়ের তথাকথিত যোগ-বিয়োগ

ছাড়া প্রকৃত কোনো সময়-উপযোগী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আছে কিনা? আজ আটচল্লিশ বছর ধরে এমপিদের নামে যেভাবে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়– তা থেকে কোনো সুখকর খবর পত্রিকায় আসে কি না? কালো পিঁপড়ের পেটে শতকরা কত ভাগ যায়? টিআইবি এদেশের এমপিদের টাকা-পয়সা ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠিয়েছিল তার সঠিকতা কতটুকু? এমপিদের মাধ্যমেই যদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাতে হয়– তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কাজ কী? তাদের এত টাকা দিয়ে পোষারই-বা দরকার কী? এদেশে প্রতিটা বিষয়ে এমপিদেরকে টাকা খরচের বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত করার বাতেনি মোজেজা কী? এ বিষয়গুলো নিয়ে এদেশে কোনো গবেষণামূলক এসেসমেন্ট হয় কি না?

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্য প্রসঙ্গে আসি। কথা বলছিলাম বাজেট নিয়ে। বাজেট কথাটা শুনতে শুনতে এদেশের একটা কানা ছোকরারও মুখস্থ হয়ে গেছে। বাজেটের দুটো উদ্দেশ্য– এ কথা আগেই বলেছি। পরিকল্পনার বিষয়টা তো যেনতেন প্রকারে সারা হয়। একবার 'জিরো বেইজড বাজেট' করলে কেমন হয়? কন্ট্রোলিংয়ের বিষয়টা পরোপুরি উপেক্ষিতই রয়ে যায়– তাই নীচ তলা থেকে আট তলায় লিফটের মাধ্যমে বালিশ বয়ে নিয়ে যেতে সাত শ ষাট টাকা বাজেটে ব্যয় করতে হয়। কনস্ট্রাকশনের কাজে রডের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার করে এদেশের বাকরহিত জনসাধারণকে 'বাঁশ' দেওয়ার ব্যবস্থা বাজেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নেই। সেজন্য দুর্নীতির বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দু-একটা ঢিল ছুড়ে অকিঞ্চিৎ ঢেউ তোলার বিফল চেষ্টা না করে গত্যন্তর থাকে না।

আমার প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় বাজেটের কন্ট্রোলিং সিস্টেমের বিষয় নিয়ে আমরা কম কথা বলি কেন? কিংবা মরচে পড়া কন্ট্রোলিং সিস্টেমের পরিবর্তন না করে বছরের পর বছর পার করেই-বা দিই কেন? কথা হলো, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা করছে। হাজার হাজার কোটি মাইল দূরের ভূ-উপগ্রহকে পৃথিবীতে বসে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই ভূ-উপগ্রহ থেকে এ-বিশ্বের কোন বাড়ির কোথায় বসে কে কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। আর এতটুকু একটা দেশের মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রিত পথে চালানো, কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা কি এতই কঠিন কাজ? সদিচ্ছা থাকলে আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে যে কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লালন গেয়েছেন, 'অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে চাতক স্বভাব না হলে।' সেই চাতক স্বভাব দেশচালকদের মধ্যে কই? আমরা যত সিস্টেমই করি না কেন, কেউ

মানেন না। আমরা মানাতে পারি না কেন? যে সিস্টেমই তৈরি করি না কেন, তাতে গলদ থাকে। 'সরষের মধ্যে ভূত' থাকলে গলদ তো থাকবেই। ভূত যেমন আছে, ভূত তাড়ানোর ডাক্তার-কবিরাজও এদেশে আছে। এদেশের সিস্টেম ব্যবস্থাপকরা অনেক অনেক সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে ভালো পরামর্শও পাওয়া যেতে পারে। বাজেটের গ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে পুরো রুটিটাই বানরের পেটে নিয়মিত চলে যাচ্ছে। তা কী করে হয়! দেশের টাকা সব নামি-দামি কালো পিঁপড়ের পেটে চলে গেলে কীভাবে হবে! বাজেট ব্যয় দশ টাকা হলে সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ অর্জন সাধারণ মানুষ দেখতে চায়। সুস্বাদ করে কুলকাসুন্দি খেতেই যদি চাও, নুনের সাথে একটুখানি মরিচ বাটাও দাও। আমার কাছে মরিচ বাটার দাওয়াই আছে– বারান্তরে ব্যবহারবিধি জানানো যাবে।

এদেশের এই যে পাহাড়সমান দুর্নীতি এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে মাত্র ৬৪ জন সদিচ্ছাসম্পন্ন দেশীয় লোক হলেই যথেষ্ট। দু-তিন বছরের মধ্যেই মোটামুটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। 'সর্প হইয়া দংশন করো, ওঝা হইয়া ঝাড়ো' চরিত্রের লোক দিয়ে কোনোক্রমেই কিছু হবে না। ওদের মনে গলদ। আগে চরিত্রের বদল, তারপর আর বাকি কিছু। এদেশে সবার আগে দরকার সুশিক্ষা, প্রশাসনের সদিচ্ছা এবং অপরাজনীতির অপসারণ।

গ্রামের এক চাষা ছেলে বাপের পাতলা পায়খানা হবার কথা শুনে একদিন পর আদবের সাথে সহানুভূতি দেখিয়ে বাপকে জিজ্ঞেস করছে, 'হাঁ বাপ, তোমার হাগা সেরেছে?' বাপজান নিরাশ মনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'বলি কি বাবা– লজ্জার কথা, না বাবা, এ পাছা থাকতে আর নয়।' তবুও ছেলের আশা, বাপের পাতলা পায়খানার ব্যামো সেরে যাবে।

এদেশের যারা নীতিনির্ধারক-ভাগ্যনিয়ন্তা, তাদের চিন্তাধারায় দূরদর্শিতা এবং মানসিকতার উন্নয়ন যত তাড়াতাড়ি হয়, মুক্তির নেশায় অনাসৃষ্টির আগল-ভাঙার কাজও তত ত্বরান্বিত হয়। সোনালি ঊষার স্বাগতিক আবির্ভাবে রাতের নিকষকৃষ্ণ আঁধার কেটে যাবার মতো পাতাঝরা মৃতপ্রায় বনাঞ্চল আবার সজীব কিশলয়ে ভরে উঠতে পারে। 'আমি সেই আশাতে রয়েছি বসে তোমার অপেক্ষায়।'